পদক্ষেপ

॥ আবদুল আজীজ আল্-আমান ॥

পরম শ্রদ্ধেয় বহুভাষা-বিদ্ মনীষী

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

এম-এ, বি-এল, ডিপ্লো-ফোন, ডি-লিট্ (প্যারিস)-সাহেবকে

*
* *

প্রকাশক :
এস, মল্লিক
৩৭-এ কলেজ রো
কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান :
ইউনিভার্সাল বুক ডিপো
৫৭-বি কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
বিজয়া দশমী
বুধবার
৫ই কার্তিক, ১৩৬৫

মুদ্রণালয় :
সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫২-এ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শামসুল হক, কাজী

ব্লক-নির্মাণ ও প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
স্টাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য : সাত টাকা

॥ নিবেদন ॥

চর্যাপদ হ'তে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য পর্যন্ত পদক্ষেপের কাল-সীমা বিস্তৃত। এতে মোট ষোলটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধই স্বয়ং সম্পূর্ণ কিন্তু সকলের সমবায়ে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ-ধারা ও আনুপূর্বিকতার সুরটি বেজে উঠেছে। আভাসিত হ'য়েছে বয়ঃসন্ধি হতে যৌবন-সমাগমের ইসারা-ইংগিত। রস-লিপ্সু পাঠক-চিত্তে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মোটামুটি একটি চিত্র যে ফুটে উঠবে শঙ্কিত মনে সে আশাটুকু পোষণ করি। 'চর্যাপদ' প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে পৃথক গ্রন্থ সাহিত্য-সঙ্গে প্রকাশিত হ'য়েছে কিন্তু আনুপূর্বিকতাটি রক্ষার জন্যে ওটাকে পদক্ষেপের সামিল করা হ'ল। এখন হ'তে ওটা পদক্ষেপের সামগ্রী।

গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে একটি কথা আছে। কোন 'অসারবাণ সাহিত্যের' নাম-লিপি পদক্ষেপ হ'লে হয়ত সঙ্গত ও শোভন হ'তো বেশী কিন্তু কোন কল্লোচ্ছ্বাসের বশবর্তী হ'য়ে আমি প্রবন্ধ-গ্রন্থের এভাবে নামকরণ করিনি। স্নাতকোত্তর জীবনে প্রাচীন কাব্যগুলি অধ্যয়ন-কালে যত নিবিষ্ট চিত্ত হ'তে পেরেছি, ততই মনে হ'য়েছে আমি যেন ক্রমান্বয়ে এক সুবিশাল গভীর রহস্যাচ্ছন্ন অজ্ঞাত অরণ্য-ভূমির পাদ-প্রান্তে এসে উপনীত হ'য়েছি। প্রথমে ছিল সংশয়, তারপর সংশয় কাটিয়ে নিঃসংশয়-চিত্ত হ'তে পেরেছি। এই নিঃসংশয় কিন্তু মুগ্ধ চিত্তটি নিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় তত্ত্ব-গভীর কাব্যারণ্যের প্রান্ত-সীমায় পদক্ষেপ করেছি। হয়তো এ পদক্ষেপ হাঁটি হাঁটি-পা-পা-র যুগের মধ্যেই সীমিত। এটাই গ্রন্থের নামকরণের উৎস-ভূমি। পদক্ষেপ— প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কাব্যের রহস্যাচ্ছন্ন দুরূহ-সুন্দর বনপথে দুর্গম যাত্রা।

প্রায় সকল প্রবন্ধেই তথ্য, তত্ত্ব ও রস নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে। ভাল মন্দ এবং সাফল্য-বিবেচনার ভার বিদগ্ধ পাঠকের। তবে আমার তরফ থেকে বল্‌তে পারি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অভাব হয়নি কখনো। যে তত্ত্ব আমি নিজে উপলব্ধি করতে পারিনি সে তত্ত্বকে বাক্যজালের আবরণে অধিকতর জটিল ও রহস্যময় করে তুলিনি কোথাও। বিশ্বাস-নিষ্ঠা নিয়ে তথ্য ও তত্ত্বের পথে অগ্রসর হয়ে যেটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি মুগ্ধচিত্তে এবং সবিনয়ে সেটাই প্রকাশ করেছি।

ঋণ আছে অনেকের কাছে যথাস্থানে অকৃপণ হৃদয়ে সে ঋণের কথা স্বীকার করেছি। একটি গ্রন্থ-তালিকাও সংযোজিত হ'ল—এই গ্রন্থ সমূহের গবেষক পণ্ডিত-মনীষীদের কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই।

মুদ্রণ-পরীক্ষা করেছেন বন্ধুবর আবদুল জব্বার। এ বিষয়ের ভুল-ত্রুটি সব তাঁর। অজ্ঞতার জন্যে তথ্য তত্ত্বগত যে অসংগতি রয়ে গেল তার সব দোষটুকু আমার প্রাপ্য।

পরিশেষে, গ্রন্থখানি পাঠকদের এতটুকুও তৃপ্ত করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। ইতি—

সোলেমানপুর, রাজীবপুর
২৪ পরগণা

আবদুল আজীজ আল্-আমান

॥ সূচীপত্র ॥

চর্যাপদ :

জয়দেব ও বাংলা সাহিত্য :

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন :

বৈষ্ণব পদাবলী :

চণ্ডীদাস :

বিদ্যাপতি :

গোবিন্দদাস কবিরাজ :

জ্ঞানদাস :

মহাজন চতুষ্টয় :

মঙ্গলকাব্য :

মৈমনসিংহ-গীতিকা :

বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুস্‌লিম কবি ও কাব্য :

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত :

চট্টোগ্রাম-রোসাঙের মুসলিম কবি ও কাব্য :

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল :

॥ গ্রন্থ-তালিকা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আধুনিক সাহিত্য।

ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ—বিদ্যাপতি-শতক, বাংলা সাহিত্যের কথা।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পূর্ব মৈমনসিংহ গীতিকা।

মণীন্দ্রমোহন বসু—চর্যাপদ, বাংলা সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)

ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত—চর্যাপদ বৌদ্ধগান।

আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—জ্ঞানদাসের পদাবলী।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক—বাংলা মুসলিম সাহিত্য।

ডক্টর সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

অরবিন্দ পোদ্দার—মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যের মধ্যযুগ।

মদনমোহন কুমার—বাংলা সাহিত্যের আলোচনা।

ভূদেব চৌধুরী—বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা।

অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু—মধ্যযুগের কবি ও কাব্য।

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বৈষ্ণব কবিতার রসধারা।

ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত—শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শন ও সাহিত্যে।

তুলসীপ্রসাদ লাহিড়ী—মধ্যযুগের বাংলা কাব্য।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি।

আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোকসাহিত্য।

শ্রীকণক বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা।

॥ চর্যাপদ ॥

॥ এক ॥

॥ চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য ॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ রত্ন-গর্ভা অজন্তা। অজন্তার আবিষ্কারে যেমন শিল্প সুষমামণ্ডিত সমৃদ্ধশালী বিশাল ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার সাথে আমাদের নিবিড় পরিচয় ঘটেছে তেমনি এই চর্যাপদের আবিষ্কার আমাদের বিস্মৃত দৃষ্টির সম্মুখে বাংলা সাহিত্যের আদিমতম সৃষ্টি ধারার গোপন উৎস-মূল খুলে দিয়েছে। চর্যাপদ বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টি-প্রচেষ্টার প্রারম্ভিক নিদর্শন। প্রকৃত এবং অপভ্রংশের ক্রম-পরিবর্তনশীল আলোড়ন বিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে সবে মাত্র যখন বাংলা ভাষা মাতৃগর্ভ হতে জন্মগ্রহণ করেছে জীবনের সেই উষালগ্ন হতেই আপন শক্তির অকৃপণ সহায়তায় সে অসংখ্য কবিকুলের গোপন মনের ধ্যান-ধারণাকে বাঙ্ময় করে তুলেছে, তাদের অন্তরে দিয়েছে সৃষ্টির বেগ। চর্যাপদ সেই সৃষ্টি বেগের প্রথম ফসল। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যুষকালে আলো-আঁধারীর মিলন-লীলায় সে অসংখ্য কবিকণ্ঠে ভোরের শান্ত আকাশ কাকলীমুখর হয়ে উঠেছিল তাঁদের চব্বিশ জনের কণ্ঠমাধুর্য আমরা চর্যাপদের মাধ্যমে উপভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

পৃথিবীর সকল দেশেই সাহিত্যের প্রাথমিক আত্ম-স্ফুরণে ধর্মচেতনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছে। ধর্মকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যের হয়েছে প্রারম্ভিক আত্মবিকাশ, বাংলা সাহিত্যেও এই সাধারণ ধর্মের ব্যতিক্রম নয়। চর্যাপদের মুখ্য রাগিনী তাই ধর্মকে কেন্দ্র করে বেজে উঠেছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস এবং মতকে চর্যাপদের ছন্দ-বন্ধনে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই নীরস ধর্মতত্ত্বের মধ্যে চর্যার সাহিত্যিক মূল্য নিহত নেই, সাহিত্যের বিশেষ রসমূল্য সেখানে—যেখানে চর্যার সকল তাত্ত্বিক-তার্কিকতা কবির ব্যক্তিগত হৃদয়োপলব্ধির আনন্দের অন্তরালে আত্মগোপন করে ছন্দোবদ্ধ সুর মূর্চ্ছনায় 'গান' হয়ে উঠেছে। চর্যাকারগণ আপন ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বটিকে কেবলমাত্র লিপিবদ্ধ করতে চাননি তাঁরা চেয়েছিলেন আপন ধর্ম-মহিমাকে গণচিত্তে সঞ্চারিত করে দিতে। ধর্ম পালনের মধ্যদিয়ে তাঁরা আপন হৃদয়ে যে আনন্দোপলব্ধি করেছিলেন সেই সীমাতিক্রমী আনন্দ-বেগকে আপন হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখা

আর তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি—তার প্রকাশ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। সেই হৃদয়োপলব্ধিজাত সত্যকে সাধারণীকরণের মাধ্যমে চর্যাকারগণ সর্বজন-হৃদয়-সংবেদ্য করে তুলেছেন। ধর্মের নীরস তত্ত্ব-কথাকে—হোক সে হৃদয়োপলব্ধি-জাত সত্য—এই সর্বজন-হৃদয়-সংবেদ্য করে তোলার মধ্যেই রয়েছে এক ঐন্দ্রজালিক-স্পর্শ। এই ঐন্দ্রজালিক স্পর্শেই চর্যাকারগণের রুক্ষ ধর্ম-তত্ত্ব ও অন্তর গূঢ় সাধন পদ্ধতি সকল রুক্ষতা ও কর্কশতার সীমা অতিক্রম করে 'সুন্দর' হয়ে উঠেছে। এই 'সুন্দর' হয়ে উঠার পিছনে আমরা যে ঐন্দ্রজালিক স্পর্শের কথা বললাম তার স্বরূপ। বিশ্লেষণ করলেই চর্যার-সাহিত্যিক মূল্য আমাদের নিকট আপন মহিমায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠ্‌বে। বস্তুতঃ এই ঐন্দ্রজালিক স্পর্শই হলো সাহিত্যের স্পর্শ, কবিতার প্রাণ-স্পন্দনী হ্লাদিনী শক্তি।

কবিতার এই প্রাণ-সঞ্চারিণী হ্লাদিনী শক্তি আত্মগোপন করে থাকে কবিতার ছন্দ-অলঙ্কার, উপমা-রূপক, ভাব-রস ইত্যাদির মধ্যে। সুতরাং চর্যার এই হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনে উল্লেখিত প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমে চর্যার ছন্দ নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

ক॥ চর্যার ছন্দ :—যে সময় (৯৫০-১২৫০ খৃঃ) চর্যাগুলি রচিত হয়েছিল সে সময় সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রভাব ব্যাপক এবং গভীর। কিন্তু চর্যাপদ-গুলি আশ্চর্যভাবে সংস্কৃতের প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে ভিন্নপথে পদচারণা করেছে। সংস্কৃতের জাতি-ছন্দ অনুসরণ না করে চর্যাকারগণ সর্বপ্রথম সংস্কৃতের সর্বগ্রাসী কবল হতে মুক্ত হয়ে ছন্দের নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করেছেন। সংস্কৃতের জাতি-ছন্দ অনুসরণ না করে চর্যাকারগণ মাত্রাবৃত্ত রীতির ধ্বনি প্রধান ছন্দে পদ রচনা করেছেন—যে ছন্দের আর এক নাম পাদকুলক। এই পাদকুলক ছন্দ হতেই পরবর্তীকালে বাংলার সুবিখ্যাত পয়ার ছন্দের জন্ম। সংস্কৃতে সাধারণতঃ অন্ত্যানুপ্রাসের প্রচলন নেই—চর্যাপদের প্রায় সকল পদই এই অন্ত্যানুপ্রাসের অসীম আনন্দে নৃত্যচপল হয়ে উঠেছে। ১নং চর্যা থেকেই উদাহরণ নেওয়া যাক :

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥

বাংলা কাব্য সাহিত্যে পয়ার এবং ত্রিপদীর প্রভাব ব্যাপক এবং গভীর। সুদূর অতীত কাল হতে আধুনিক পূর্বযুগ পর্যন্ত এই দুই ছন্দই বাংলা কবিতার প্রধান হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়ে এই চর্যাপদই হল এই বহুখ্যাত ছন্দের সূতিকাগার। চর্যার বুকেই এদের জন্ম। চর্যার ছন্দ-রীতিকে

অনুসরণ করে পরবর্তী কালে বাংলায় এই দুই ছন্দ গড়ে ওঠে। ত্রিপদীর ক্রম-বর্দ্ধমান ধ্বনির স্পন্দনে চর্যার অনেকগুলি পদ সুন্দর হয়ে উঠেছে :

বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী
বাটত ভইল উছারা।
সদ্-গুরু-পাঅ পসাত্র্যঁ জাইব
পুণু জিণউরা॥

পয়ারের একটি উদাহরণ :

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী। ১৩
হাঁড়িতে ভাত নাহি নিতি আবেশী॥ ১২

অবশ্য চর্যার ছন্দে যে দুর্বলতা নেই তা নয়—বরং অনেক ক্ষেত্রে বহু ত্রুটী, বহু দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছে। উপরে যে পয়ারের উদাহরণটি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে অক্ষর সমতা নেই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন চর্যাগুলি গীত হতো প্রতিটি চর্যার শীর্ষদেশে রাগ রাগিণীর উল্লেখে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ফলে সুরের টানে এবং বিবিধ রাগ-রাগিণীর বিচিত্র তালে এই অক্ষর অসামঞ্জস্য কখনো প্রধান হয়ে উঠতো না—সুর-মূর্চ্ছনার অন্তরালে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে যেতো। সেই সুদূর অতীতকালে যখন বাংলা কাব্য-রীতির কোন আদর্শই গড়ে ওঠেনি সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে চর্যাকারগণ যে প্রায় দুর্বলতাহীন এমন সংগীতধর্মী বলিষ্ঠ পদ ও ছন্দ রচনা করতে পেরেছেন এতো একান্তভাবে তাঁদের শিল্প-সুষম মনোভংগীরই পরিচায়ক।

অক্ষরের সংখ্যা দ্বারা বাংলায় বিবিধ ছন্দের নামকরণ করা হয়ে থাকে—চর্যা হতেই এই রীতির সূত্রপাত। ৪৯ নং চর্যায় 'আজি ভুসু বাঙ্গালী ভইলী'তে 'দশাক্ষরা বৃত্তি' ছন্দের পরিচয় সুস্পষ্ট। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম চতুর্দশপদী কবিতা রচনার রীতি প্রচলন করেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস প্রচলিত এবং দৃঢ় হয়েছে—কিন্তু সুদূর অতীতকালে বাংলা ভাষার গঠমান যুগের চর্যাপদে আমরা এই রীতির প্রাচীনতম রূপের সন্ধান পাই। ১০ম এবং ৫০শ সংখ্যক চর্যা দুটি আমাদের মন্তব্যের পরি-পোষক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাধারণতঃ জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রকাশ ভংগীকে বাংলা ছন্দের আদর্শ বলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় গীতগোবিন্দের বহু ছন্দ তদপেক্ষা পূর্বে রচিত চর্যাপদেরই অনুরূপ। একটি উদাহরণে আমাদের কথার যথার্থতা প্রমাণিত হবে :

২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২
ধীর-সমীরে। যমুনা-তীরে। বসতি বনে বন-। মালী।

২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২
পীন পয়োধর। পরিসর-মর্দন। চঞ্চল-করযুগ-। শালী॥

॥ গীতগোবিন্দ॥

তুলনীয়ঃ

২ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২ ২
উঁচা উঁচা। পাবত তহিঁ। বসঈ সবরী। বালী।

২ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ৩ ৩ ২ ২
সোরঙ্গি পীচ্ছ। পরহিণ সবরী। গিবত গুঞ্জরী। মালী॥

॥ চর্যা—২৮নং ॥

সুতরাং গীতগোবিন্দে নয় চর্যাতেই বাংলা ছন্দের আদিমতম রূপের সন্ধান করা উচিত। কেননা চর্যা একদিকে যেমন প্রাচীনতম অন্যদিকে তেমনি বাংলার সমপ্রকৃতি ছন্দও সেখানে বিরল নয়।

খ ॥ অলংকার ঃ

কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ—এই যদি হয় কাব্যের সংজ্ঞা তাহলে চর্যাপদকে কাব্যের দিগন্ত হতে বহিষ্কারের কোন স্পর্ধা আমাদের নেই। চর্যার নিরাভরণ দেহ অলংকারের অভিনব দীপ্তিতে ঝলকিত হয়ে উঠেছে। অলংকার দু'প্রকার—শব্দালংকার ও অর্থালংকার। বলাবাহুল্য এই উভয়বিধ অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগে রুক্ষ তত্ত্বাশ্রয়ী চর্যার প্রতি অঙ্গ সৌন্দর্য-সুষম হয়ে উঠেছে।

শব্দালংকারের মধ্যে যমক ও অনুপ্রাস সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অনুপ্রাসের জন্যেই আমরা মূল চর্যার অর্থ বুঝি বা না বুঝি শব্দের বিরামহীন ঝংকার আমাদের চিত্তে অপূর্ব শিহরণ আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং শ্রবণ পথের তৃপ্তি ঘটায়। নিম্নের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলেই আমরা চর্যাকারগণের অনুপ্রাস প্রয়োগের নিপুণতা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবো ঃ

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।··· ॥ চর্যা—১নং ॥

সঅ-সম্বেঅণ সরুঅ-বিআরেঁ

অলক্‌খলক্‌খণ ণ জাই··· ॥ চর্যা—১৫নং ॥

নিরন্তর গঅনন্ত তুসে ঘোলাই··· ॥ চর্যা—১৩নং ॥

ছাআ মাআ কাআ সমাণা ॥··· ॥ চর্যা—৪৬নং ॥ ইত্যাদি।

অর্থালংকারের মধ্যে উপমা এবং রূপকের রূপময় প্রয়োগ চর্যার অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে সুন্দর এবং ব্যঞ্জনায়িত করে তুলেছে। চর্যা-সাধকগণ জন-চিত্তের কাছে আবেদনশীল করার জন্যে চর্যাপদ রচনা করেছিলেন, তাই

তাঁর সংস্কৃত-কলংকার শাস্ত্রানুমোদিত অলংকরণকে উপেক্ষা করে প্রাত্যহিক চলমান জীবনের অতিপরিচিত পরিবেশ হতেই অলংকার সংগ্রহ করে গণচিত্তের সম্মুখে আপন ধর্মের দুরূহ ও গূঢ় নীরস সাধন-তত্ত্বগুলিকে স্পষ্টা-লোকে মেলে ধরেছেন। মহাযানীদের মতে নির্বাণ কেবল তত্ত্বমাত্র, তার কোন বাস্তব রূপ নেই, কিন্তু সহজিয়ারা এর নামকরণ এবং রূপপ্রদান করেছেন এমন কি বাসস্থান নির্দেশ করতে ভোলেন নি। মোট কথা-সহজিয়াগণ নির্বাণের একটী বাস্তবরূপ কল্পনা করে বাস্তব উপমা ও রূপকের মাধ্যমে তার সহজতম রূপটি গণচিত্তের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এই নির্বাণকে তাঁরা বলেছেন নৈরাত্মদেবী—নামান্তরে ডোম্বী, শবরী বা চণ্ডালী। এই নির্বাণ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়—সুতরাং এঁর বাসস্থান দেহনগরীর বাইরে দূরে পর্বতের উঁচু টিলায়। বদ্ধ এবং মুক্ত উভয় প্রকার জীবকে নিয়ে ক্রীড়া করেন বলে ইনি নষ্ট চরিত্রা যুবতী বলেও কল্পিত হয়েছেন। নষ্ট চরিত্রা এক যুবতী দূর পর্বতের উঁচু টিলায় নির্জনে একাকী বাস করে—এর অন্তর্নিহিত মর্ম যাই হোক সাধারণকে আকর্ষণ করার জন্যে এইটুকুই যথেষ্ট। সুতরাং এই প্রকার বাস্তব-উপমা যেন চর্যাকারগণের হস্ত হতে নিক্ষিপ্ত লক্ষ্যভেদী বাণ—এর নিক্ষেপ অব্যর্থ। এ ছাড়াও ডোম্ ডোমনীর যুগল প্রেম-সংগঠন, নৌকা বাওয়া, সাঁকো তৈরী, চ্যাঙাড়ী-বোনা, তুলোধোনা ইত্যাদি যে-চিত্রগুলি ধর্মের গূঢ় সংকেতকে আভাসিত করেছে—সেগুলিও চর্যাকারগণ বাস্তব পটভূমি হতেই গ্রহণ করেছেন। অসংখ্য রূপকের প্রয়োগ চর্যার গূঢ় মর্মকে রসরূপের মাধ্যমে সদাজাগ্রত রেখেছে। প্রথম চর্যায় কায়াকে তরুর সাথে তুলনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় চর্যায় নৈরাত্ম সাধকের বধূরূপে কল্পিত, তৃতীয় চর্যায় মদের দোকানে তাঁকে শুড়ি বধুর সাথে তুলনা করা হয়েছে, পঞ্চম চর্যায় পার্থিব জীবন চলমান নদীর সাথে কল্পিত, ষষ্ঠ চর্যায় চর্যা-সাধক-ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে হরিণ শীকারের উপমায়। সুতরাং চর্যার সর্বত্র উপমা-রূপকের বহুল প্রয়োগ তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কথাকে সুন্দর সহজতম রসরূপ দান করেছে। ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশে সাধারণ জীবন-পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে সেই অনুভূতিকে সর্বজন-হৃদয়-সংবেদ্য করে তুলেছে। সাহিত্যে একেই বলে সাধারণীকরণ। "চর্যাগুলি সন্ধ্যাভাষায় রচিত। সন্ধ্যাভাষা আলো-আঁধারী ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার।" এ ভাষায় সন্ধ্যার ম্লান গোধূলি লগ্নের মত এক গভীর রহস্য আছে—কতক স্পষ্ট, কতক অস্পষ্ট, কতক বোঝা যায়, কতক বোঝা যায় না। সুতরাং এ ভাষায় যা প্রকাশ হয় তদপেক্ষা

বেশী অস্পষ্টই রয়ে যায়। প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের সম্মুখে অপ্রকাশের দিগন্ত বহুদূর উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এই সন্ধ্যা ভাষাই শ্লেষ অলংকারের উপযুক্ত ক্ষেত্র—কেননা শ্লেষ অলংকারও সন্ধ্যা ভাষার মত লীলাময়ী। একই শব্দ যখন দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হয় তাই শ্লেষ অলংকার হয়ে ওঠে।
চর্যার বহুপদে শ্লেষ অলংকার প্রয়োগ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে :

সোনে ভরতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥…॥ চর্যা—৮নং ॥

এখানে রূপা শব্দটি দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় শ্লেষ অলংকার হয়ে উঠেছে। সমাসোক্তি অলংকারের প্রয়োগ চর্যার বহুস্থানে লক্ষ্য করা যায়। দুর্জ্ঞেয় নিরাত্মাকে শবরী রূপে কল্পনায়, চঞ্চল চিত্তকে মুষিক রূপে বর্ণনায় সমাসোক্তি অলংকারের সমাবেশ হয়েছে। চর্যার কোন কোন পদে বিরোধ অলংকারও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। "বলদ বিআইল গবিআঁ বাঁঝে" (বলদ বিয়াইল গাভী হয় বন্ধ্যা) এবং "যো সো চৌর সোই সাধী" (যে চোর সেই সাধু) ইত্যাদি পদগুলি বিরোধ অলংকারের সার্থক প্রমাণ। অলংকার প্রয়োগে চর্যাকারগণের সুনিপুণ দক্ষতা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী বলেছেন : "ভারত চন্দ্রের অলংকরণ প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে সর্বজন প্রশংসিত। কিন্তু প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় চর্যাকারগণের এই অলংকরণ প্রচেষ্টাও কম প্রশংসনীয় নয়,—বরং অধিকতর বিস্ময়কর, দুরূহ ভাষা এবং কঠিন প্রকাশ ভংগীর গণ্ডী অতিক্রম করে চর্যা সাহিত্যের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করলে এ সত্য উপলব্ধি হতে পারবে, ভারত চন্দ্র যেখানে কেবল বিদগ্ধ বাগ্‌জালই বিস্তার করেছেন। সেখানে চর্যাকারগণ অলংকার-সাহায্যে বস্তু-নিষ্ঠ জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনানুভূতিকে সার্থক রূপ-মূর্তি দান করেছেন।"

গ ॥ চর্যার ধ্বনি : কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয়ে কেউ কেউ বলেছেন "ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য" বা বক্রোক্তি জীবিত।" বলাবাহুল্য উভয়বিধ লক্ষণই চর্যায় প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান। ধ্বনিবাদীর মতে যে ছন্দোবদ্ধ কবিতায় বাচ্য অপেক্ষা বাচ্যাতীতই প্রধান হয়ে উঠে, বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থেরই প্রাধান্য সূচিত হয়—সেই রচনাই আদর্শ কবিতা। চর্যার বহু স্থানেই এই লক্ষণের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে, আমরা পূর্বেই বলেছি নীরস তত্ত্বকথাকে গণচিত্তের কাছে আবেদনশীল করার জন্যে চর্যাকারগণ বহুবিধ রূপকের ব্যবহার করেছেন। এই রূপকের বাহ্যার্থ ই তাঁদের কাছে প্রধান নয় রূপকের অন্তরালে ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব-

গুলিকে প্রচার করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। সুতরাং চর্যার প্রায় সর্বত্রই রূপক অপেক্ষা রূপকাতীত, বাচ্য অপেক্ষা বাচ্যাতীতের প্রকাশই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

ঘ ॥ চর্যার রস : রসবাদীরা কাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম" অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বলা বাহুল্য এই মানদণ্ডে বিচার করেও চর্যাপদকে কোন প্রকারে কাব্যের দিগন্ত হতে বহিষ্কার করে দেওয়া যায় না। রসের মধ্যে আদি রসই শ্রেষ্ঠ, চর্যার বহু স্থানেই আদিরসের প্রয়োগ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। একটি উদাহরণ :

দিবসই বহুড়ী কাডই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাস ॥ ॥ চর্যা—২নং ॥

অনুবাদ :

দিবসে বধূটি কাঁদে ভয়ে হয়ে ভীত।
রাত্রিতে চলিয়া যায় কামে হয়ে প্রীত ॥

এ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় মনীন্দ্রমোহন বসুর মন্তব্য বিশেষরূপে স্মরণ যোগ্য : "উক্তিটি সরস বটে, কিন্তু তত্ত্বান্বেষীগণ এই বধূটির খোঁজ করিতে গলদঘর্ম হইবেন। তত্ত্বের মরুভূমিতে কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত রসের ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।"

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী"....(চর্যা-২৮নং)

ইত্যাদি কবিতাটির মধ্যেও আদি রসের প্রাবাল্য অনুভব করা যায়। কানে কুন্তল, গলায় গুঞ্জার মালা, পরণে বহুবিচিত্র ময়ূর পুচ্ছ ইত্যাদি সাজে সজ্জিতা হয়ে শবরী বালা একাকী পর্বতের শিখরে ভ্রমণ করে, শবর তাকে চিন্‌তে না পেরে পরকীয়া প্রেমের প্রাণোন্মাদিনী তীব্রতা অনুভব করে। পরে বিস্ময় দূর হলে চিরপুরাতন প্রেয়সীর সাথে চির নতুন মিলনে দৃঢ়বদ্ধ হয়। এখানে রসের প্রবল স্ফুরণের দোলায়িত তরঙ্গাঘাতে সকল তত্ত্বকথা কোথায় ভেসে গেছে। প্রেম ব্যাকুল শবরের উন্মত্ত প্রেমাবেগ সঞ্চারী ভাবে পাঠক-চিত্তে সঞ্চারিত হয়ে কাব্য রসে সমস্ত দেহমন আপ্লুত করে দিয়েছে।

সুতরাং অলংকারবাদ, ধ্বনিবাদ, রসবাদ যে দিক হতেই বিচার করা যাক না কেন চর্যাপদকে সার্থক কাব্য বলতে আমরা বাধ্য।

ঙ ॥ চর্যার প্রবচন : এ ছাড়াও চর্যার কয়েকটি পদ প্রবচনের আকার ধারণ করেছে। ভাষা ব্যবহারে অপূর্ব দক্ষতা না থাক্‌লে কখনো ভাব প্রবচনের সৃষ্টি করতে পারেনা। বলাবাহুল্য সে দক্ষতা চর্যাকারগণের ছিল।

তাই "অপনা মাংসে হরিণা বৈরী" (আপনার মাংসেয় হরিণ নিজেই নিজের শত্রু), "হাথেরে কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ" (হাতের কঙ্কন দেখার জন্যে দর্পণের প্রয়োজন নেই), "সুণ গোহলী কিমো দুঠ বলন্দে" (দুষ্ট গরু হতে শূন্য গোয়াল ভাল) ইত্যাদি পদগুলি সেই প্রাচীন কাল হতেই আপন প্রবাহ ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে অতি আধুনিক কালের দ্বার-প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

চ॥ চর্যায় ধাঁধা: বাংলায় প্রচলিত কয়েকটি ধাঁধার সন্ধানও আমরা চর্যাপদের মধ্যে পাই। "বলদ বিআইল গবিআঁ বাঁঝে", "নিতি নিতি শিআলা সিহে সম যুঝএ। ঢেণ্টণ পাএর গীত বিরলে বুঝএ" ইত্যাদি ছত্রগুলির মধ্যে বাংলা ধাঁধার আদি রূপটি অনুভব করা যায়।

চর্যার সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয়ের জন্য আমরা ছন্দ, অলংকার, উপমা, রূপক, রস, ধ্বনি, প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদি বহু বিষয়ের আলোচনা করেছি—কিন্তু এ সবের অতিরিক্ত আছে কবি হৃদয়ের ব্যক্তিগত অনুভূতির নিবিড়তা। এই নিবিড় অনুভূতির তীব্র বেগই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে চর্যার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। এই তীব্র বেগই সকল তাকিক-তাত্ত্বিকতাকে অতিক্রম করে চর্যাকে সাহিত্যের দিগন্তে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র সংগ্রহ করে দিয়েছে। এই অন্তরাবেগই ধর্মের নিরস মরুভূমি হতে চর্যাকে নিয়ে এসেছে সুন্দরের রসলোকে।

॥ দুই ॥

॥ চর্যাপদে সামাজিক চিত্র ॥

চর্যাপদকে আমরা অজন্তা-ইলোরার সমগোত্রীয় করেছি। অজন্তার আবিষ্কারে যেমন সম্পদশালী ভারতের আদিম সভ্যতার সাথে সমাজ জীবনের বিচিত্র ধারার সন্ধান আমরা পেয়েছি তেমনি চর্যাপদের আবিষ্কারেও বাংলা সাহিত্যের আদিমতম সৃষ্টিধারার সাথে আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়েছে সমকালীন সমাজ-জীবনের মর্মালেখ্য। চর্যাপদ প্রাচীন বাংলার সমাজ-চিত্রের এক বহু-বিচিত্র এ্যালবাম। সমাজের অতি খুঁটিনাটি দিকও এ গ্রন্থে সুঅঙ্কিত হয়েছে। অবশ্য এই সুঅঙ্কনের অন্তরালে উপযুক্ত কারণ বিরাজমান। সাহিত্যে সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি। যিনি লেখক তিনি সামাজিক জীব—সুতরাং তাঁর সৃষ্ট কর্মে যে সমাজ-চিত্র অঙ্কিত হবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ সব সাধারণ কারণ ছাড়াও চর্যাপদে সমাজ-চিত্র-অঙ্কনের আর এক গভীরতর কারণ

রয়েছে। চর্যাকারগণ আপন ধর্মতত্ত্বকে জন সাধারণের চিত্তে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন এবং সাধারণ সমাজে আপন ধর্মবোধকে প্রচার করতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁরা সংস্কৃত সাহিত্যের রাজসিক উপমা রূপকের শান বাঁধান পথ পরিত্যাগ করে নেমে এসেছিলেন ধূলি মাটির পথ বেয়ে লৌকিক জীবনের কেন্দ্র ভূমিতে। 'অন্তর হতে আহরি বচন' নয় এই স্থূল লৌকিক জীবন হতে তাঁরা উপমা রূপক আহরণ করে এক অভিনব বাণী-মূর্তি নির্মান করেছেন। এ বাণী-মূর্তির অন্তরালে তাই ধরা পড়েছে লৌকিক সমাজ জীবনের অভিনব রূপ।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাংলা দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। বাংলা দেশ তখন অনার্য জাতিরই প্রায় একচেটিয়া আবাস-ভূমি হয়ে উঠেছিল। অনার্য জাতির মধ্যে কোল, শবর, রাজ বংশী, ডুলে বাগদী, বাউড়ী ইত্যাদি ছিল প্রধান—এবং প্রাচীন সমাজে এদের ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্থান। চর্যাপদের মধ্যে নানা ভাবে বার বার এই আদিমজাতি সমূহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এদের সমাজ জীবনের কথা, এদের ধর্মপালনের কথা, এদের বিবাহ ইত্যাদির বর্ণনা—চর্যায় সুন্দর রূপে বর্ণিত হয়েছে। আর্য জাতির কথা বাদ দিয়ে অনার্য জাতির কথা এই ভাবে বার বার উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয় তখনো বাংলা দেশে সর্বভারতীয় আর্য সংস্কৃতি প্রধান্য লাভ করতে পারেনি। গ্রামীন জীবনে তখনো আদিম জাতি সমূহের প্রতিপত্তিই প্রধান হয়েছিল।

বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম সৃষ্টি চর্যায় যে সমাজ চিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করি—যদি ধৃষ্টতা না হয় তা হলে বলা চলে—লৌকিক জীবনের তেমন নিখুঁত চিত্র সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যের কোথাও নেই। মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা পেয়েছি দেবদেবীর চিত্র, ধনিক সম্প্রদায়ের কেলি বিলাস এবং মধ্যে মাঝে লৌকিক জীবনের রূপায়ণ কিন্তু চর্যাপদে যে চিত্র পাই তা কোন দেব দেবীর নয়, কোন রাজা উজিরেরও নয়, একেবারে নিখুঁত লোক-জীবনের। আদিম জাতির প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার আচার অনুষ্ঠানে প্রতিটি চিত্রই উজ্জ্বল। লৌকিক সমাজের যে দৈনন্দিন পারিবারিক চিত্র চর্যায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে তা হতে জানা যায় সমাজের অধিকাংশ লোকই ছিল শ্রমশীল এবং মেহনতী। কিন্তু মেহনতী জনগণের ভাগ্যে যে অভিশাপ আজও বিদ্যমান সেই দারিদ্র্য, দুঃখ সেদিনও ছিল তাদের একমাত্র প্রাপ্য। শবর পাদের উঁচা "উঁচা পাবত" (২৮) চর্যাটিতে তৎকালীন আদিবাসীদের পারিবারিক

জীবনের একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। পাহাড়ের উপরে উঁচু টিলায় শবর শবরী বাস করে, শবরী বালা গলায় পরিধান করে গুঞ্জারের মালা, এবং কানে পরে কুণ্ডল। একখানি পর্ণকুটীর তাদের সম্বল। নিকটেই কাগ্‌নীর খেত, কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা। কাগ্‌নী ধান পেকে উঠ্‌লে উৎসবের আনন্দ কোলাহলে সমগ্র পল্লী মুখর হয়ে ওঠে। চাটিল পাদের একটি চর্যায় (৫) গাছ কেটে পাট জুড়ে সাঁকো নির্মানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

ফাড়িঅ মোহতরু পাটী জোড়িঅ।
অদয় দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ।

বিরুবা পাদের (৩) চর্যায় মদ তৈরীর উল্লেখ আছে। কহ্নুপাদের "নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া" (১০) চর্যাটি তৎকালীন সামাজ-জীবনের একটি সুন্দর আলেখ্য। চর্যাকারগণ যে পরধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন—অন্ততঃ বিদ্বেষী না হোক্ নিন্দা করতেন—তা' এই পদটি হতে জানা যায়। বেদ পুরাণ দার্শনিকতা এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মচারণের নিন্দায় চর্যাকারগণ পঞ্চমুখ। এই পদটির "বাহ্মণ নাড়িআ" অর্থাৎ নেড়ে ব্রাহ্মণ সিদ্ধাচার্যগণের আক্রোশজাত বক্রোক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ। এই পরধর্ম বিদ্বেষ বা নিন্দা ছাড়াও ডোম জাতির বৃত্তির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তাঁত নির্মান, চ্যাঙাড়ী বোনা এবং নৌকা বাওয়া ছিল তাদের অন্যতম বৃত্তি। কাপালিকেরা হাড়ের মালা পরতো এবং নগ্ন থাক্‌তো—এছাড়া তাদের অন্যমত বৃত্তি নট-ব্যবসায়ের উল্লেখও এ চর্যায় আছে :

তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরণা চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া॥

ডোমেরা ছিল সাধারণ নাগরিকের কাছে ঘৃণার পাত্র—তাই নগরের মধ্যে তাদের বাস নিষিদ্ধ ছিল। তারা বসবাস করতো নগরের উপকণ্ঠে—নাগরিক পরিবেশ হতে দূরে। কাহ্নুপাদের "ভনির্বাণে পড়হ মাদলা" (১৯) চর্যাটির মধ্যে পাই ডোম বিবাহের পূর্ণাঙ্গ চিত্র। বিবাহের সময় প্রয়োজন হয় দুন্দুভি, ঢাক ঢোলের বাজনা। বাদ্য-যন্ত্রের তুমুল বাদ্যে পথ উতরোল করতে করতে বিবাহ করতে যায় ডোম এবং বিবাহান্তে নববধূর সাথে রাত্রি যাপন করে। ডোমের বিবাহেও যে যৌতুকের প্রয়োজন হতো এ চর্যাটি তারই প্রমাণ বাহী।

ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥

চর্যায় একদল যাযাবর শ্রেণীর কথা বার বার উল্লিখিত হয়েছে। এই যাযাবর

শ্রেণীর লোকেরা কখনো নৌকাযোগে, কখনো পদব্রজে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত। নাচগান দেখিয়ে এবং ঔষধ বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। এই যাযাবর শ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ হলো বর্তমানের বেদের দল। স্ত্রী পুরুষের মেলামেশার অবাধ অধিকার ছিল। 'বাপুড়ী'র সাথে ডোম্বীর সম্মিলিত নৃত্যের তালে যে ছবি ফুটেছে তাতে রক্ষণশীলতার কোন পরিচয় নেই—আছে সমকালীন সমাজ-জীবনের উলঙ্গ বাস্তবালেখ্য।

বাংলা দেশ নদীমাতৃক। বাংলা সাহিত্যে নদীর হয়েছে তাই অবাধ সঞ্চার। মধ্যযুগের সমগ্র সৃষ্টিতে নদীর কথা বার বার বিভিন্ন ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। চর্যাপদেও এই নদীর চিত্র বহুবার অঙ্কিত হয়েছে। নদীর প্রসঙ্গেই এসেছে নৌকার কথা, দ্রুত দাঁড় ফেলে পাল তুলে নৌকা বাওয়ার কথা। নৌকায় নদী পার হতে পাড়ানী লাগতো এবং কড়ি নেই বল্লেও যে যাত্রীদের নিস্তার ছিলনা তার ইংগিত পাওয়া যায় ডোম্বীপাদের "গঙ্গা জউনা মাঝাঁরে বহই নাঈ" চর্যাটিতে। শান্তিপাদের "তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু" চর্যাটিতে (২৬নং) তুলা ধোনার কথা বর্ণিত হয়েছে। ধামপাদের চর্যায় (৪৭নং) পাই ঘরে আগুন লাগার কথা। বীণাপাদের চর্যাটিতে (১৭নং) বীণার তানে কণ্ঠ মিলিয়ে গান করা এবং তালে তালে নৃত্যের বর্ণনা ফুটে উঠেছে। শ্বশুর (সসুরা), শাশুড়ী-ননদ (সাসু-ননদ), বউ (বউড়ী) এবং প্রতিবেশীদের (পড়িবেষী) নিয়ে গৃহস্থেরা শান্তিতে একত্রে বসবাস করতো। কিন্তু এই শান্তি যে বার মাস তাদের ভাগ্যে জুটতো না তার প্রমাণ নিহিত রয়েছে "হাঁড়িতে ভাত নাহি" চর্যাটিতে। এর থেকে অনুমান করা যায় তৎকালীন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের। কিন্তু এর পাশেই আবার শবরপাদের ৫০নং চর্যায় অঙ্কিত হয়েছে ধনীর গৃহসজ্জার চিত্র। একটি চর্যায় বিছানাপাতা খাটে শয়ন করে বিলাসীর পান (তাবোল) কর্পূর (কাপুর) দিয়ে খাওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে। পথে প্রান্তরে এবং জলযাত্রায় ছিল দস্যুর ভয়। ভুসুকুপাদের একটি চর্যায় (৪৯নং) নৌ সৈন্য অথবা জলদস্যু কর্তৃক বাংলাদেশ লুণ্ঠনের ইংগিত রয়েছে। চোর ধরার জন্যে দারোগা (দুষাধী) ছিল এমন কি থানা বা কাছারীরও (উথারী) উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন উপায়ে আপন জীবিকা অর্জন করতো। ডোম এবং যাযাবর শ্রেণীর কথা আমরা পূর্বেই পেয়েছি। কৈবর্তরা মাছ ধরতো। ধুনুরীরা ধুনতো তূলা। ছুতোর মিস্ত্রীদের কাজের কথাও কিছু উল্লিখিত হয়েছে চর্যায়। ধার্মিক লোকেরা আগম-পুঁথি পড়তো, কোশাকুশি নিয়ে পূজো করতো—মালা জপ করাও ছিল

তাদের আর একটি উদ্বৃত্ত কাজ। বিদ্বান ব্যক্তিদের যে বিশেষ কদর ছিল চর্যায় তারও ইংগিত রয়েছে। এমনি করে চর্যার সর্বত্র সাধারণ বাঙ্গালীর জীবন-চিত্র সুন্দর হয়ে ফুটেছে অবশ্য ধনী-সমাজের চিত্র যে একেবারেই নেই তা নয়—তবে বিত্তশালী লোক-জীবনের যে চিত্র পাই তা সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্রনের তুলনায় ভগ্নাংশ মাত্র। ধনীর গৃহে নিত্য উপাসনা হতো, দেববিগ্রহের নামেরও উল্লেখ আছে। চোর ডাকাতদের দ্বারা আকস্মিক গৃহ লুণ্ঠিত হলে নিঃস্ব হৃদয়ের বেদনা যে তীব্র হতো তার ইংগীত পাওয়া যায় একটি চর্যায়।

আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি চর্যাকারগণ আপন ধর্মের মাহাত্ম্যকে জনচিত্তের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন। এই চর্যা-সাধকেরা একদিকে যেমন ছিলেন উচ্চস্তরের ধর্ম-সাধক তেমনি অন্যদিকে ছিলেন তৎকালীন সামাজিক জীবন-যাত্রার সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। এই নিবিড় পরিচয়ের ফলেই নীরস ধর্মতত্ত্বের মাঝেও সামাজিক জীবন-চিত্র বার বার বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রস-মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমাজের সাথে চর্য্যাকারগণের এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল বলেই চর্যায় অঙ্কিত হাজার বছরের পুরোণো সমাজ-চিত্র আজও অম্লান হয়ে রয়েছে।

॥ তিন ॥

॥ পরবর্তী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে চর্যার প্রভাব ॥

চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সৃষ্টি। কিন্তু প্রাচীন ভাষায় প্রাচীনতম সৃষ্টি হলেও এই গ্রন্থটির মধ্যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা, ছন্দ ও কাব্য রীতির অনেক উপকরণই বিদ্যমান। বস্তুতঃ চর্যাপদগুলি আধুনিক বাংলা ভাষার অমার্জিত সংস্করণ। অমার্জিত কিন্তু সকল কিছুই বীজাকারে নিহিত। অপভ্রংশের পরবর্তী স্তরে প্রাচীন বাংলা ভাষার জন্ম। অপভ্রংশ হতে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষা বহুকাল কথ্য ভাষা রূপেই ব্যবহৃত হয়ে এসেছিল—পরে তা' সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত হয়। বাংলা ভাষা যখন অভিজাত রূপ পরিগ্রহ করে' সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত হয়—সেই আভিজাত্য-গর্বী ভাষা দিয়েই রচিত হয় চর্যাপদ। সুতরাং চর্যাপদ হলো বাংলা ভাষার সাহিত্যিক রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন।

প্রাকৃত অপেক্ষা তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায় চর্যায়। যেমন : পঞ্চ,

চঞ্চল, গম্ভীর, মাতঙ্গী ইত্যাদি। আধুনিক বাংলা ভাষায় যে তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষিত হয় এই চর্যাপদ হতেই তার সূত্রপাত।

ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়েও চর্যা আধুনিক বাংলা ভাষাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলায় অনেক সময় 'অ-কার' 'ও-কার'-এর মত উচ্চারিত হয়—যেমন: ভালো, করো প্রভৃতি। চর্যাপদ হতেই এই উচ্চারণ-বিশিষ্টতার সূত্রপাত। চর্যাপদে আমরা কৃত স্থলে পাই কিউ, গত স্থলে পাই গউ। 'অ' প্রথমতঃ 'ও' এবং পরে 'উ'তে পরিণত হয়েছে। চর্যায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বরই অবিচারিত ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—যথা: পঞ্চ এবং পাঞ্চ। আধুনিক বাংলাতেও এই হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণের বিভিন্নতা রক্ষিত হয় না, সে জন্যই আমরা উচ্চারণের দ্বারা বিভিন্নতা প্রতিপাদন না করে (হ্রস্ব) ই, (দীর্ঘ) ঈ প্রভৃতি পাঠ করে থাকি।

ত-বর্গ ও ট-বর্গের অন্তর্গত বর্ণ হতে বাংলায় ড় ও ঢ় এর উদ্ভব হয়েছে—যথা: পততি বা পঠতি হ'তে পড়ে, গঠতি হতে গড়ে। দুই বর্গের মাঝে এই যে নতুন বর্ণের উদ্ভব এ হল বর্ণের অত্যাধুনিক পরিণতি। কিন্তু এই পরিবর্তনের আভাস পাই চর্যার মধ্যে। যথা: কেডুআল হতে কেড়ুআল। বাংলায় বিভিন্ন জ, ন, ব এবং স এর উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না—এ হল বাংলার নিজস্ব বিশিষ্টতা। আমরা এখন এই বিভিন্নতা স্পষ্ট করার জন্যে (তালব্য) শ, (মূর্দ্ধণ্য) ষ, (দন্ত্য) স ইত্যাদি পাঠ করে থাকি। চর্যার আদর্শ পুথি লিখিত হওয়ার কালে এই উচ্চারণ-বিভিন্নতা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যথা: মন (চর্যা-২০) কিন্তু এই মণ (চর্যা-৩০)। ৫০নং একটি চর্যার মধ্যেই লিখিত হয়েছে শবর, ষবরালী এবং সবর।

আধুনিক বাংলা ভাষায় কোন কোন কারকে সাধারণতঃ একবচনে কোনই বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। যথা: রাম খাইতেছে, ভাত দাও ইত্যাদি। এক-হাজার বছর পূর্বে রচিত চর্যা হতেই বোধ হয় এর সূত্রপাত। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল:

কর্ত কারকে: কাআ তরুবর পঞ্চ বিডাল।

কর্ম কারকে: দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।

করণ কারকে: বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পানী।

বাংলায় যেমন বহুবচন বোঝাবার জন্যে বহুত্ব বোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে—যথা: গাছগুলি, পাখীসব ইত্যাদি—সেরূপ দৃষ্টান্ত চর্যাতেও পাওয়া যায়; যথা: সঅল সমাহিঅ, মণ্ডল সঅল ইত্যাদি। কখনো কখনো সংখ্যা দ্বারাও

বহুবচন বুঝান হয়েছে। যথা: দুই ঘরে, পঞ্চ ডাল ইত্যাদি। তবে এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় এই আধুনিক বাংলায় বহুত্ব বোধক 'রা' বা 'এরা' চর্যাতে নেই। সমান সবর্ণে দীর্ঘ হয়, এই সূত্রানুযায়ী গঠিত সমস্ত পদের দৃষ্টান্ত চর্যাতেও লক্ষ্য করা যায়—যথা: অজরামর, ভাবাভাব ইত্যাদি। আধুনিক বাংলার ন্যায় প্রায় সর্ববিধ সমাসের দৃষ্টান্তও চর্যায় পাওয়া যায়। যথা: কমল রস (তৎপুরুষ), মহাসুহ (কর্মধরায়), ভবজলধি (রূপক), বামদাহিণ (দ্বন্দ্ব), অপরবিভাগা (বহুব্রীহি) ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলা এবং সংস্কৃতের ন্যায় য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি চর্যায় পরিলক্ষিত হয়—যেমন: নিকটে=নিষড়ী (নিয়ড়ী), আয়াতি=আবয়ি (আঅই)।

ভবিষ্যৎকাল বুঝাতে চর্যায় 'ইব' প্রত্যয় হতো—যেমন: করিব নিবাস, তুম্হে জাইবে। এই 'ইব' প্রত্যয় আধুনিক বাংলায় ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ব্যাকরণগত উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও চর্যাগীতিতে এমন কতকগুলি বিশিষ্ট প্রয়োগ পাওয়া যায় যেগুলি বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। যেমন: থির করি (স্থির করে), শুনিয়া লেহঁ (শুনে নিই); দুহিল দুধু (দোহা দুধ) ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যে চর্যার প্রভাবের জন্য পূর্ববর্তী অধ্যায়ের "চর্যার সাহিত্যিক মূল্য" দ্রষ্টব্য।

॥ চার ॥

॥ চর্যার ধর্মমত বা দার্শনিকতা ॥

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক-সম্প্রদায়ের ধর্ম-সাধনার নিগূঢ় সংকেত-বাণী বহন করে আমাদের নিকট চর্যাপদগুলির আত্মপ্রকাশ। চর্যাপদে ইসারা-ইংগিতে আভাসিত হয়েছে সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মসাধনার গুহ্য তত্ত্ব কথা। কিন্তু এই তত্ত্ব কথার গহন-গভীরে প্রবেশ করার আগে আমরা সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ইতিহাসটি জেনে নিতে চেষ্টা করবো।

বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য ভবজন্ম হতে মুক্তিলাভ করে নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া। এই নির্বাণ লাভ বা ভবচক্র হতে মুক্তি প্রাপ্তির উপায়কে কেন্দ্র করেই বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। জীব মাত্রকেই বার বার চক্রক্রমে ভবচক্রের আবর্তনে ঘুরে অসংখ্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। এই বেদনা-ব্যথার, দারিদ্র্য-দুঃখের দাবদাহ

হতে নিজেকে মুক্ত করার অর্থই হলো ভবচক্র (whirl of existence) হতে নিজেকে ছিন্ন করা। কিন্তু এই ভবচক্র হতে নিজেকে ছিন্ন করার উপায় কী? বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেছেন মানুষের অন্তরে হয় 'অবিদ্যা'র জন্ম—এই অবিদ্যাই তাকে বার বার ভবচক্রের নির্মম গতিশীলতার মাঝে টেনে আনে। সুতরাং ভবচক্র হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে পরম লভ্য নির্বাণ পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন নির্বাণ-পথের পরম এবং প্রধান শত্রু অবিদ্যাকে দূর করা। অবিদ্যার প্রতি মানুষের আর কোন আকর্ষণ না থাকলে নির্বাণ লাভ সহজ হয়ে উঠে। কিন্তু এই অবিদ্যা দূর করা যায় কী দিয়ে? বৌদ্ধ-দার্শনিকগণের মতে এই অবিদ্যা দূর করার জন্যে প্রয়োজন শূন্যতা জ্ঞানের। বৌদ্ধ ধর্মের দুই প্রধান মতবাদী দল হীনযান ও মহাযান উভয়ই এই শূন্যতাবাদকে গ্রহণ করেছেন।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনতম রূপ নিয়ে হীনযান গঠিত এবং পরবর্তীকালে যে মতবাদ গড়ে উঠে তা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহাযান। ধর্মমতের দিক দিয়ে হীনযানী মতবাদ রক্ষণশীল এবং সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ। হীনযানী মতাবলম্বীদের কাছে ব্যক্তিগত মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই চরম। এই মুক্তি লাভের পথও ছিল দুর্গম—কঠিন নৈতিক আদর্শ ও দুরূহ সাধন-পন্থায় এই মতে নির্বাণ লাভ ছিল প্রায় প্রাণান্ত ব্যাপার। হীনযানীদের সাধন-পন্থায় চারটি স্তর—স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ। শূন্যতা জ্ঞানের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে জগৎ ও জীবনের পশ্চাতে কোন সত্য নেই জেনে অবিদ্যার ধ্বংস সাধন করে অর্হৎত্ব লাভই হল এই মতবাদের চরম লক্ষ্য। এই মতবাদের পিছনে নিয়ম-নীতির প্রচণ্ড শাসন থাকায় এবং সর্বোপরি সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকায় জনসাধারণ এই মতবাদের ওপর হতে আস্থা হারাতে থাকে। ফলে উদ্ভব হয় মহাযান মতবাদের। মহাযানীদের দৃষ্টি ভংগীর উদারতা এবং এক বিশ্বপ্রসারী মনোভাব এই মতবাদের পরিপুষ্টির অন্তরালে বেগ সঞ্চার করেছে। কেবল ব্যক্তিগত মুক্তিই তাঁদের কাম্য নয়—ব্যক্তিগত মুক্তির সাথে তাঁরা চেয়েছেন নিখিল বিশ্ব-মানবের দুঃখ-মুক্তি। ফলে শূন্যতা জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার ধ্বংস সাধনে কেবল মাত্র অর্হৎত্ব লাভই তাঁদের লক্ষ্য হয়ে উঠেনি—তাঁদের সমগ্র ধ্যান-সাধনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে শূন্যতা-জ্ঞানের সাথে করুণার সংমিশ্রণে বোধিচিত্ত লাভের ওপর। এই করুণার স্বরূপ কী? করুণা হলো ভবচক্রে বেদনা-লাঞ্ছিত নিখিল বিশ্বের অসংখ্য মানবের জন্য অপরিসীম বেদনা-বোধ। সুতরাং বোধিচিত্ত হল শূন্যতা-জ্ঞানের সাথে বিশ্ব-মানবের জন্য অপরিসীম করুণা বোধে নতুন চেতনায় আলোকোদ্ভাসিত চিত্ত—শূন্যতা ও করুণার সমান্বিত রূপ। সুতরাং মহাযানী মতবাদের প্রভাবে

বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ হতে নৈতিক-নৈষ্টিকতার কড়াকড়ি এবং সংকীর্ণতা দূর হলো আর হীনযানীদের শূন্যতাময় 'নেতিবাচক' (negative conception) নির্বাণ করুণার সংমিশ্রণে বোধিচিত্তের মধ্যে একটি 'ইতি বাচক' (posative conception) রূপলাভ করলো। 'উদার নীতির পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত মহাযান যখন তার 'মহাযান' নিয়ে মানুষের দ্বার প্রান্তে আবির্ভূত হল তখন সর্বদলের সর্ব শ্রেণীর মানুষ মুক্তিলাভের আশায় সেখানে প্রবেশ করলো।' ফলে অল্পদিনের মধ্যে এই মতবাদ বাংলার লোক-সমাজের কাছে ব্যাপক প্রিয় হয়ে উঠ্‌লো। সর্বশ্রেণীর লোক মহাযানের অন্তর্গত হওয়ায় বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লৌকিক মতবাদ এবং আচার অনুষ্ঠানও এই মহাযান মতবাদে অনুপ্রবিষ্ট হতে লাগলো। নিয়ম বন্ধনের শিথিলতার জন্য একদিকে যেমন মহাযান ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল তেমনি বিভিন্ন লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের ক্রমপ্রচলনে মহাযানের ধর্মমতের বিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠলো। এবং অনিবার্যতার ফলস্বরূপ মূল মহাযান ভেঙে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ইত্যাদি রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। কিন্তু ডক্‌টর শশিভূষণ দাসগুপ্তের মতে সহজযান নামে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উল্লেখ বৌদ্ধ তন্ত্রাদিতে নেই। তিনি বলেন বজ্রযান-পন্থী একদল সাধকের কতকগুলি মত-বৈশিষ্ট্য ও সাধন-বৈশিষ্ট্য দিয়ে এই নামটি পরবর্তীকালে গড়ে উঠে। বজ্রযান মতবাদের পত্তন হয় 'মন্ত্র' 'মুদ্রা' ও 'মণ্ডল' ইত্যাদি নিয়ে তান্ত্রিকাশ্রয়ী রূপে। এছাড়াও বজ্রযানে ছিল বিবিধ দেবদেবীর পূজা অর্চনা এবং তান্ত্রিক পদ্ধতির কতকগুলি গুহ্য যোগ-সাধনা।

সহজযান মূল মহাযান থেকেই উৎপন্ন হোক কিংবা বজ্রযান থেকেই আসুক এখন সহজযানের সাধনপদ্ধতি ও ক্রিয়া কলাপের দিকে আমাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য দিতে হবে। চর্যাপদের প্রতিটি চর্যা এই সহজিয়াদের ধ্যান-ধারণার অনুলিখন।

সহজযানের মতবাদ নিয়ে আলোচনার প্রারম্ভেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই সহজযান নামের অন্তরালে এই মতবাদের কোন প্রচ্ছন্ন ইংগিত আছে কী না। শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাসগুপ্তের মতে "এই সম্প্রদায়ের সাধকগণকে সহজিয়া বলিবার দুইদিক্ হইতে সার্থকতা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ ইহাদের 'সাধ্য'-ও ছিল সহজ আবার 'সাধনা'ও ছিল সহজ, প্রত্যেক জীবনের প্রত্যেক বস্তুরই একটি সহজ স্বরূপ আছে—ইহাই তাহার সকল পরিবর্তনশীলতার ভিতরে অপরিবর্তিত স্বরূপ। এই সহজ স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া মহাসুখে মগ্ন হইতে হইবে—ইহাই হইল এই পন্থী সাধকগণের মূল আদর্শ—এই জন্যই ইঁহারা

হইলেন সহজিয়া। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা সাধনার জন্য কোনও বক্রপথ অবলম্বন করিতেন না—গ্রহণ করিতেন সরল সোজা পথ. এই জন্যও তাঁহারা সহজিয়া।"
সহজিয়াগণ সর্বদা আপন সাধন-পদ্ধতিকে সোজা পথ বলেছেন। সিদ্ধাচার্যের একটি চর্যায় আছে:

উজুরে উজু ছাড়ি মা জাহুরে বঙ্ক।
নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লঙ্ক॥

'এপথ সোজা (ঋজু), সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে যেওনা; বোধি নিকটেই আছে (দূর) লঙ্কায় যাওয়ার (প্রয়োজন) নেই।'
সহজিয়াগণ যে বার বার বাঁকা পথ ছেড়ে সোজা পথে যেতে বলেছেন সেই বাঁকা পথ কী এবং সেটা ছাড়ারই বা প্রয়োজন কেন? উত্তর চর্যাকারগণই দিয়েছেন। তাঁদের মতে 'শাস্ত্র-তর্ক-পাণ্ডিত্যের পথ, ধ্যান-ধারণা সমাধির পথ, বিবিধ তন্ত্র-মন্ত্র আচার পদ্ধতির পথই হলো বাঁধা পথ।' এবং পাণ্ডিত্যের অভিমান নিয়ে পথ চল্‌লে মুক্তি বা সহজানন্দ পাওয়া সম্ভব নয় বলে তা ত্যাজ্য। পাকা বেলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অলি যেমন কেবল তার চার পাশে ঘুরে সারা হয়—ভিতরে প্রবেশ করে সার গ্রহণ করতে পারে না তেমনি পাণ্ডিত্য-গর্বী মানুষেরা 'মহাসুখ'-এর চার পাশে পাণ্ডিত্যের অভিমানে মত্ত হয়ে ঘুরে মরেন—মুক্তির স্বাদ পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। 'সহজানন্দ' বা মহাসুখ বুদ্ধি গ্রাহ্য নয়—পুরোপুরি অনুভূতি সাপেক্ষ। সুতরাং বুদ্ধি-শাসিত পাণ্ডিত্যে তাকে পাওয়া অসম্ভব। বাক্য-মনের অগোচর যে সহজানন্দ, যাকে বোঝা যায় না—কেবল আভাস-ইংগিতে একটুখানি অনুভব করা যায় মাত্র, বাহ্যাড়ম্বর-যুক্ত ক্রিয়াকাণ্ড বা বুদ্ধি-দীপ্ত পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাকে কোন মতেই পাওয়া যায় না—তাকে পেতে হলে গুরুর উপদেশ গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। চর্যাকারগণ বার বার তাই গুরুর উপদেশ গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। গুরুর নির্দ্দেশিত পথে পদচারণা করলে নির্বাণ তথা সহজানন্দ তথা মহাসুখ-লাভ অনিবার্য হয়ে ওঠে।
নির্বাণ, অদ্বয়, সহজানন্দ, মহাসুখ ইত্যাদি শব্দগুলির মধ্যে একটি গভীর যোগ-সূত্র আছে—আসলে সবই এক। 'হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে যে রাগের আগুন, যে দ্বেষের আগুন, যে মোহের আগুন—সেই আগুন নির্বাপিত হলে আসে যথার্থ নির্বাণ।' এবং এই নির্বাণই হলো পরম সুখের বা মহাসুখের। ধর্মপদের বহুস্থানে উল্লিখিত হয়েছে নির্ব্বাণং পরমং সুখং। অদ্বয় হল আমাদের দেহান্ত-রালবর্ত্তী আদি-অন্ত-রহিত শাশ্বত সহজ সত্তা। এই সহজ সত্তার সাথে

মিলনেই হয় সহজানন্দ এবং সহজানন্দেই নির্বাণ এবং নির্বাণেই মহাসুখ। 'এই সহজানন্দ বা স্বরূপানুভূতির ক্ষেত্রে কোন 'জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞেয়ত্ব' বা 'গ্রাহকত্ব-গ্রাহ্যত্ব' থাকে না। গ্রাহ্যত্ব-গ্রাহকত্ব রহিত যে স্বরূপ তা-ই হলো অদ্বয় স্বরূপ, অদ্বয়ই হলো সহজ, সহজই হলো মহাসুখ।'* সুতরাং সহজিয়াগণের নিকট অদ্বয় লাভ, মহাসুখ প্রাপ্তি, সহজে প্রতিষ্ঠা কিংবা বোধিচিত্ত লাভ এ সকল একই কথা। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি সহজিয়াগণের নিকট বোধিচিত্ত লাভই পরম লক্ষ্য, এই বোধিচিত্ত লাভ হয় শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতার দ্বারা। এখন এই শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতার অর্থ কী? এই উভয়ের মধ্যকার তাৎপর্যের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য রাখলে সহজিয়াগণের দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব বা সাধনতত্ত্ব সকল কিছুই আমাদের নিকট সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে। সুতরাং সকল জটিল তত্ত্ব কথা বুঝতে হলে এই শূন্যতা ও করুণার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। এখন আমরা শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতার মূলে যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিহিত আছে সেগুলি পরিস্ফুট করার চেষ্টা করবো। ধর্মমতের পক্ষ অবলম্বন করে বলা যায় যে শূন্যতার দ্বারা নির্বাণ অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজ হতে বিচ্যুত হয়ে কেবল মাত্র একক ভাবে মুক্তির চেষ্টা না করে করুণার সংমিশ্রণে বিশ্বমানবের মঙ্গলের জন্য বৃহত্তর পথে পদচারণার সাধনাই হলো বোধিচিত্ত লাভের সাধনা। এই শূন্যতাকে বলা হয় প্রজ্ঞা বা জ্ঞাত বা গ্রাহক বা Principle of subjectivity এবং করুণাকে বলা হয় উপায় বা জ্ঞেয় বা গ্রাহ্য বা Principle of objectivity। এই গ্রাহ্য-গ্রাহকত্ব বা জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্বের দুই প্রবহমান ধারা সম্মিলিত হয়ে যে অদ্বয়তত্ত্ব লাভ হয় তাই বোধিচিত্ত, তাই সহজানন্দ, তাই মহানন্দ, তাই নির্বাণ, তাই সব। ধর্মমতের দিক হতে শূন্যতা ও করুণার সম্মিলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হলো এবার আমরা যোগ সাধনার দিক হতে এর মধ্যকার তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবো।

॥ পাঁচ ॥

॥ চর্যার যোগ-সাধন-তত্ত্ব ॥

যোগ সাধনার দিক হতে সহজিয়াগণ আমাদের দেহের মধ্যে প্রধান তিনটি নাড়ীর কথা বলেছেন। একটি বাম নাসারন্ধ্র হতে নির্গত হয়েছে নাম বামগা; দ্বিতীয়টি দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হতে নির্গত হয়েছে নাম দক্ষিণগা। এই বামগা এবং

দক্ষিণগা নাড়ী দুটি ছাড়া আরো একটি নাড়ী আছে যার নাম মধ্যগা। এখন বৌদ্ধ তন্ত্র শাস্ত্রে এবং চর্যায় এই নাড়ীগুলির বহুবিধ নাম আছে—সকল সন্দেহ এড়াবার জন্যে আমরা সর্বপ্রথমে এই নাড়ীগুলির পৃথক নামগুলি উল্লেখ করছি—এই নাড়ীগুলির নাম স্মরণ রাখলে সকল জটিল তত্ত্ব কথা সহজ হয়ে আসবে। বামগা এবং দক্ষিণগা নাড়ী দুটি দ্বৈতের প্রতীক—দ্বৈতত্ত্ব বোঝাবার জন্যে বামগা নাড়ীকে সাধারণতঃ বলা হয় শ্বাসবাহী নাড়ী, প্রাণবাহী নাড়ী, ভব (অস্তিত্ব), সৃষ্টি, ইতি, প্রজ্ঞা, বিন্দু, নিবৃত্তি, ইড়া, কুলিশ, আলি, গঙ্গা, চন্দ্র, রাত্রি, লালন, চমন, ইত্যাদি এবং দক্ষিণগা নাড়ীকে বলা হয় প্রশ্বাসবাহী নাড়ী, অপানবাহী নাড়ী, নির্বাণ (অনস্তিত্ব), সংহার, নেতি, উপায়, নাদ, প্রবৃত্তি, পিঙ্গলা, কমল, কালি, যমুনা, সূর্য. দিবা, রসনা, ধমন ইত্যাদি। বিপরীতার্থক এই নামগুলি একত্রিত করলে দাঁড়ায় বামগা-দক্ষিণগা, শ্বাসবাহী-প্রশ্বাসবাহী, প্রাণ-অপান, ভব-নির্বাণ, অস্তিত্ব-অনিস্তত্ব, সৃষ্টি-সংহার, ইতি-নেতি, প্রজ্ঞা-উপায়, বিন্দু-নাদ, নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি, ইড়া-পিঙ্গলা, কুলিশ-কমল, আলি-কালি, গঙ্গা-যমুনা, চন্দ্র-সূর্য, রাত্রি-দিবা, লালন-রসনা, চমন-ধমন। মধ্যগা নাড়ীটির বিভিন্ন নামের মধ্যে অবধূতি, অবধুতিকা, যুষুম্না ইত্যাদি প্রধান।

সহজিয়াগণের প্রধান এবং চরম লক্ষ্য সহজানন্দ বা মহাসুখ বা বোধিচিত্ত লাভ। তাদের কাছে এ নাড়ীর কি প্রয়োজন? বামগা দক্ষিণগা এই নাড়ী-দ্বয়ের প্রবাহ সাধারণতঃ নিম্নাভিমুখী—এই নিম্নাভিমুখী প্রবাহে চলে সংসারের গতি। একটিতে 'ভব' (অস্তিত্ব) অপরটিতে 'নির্বাণ' (অনস্তিত্ব)। একটি 'সৃষ্টি' অপরটি 'সংহার' একটি 'ইতি' অপরটি 'নেতি'। এই উভয় নাড়ীর নিম্নাভিমুখী ধারা মধ্যগা নাড়ী পথে উর্দ্ধগা করতে পারলেই মধ্যগার শীর্ষদেশে যে অদ্বয় বোধিচিত্ত বা সহজানন্দ বা মহাসুখ বিরাজমান তা' লাভ করা সম্ভব এবং এই অদ্বয় বোধিচিত্ত লাভই সহজিয়াগণের চরম লক্ষ্য। বামগা এবং দক্ষিণগা নাড়ীর প্রবাহ যে নিম্নমুখী এবং নিম্নমুখী ধারায় যে বহিঃসৃষ্টি সে কথা পূর্বেই বলেছি। এই নিম্নধারায় সৃষ্টি হয় জন্ম-মৃত্যুর, জরা-ব্যাধির অর্থাৎ চলমান বাস্তব বিশ্ব সংসারের। নিবৃত্তি রূপিণী বামগা নাড়ীর মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয় একটি রস আর প্রবৃত্তি রূপিণী দক্ষিণগা নাড়ীর অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত হয় পৃথক গুণসম্পন্ন আর একটি রস। বলা বাহুল্য এই উভয় রসের ধারা নিম্নগা। এই উভয় রস যদি মধ্যগায় মিলিত হয় তা হলে 'সমরসে'র সৃষ্টি হয়—এই সমরস যখন শীর্ষ দেশে উপনীত হয় তখন তা পরিশুদ্ধ 'সামরস্য' রূপলাভ করে। সহজানন্দ বা অদ্বয় বোধিচিত্ত এই সামরস্যের পূর্ণতমরূপ।

সহজিয়াগণের যে সাধনা তা তান্ত্রিক সাধনা কিন্তু পুরাপুরি নয়। তান্ত্রিক সাধনার অন্তরঙ্গ দিক ছাড়া বহিঃরঙ্গ দিকটাই অধিক। কিন্তু সহজিয়াগণ বহিঃরঙ্গকে একেবারেই এড়িয়ে গেছেন। চর্যার সাধকগণ তাই বার বার বাইরের সকল তপ-যপকে এড়িয়ে অন্তরের দিকেই মনোনিবেশ করতে বলেছেন। তন্ত্র সাধনার মূল কথা হল দেহসাধনা—অর্থাৎ দেহকেই যন্ত্র করে তার ভিতর দিয়েই পরম সত্যকে উপলব্ধি করার সাধনা। 'তন্ত্র মতে দেহ ভাণ্ডটিই হলো ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্ররূপ—সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে যা' কিছু সত্য নিহিত আছে, তার সবই নিহিত আছে এই দেহ ভাণ্ডের মধ্যে।' সহজিয়াগণ তাই দেহকে নিয়েই পড়েছেন। দেহের মধ্যে যে সহজ স্বরূপ তাই বুদ্ধ স্বরূপ। চর্যাকারগণ তাইতো বার বার ডাইনে বামে যেতে নিষেধ করেছেন। লঙ্কায় যেতে তাইতো তাঁদের ঘোর আপত্তি। যে পতি ঘরে বাস করে প্রতিবেশীকে জিজ্ঞেস করে তার সংবাদ পাওয়া যাবে কেমন করে :

ঘরে আচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেক্খই পড়িবেশী পুচ্ছই ॥

'ঘরে (দেহঘরে) আছে, বাইরে জিজ্ঞেস করছ, (ঘরে) পতি দেখেছ কিন্তু প্রতিবেশীকে তার (খোঁজ) জিজ্ঞেস করছ।'

অন্যত্র :

আসরির কোই সরীরাই লুক্কো।
জো তাহি জানই সো তাই মুক্কো ॥

'অশরীরী একজন দেহ লুকিয়ে আছে—তাকে যে জানে সে-ই মুক্ত হয়।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে চর্যাকারগণ বার বার বলেছেন অদ্বয় বোধিচিত্ত লাভের জন্যে বাইরে যেতে হবে না—দেহের মধ্যেই সব। সাধনার ক্ষেত্রে তাঁরা দেহের মধ্যে চারটি চক্র বা চার পদ্ম কল্পনা করেছেন (হিন্দু মতে ষট্‌চক্র)। প্রথম চক্র নাভিতে—নাম 'নির্মান-চক্র,' দ্বিতীয় চক্র হৃদয়ে—'ধর্মচক্র,' তৃতীয় চক্র কণ্ঠে—'সম্ভোগ চক্র' এবং চতুর্থ বা শেষ চক্র হলো মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ দেশে এবং এ চক্র উষ্ণীষ চক্র বা সহজ চক্র বা 'মহাসুখচক্র' নামে খ্যাত। বামগা বা দক্ষিণগা নাড়ীদ্বয়কে প্রথমে নিঃস্বভাবীকৃত করতে হবে—তারপর এই নাড়ীদ্বয়ের যে স্বাভাবিক নিম্নগা গতি যোগের সাহায্যে বিশুদ্ধ করে সেই গতিকে রুদ্ধ করতে হবে—এর পরের সাধনা হলো দুই পৃথক রুদ্ধ ধারাকে সমন্বিত করার সাধনা, তারপর যোগবলে সেই সমন্বিত ধারাকে মধ্যগার বা অবধূতিকার ভিতর দিয়ে উর্দ্ধগা করতে

হবে—এই উর্দ্ধগা ধারাই হলো পরম আনন্দ-প্রবাহের ধারা। অবশ্য এই ধারা যতই উর্দ্ধমুখী হবে আনন্দানুভবের মধ্যে ততই আসবে প্রবলতা। প্রথম স্তরের উর্দ্ধমুখী ধারার আনন্দ-স্পন্দনের নাম আনন্দ, দ্বিতীয়ানুভূতি পরমানন্দ, তৃতীয়ানুভূতি বিরামানন্দ এবং চতুর্থ বা শেষ আনন্দাভূতির নাম সহজানন্দ। এই সহজানন্দ লাভই হলো সহজিয়া সাধকগণের চরম লক্ষ্য। বাঁকা-চোরা পথ নয়—সোজা পথেই সহজানন্দ সহজ-লভ্য। চর্যাকারগণ তাই বার বার বাম দক্ষিণ কোন পথে না যেয়ে সোজা পথে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন :

বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিন মহাসুহ সাঙ্গা॥

সরহপাদের ৩২নং চর্যায় পাই :

বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভাইলা॥

বাম দক্ষিণ নয় অর্থাৎ বাহ্যাড়ম্বর যুক্ত কোন পূজা-পার্বণ নয়, কোন ক্রিয়া-কাণ্ড নয়—এ সকল পথ পরিত্যাগ করে অন্তরঙ্গের অর্থাৎ অবধূতিকার পথেই একমাত্র নির্বাণ লাভ সম্ভব। অদ্বয় বোধিচিত্ত, কিংবা সহজানন্দ কিংবা মহাসুখ একমাত্র সেখানেই।

॥ জয়দেব ও বাংলা সাহিত্য ॥

চর্যাপদে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের যে ক্ষীণ ধারার সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে সেই ধারাই কালিদাসোত্তর সংস্কৃত ভাষার শক্তিমান গীতি-কবি জয়দেবের কাব্যে অধিকতর স্পষ্ট ও বেগবান হয়ে উঠেছে। জয়দেব রাজভাষার কবি, তিনি কাব্য রচনা করেছেন সংস্কৃত ভাষায়। তাঁর বিখ্যাত কাব্য গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে। সুতরাং ভাষার দিক দিয়ে জয়দেবের কাব্যে বাংলা সাহিত্যের ক্ষীণ ধারার বলিষ্ঠতর রূপ প্রত্যাশা করা হয়তো ঠিক হবে না। কিন্তু ভাষা দিয়ে শুধু সাহিত্য গড়ে ওঠে না। সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে চাই "ভাবে"র রূপাল্পনা, "রূপের" বর্ণবিন্যাস এবং "পরিবেশের" বাস্তবানুগ উপস্থাপন। এ সকল দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা দেখব গীতগোবিন্দের অন্তর্বীণা বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব সুর মূর্চ্ছনায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছে! এ সকল দিক থেকেই গীতগোবিন্দের নম্র-কোমল গীতি-কাব্যের বুকে বাংলা সাহিত্যের বলিষ্ঠতর রূপটীর অন্বেষণ করবো।

বাংলা সাহিত্য সাধারণভাবে বাঙালীর চিন্তাধারা, ধ্যান-কল্পনা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই সাহিত্যেই নিহিত আছে বাঙালী মনের আদিম সত্তা, বাংলার চিরন্তন ঐতিহ্য। বাংলার জলবায়ু এবং তার প্রাকৃতিক কোমল-মধুর পরিবেশ-প্রভাবে বাঙালীর ব্যক্তিমানসের এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। বাঙালীর সাহিত্যে বাঙালীর ব্যক্তিমানসের এই বিশেষ রূপটি বিধৃত হয়। বাংলা ভাষা যেদিন তিমির-গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেনি সেদিনও বাঙালীর ব্যক্তিমানসের এই বিবর্তন-অনুবর্তন বিভিন্ন ভাষায় বাঙালীর রচিত সাহিত্যে সবার অলক্ষ্যে আপন স্থান করে নিয়েছে। তাই বাংলা সাহিত্যের বিকাশমান প্রারম্ভিক প্রস্তুতিগুলি শুদ্ধ হয়ে আছে বাঙালী রচিত বিভিন্ন অবাংলা সাহিত্যের বুকে।

বাঙালী কবি জয়দেবের "গীত-গোবিন্দ" এরূপ গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি। গ্রন্থটি রচিত হয়েছে সংস্কৃতে। বাইরের দিক থেকে এই সহজচ্ছেদ্য আবরণ, এই ভাষার বিভিন্নতার জন্যেই গ্রন্থটিকে সংস্কৃত গ্রন্থ বলে আমাদের ভ্রম হয় কিন্তু এই স্বচ্ছ আবরণের অন্তরালে বাঙালী ব্যক্তি-মানসের এক চিরন্তন রূপ

আত্মগোপন করে আছে। চরিত্রগুলির মুখে সংস্কৃত বাক্য মাত্র কিন্তু তারা যে বাংলার আদিম সন্তান! বাংলার পেলব কোমল মৃত্তিকার বুক হতে জন্মলাভ করে তারই বুকের সুধা পান করেই যে তারা বেড়ে উঠেছে তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। তাই ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন "কালিদাস-পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গীতি কবি, বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেবের প্রসঙ্গই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যথার্থ প্রস্তাবনা। অন্যত্র তাঁর ঘোষণা, "গীত-গোবিন্দের পদাবলীর ভাষা সংস্কৃত, ছন্দ প্রাকৃত, ভাব বাংলা।" বস্তুতঃ কেবল ভাবেই নয় ভাষা এবং ছন্দেও বাঙালীত্বের ছাপ বর্ত্তমান। নিম্নের আলোচনা হতে আমরা আমাদের মন্তব্যের সত্য-সার নিষ্কাসন করার চেষ্টা করব।

বাঙালী-জাতীয় চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ভাবাতিরেক এবং এই জন্যে বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে তানপ্রধান ছন্দে ভাবাবেগবহুল গীতাবলী। গীত-গোবিন্দ তো এই ভাবাবেগবহুল চিন্তাধারার ছন্দিত রূপায়ণ। জয়দেবের এই যুগান্তকারী কাব্য পড়তে গেলে চোখের সামনে অপূর্ব স্পষ্টতায় ভেসে ওঠে গোকুল, সেখানে তমালতলে কৃষ্ণ নাচে বিভোর। পার্শ্বে পাগলিনী রাধা, স্বর্গীয় সুষমায় কৃষ্ণদেহ সমুদ্ভাসিত, অপূর্ব সে রূপ! কৃষ্ণের বাঁশীর মোহনতানে যমুনাজলে যে হিন্দোল জাগতো, কোকিলের মধুর তানে রাধা ও গোপীগণ যেরূপ বিহ্বল হয়ে পড়তো গীতগোবিন্দের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অপূর্ব রূপায়নায় তা সুঅঙ্কিত হয়েছে।

গীতগোবিন্দ আদি রসাত্মক। 'যদিও কবি 'হরিস্মরণে সরস মনের' কথা উল্লেখ করে সর্গে সর্গে ভক্তির প্রলেপ দিতে চেষ্টা করেছেন তথাপি 'পীন পয়োধার পরিসর মর্দ্দন চঞ্চল করযুগ শালী' ইত্যাদি সম্ভোগ চিত্রে সে প্রলেপ খসে পড়েছে।' পদাবলী।সাহিত্যের প্রধান উপকরণ এই আদিরস। রাগের সময় কৃষ্ণকে সখীগণের সাথে বিহার করতে দেখে রাধার অভিমান হয় এবং তিনি অন্য কুঞ্জে অবস্থান করেন। কৃষ্ণ যান সেখানে—সেই অভিমানিনী রাধিকার পার্শ্বে, অবশেষে অভিমানের পরিসমাপ্তি ঘটে। মান-অভিমানের মাঝে এই যে মধুর বিরহ-মিলন এতো গীত-গোবিন্দের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। গীত-গোবিন্দে প্রতিষ্ঠিত এই লৌকিক মান-অভিমান, মিলন-বিরহের ধারা বৈষ্ণব পদাবলীর' বুকে স্বর্গীয় সুরভিতে সুন্দর রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গীতগোবিন্দই বৈষ্ণবপদাবলীর সূতিকাগার। বিশিষ্ট সমালোচক তাই যথার্থ ই বলেছেন "মেঘদূত যেমন অজস্র কবিকে-'দূত' কাব্যের প্রেরণা জোগাইয়াছে

গীতগোবিন্দও তেমনি অসংখ্য কবিকে 'গীত' কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছে।"

গীতগোবিন্দ যেন আদি-অন্তরহিত তুষারাবৃত বিশাল শৈলভূমি—পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন স্রোতধারা এই তুষার গলা জলে পরিপুষ্ট হ'য়ে বিপুল বেগে কূল প্লাবী বন্যায় দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। তাই দেখি সুদূর অতীতে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হ'তে আধুনিক কালে রচিত রবীন্দ্রনাথের "ভানুসিংহের পদাবলী"র সর্বত্রই গীত-গোবিন্দের 'মধুর-কোমলকাণ্ড পদাবলী'র সুকোমল সুরটী অপূর্ব সুর-মূর্চ্ছনায় গুঞ্জিত হয়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের কাঠামোটী তো গড়ে উঠেছে গীত-গোবিন্দের ভাব-সম্পদকে কেন্দ্র করেই। কেবল ভাব নয়, মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস গীত-গোবিন্দের বিপুল অংশকে ভাষান্তরিত করে আপন কাব্যে সন্নিবেশিত করেছেন। যে পদাবলী-সাহিত্য বাঙালীর চিত্ত-ভূমিতে অনির্ব্বান দীপালোকের মত মনোরম আলোক সম্পাতে উজ্জ্বল করে তুলেছে—এই গীত-গোবিন্দই তার উৎস ভূমি।

জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। এমন কি, পল্লী-গ্রামের নিতান্ত নিরক্ষর ভিক্ষুখের মুখেও এর আবৃত্তি শোনা যায়। মনের দিক থেকে একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ না থাকলে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করা কোন সাহিত্যের পক্ষেই সম্ভব নয়।

বাঙালী-চিত্তের সাথে গীত-গোবিন্দের সুর-ধারায় যে ঐকান্তিক যোগ আছে তার সব থেকে বড় প্রমাণ এই যে—একমাত্র গীত-গোবিন্দ প্রায় সহস্র শতাব্দী ব্যাপী বাংলা সাহিত্যকে এবং বাঙালী মানস-ভূমিকে রসের অফুরন্ত ফোয়ারায় সঞ্জীবিত এবং গীত-স্পন্দনে আন্দোলিত করে আস্‌ছে। এতদিন ধরে এত পাঠকের চিত্তকে প্রেম-রসে সঞ্জীবিত করে আজপর্যন্ত তার রসের ভাণ্ডারে টান পড়েনি। আশ্চর্য!

গ্রন্থের মধ্যে প্রকৃতির যে বর্ণনা আছে তা এই শ্যামল বাংলারই, যে নদীর বিবরণ পাওয়া যায় তাও এই নদীমাতৃক বাংলা দেশেরই একটি ৮ ভাব এবং বর্ণনার দিক থেকে গীতগোবিন্দ সামগ্রিকরূপে বাংলা সাহিত্যের সমগোত্রীয়।

গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত, কিন্তু সে সংস্কৃতের মধ্যে অনুস্বর বিসর্গ

প্রভৃতির পরিমাণ এত কম যে মাঝে মাঝে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাংলা পদ বলেই ভ্রম হয়। একটী উদাহরণই যথেষ্ট হবে:

দিনমনি মণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন মুনিজন-মানহংস
কালীয় বিষধর গঞ্জন জন রঞ্জন……ইত্যাদি।

সত্যই এগুলিকে বাংলার সমাসবদ্ধ পদ ছাড়া অন্য কিছু বলে চিন্তা করতে আমাদের মন কিছুতেই সায় দেয় না।

অন্য আর একটি পদ:

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সতত মনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং॥"

এখানে সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষা অদ্বৈত সম্পর্ক-যুক্ত।

সংস্কৃত এবং বাংলার মধ্যবর্তী ব্যবধান-চিহ্ন যেন এখানে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

গীতগোবিন্দের ছন্দ বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে এ ছন্দ সংস্কৃত ছন্দের অনুগামী নয়। এ কাব্যের ছন্দ পাদাকুলক—এই পাদাকুলক ছন্দ হতে পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ছন্দ পয়ারের উৎপত্তি। সংস্কৃতের অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পরিবর্তে লোকভাষার মাত্রাবৃত্ত ছন্দই জয়দেব গ্রহণ করেছেন তাঁর কাব্যে। পয়ার ছাড়া বাংলা কাব্যের আর একটি বলিষ্ঠ ছন্দ ত্রিপদী—এই ত্রিপদী ছন্দেরও পূর্বাভাস গীতগোবিন্দে সূচিত হয়েছে। এছাড়াও আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে জয়দেবের কাব্যের প্রতি চরণে যে অন্ত্যমিল দেখা যায় তা সংস্কৃতে পাওয়া যায় না—এই অন্ত্যানুপ্রাস বাংলা কাব্য-ছন্দের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী এবং রবীন্দ্রনাথের ধ্বনিপ্রধান কবিতাগুলির সাথে জয়দেবের কবিতার একটি নিকট সম্পর্ক ও অদ্ভুত মিল লক্ষণীয়। একটি উদাহরণ:

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী" —জয়দেব।
"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী।" —রবীন্দ্রনাথ

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়—সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রিক হয় না—কিন্তু প্রাকৃতে এবং বাংলায় তা হয়। সংস্কৃতে রচিত গীতগোবিন্দের বহুস্থানেই এই দ্বিমাত্রিক স্বরের প্রকাশ ঘটেছে।

কেবল ছন্দের দিক হ'তেই নয় অর্থবোধের দিক হ'তেও যে, গীতগোবিন্দের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ রূপটী সুপ্ত রয়েছে, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'কবি জয়দেবও গীতগোবিন্দে'র ভূমিকায় সে কথা সুন্দররূপে তুলে ধরেছেন:
"সংস্কৃত কবিতা সাধারণতঃ পাদ-চতুষ্টয় সমন্বিত এক একটি Stanza-য় পর্য্যবসিত; এবং এইরূপ শ্লোকের সমষ্টি লইয়াই কাব্য। এই শ্লোকগুলি কথনো সম্বন্ধ, কথনো অসম্বন্ধ, কিন্তু এক একটি শ্লোক প্রায়ই সম্পূর্ণ ভাবের জ্ঞাপক। পদাবলীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এগুলিকে ব্যষ্টিভাবে লইলে সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। গানের মত পৃথকরূপে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক হইলেও এগুলিকে সমষ্টিভাবেই ধরিতে হইবে এবং অন্তে নিবিষ্ট refrain বা ধ্রুবপদই ইহার ভাবপরম্পরার যোগসূত্র। পদাবলীর এই ধরণটী দেশীয় গানের প্রথাই অবলম্বন করিয়াছে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভাব, ভাষা, ছন্দ সকল দিক দিয়েই গীতগোবিন্দ উত্তর-যুগের বাংলা কাব্যের সুদৃঢ় বুনিয়াদ গঠন করেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে গীতগোবিন্দ যথার্থই বাংলা কাব্যের সূতিকাগার। এছাড়াও গীতগোবিন্দে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সেগুলি একান্তভাবেই প্রাচীন বাংলা কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। প্রাচীন বাংলার গীতিকাব্য পালাগান এবং মঙ্গলকাব্যের সমন্বয়। কিছু গান, কিছু বর্ণনা, কিছু কথোপকথন এই ত্রিবিধ আঙ্গিক-বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে গীতগোবিন্দে যে পালাগানের রূপ ফুটে উঠেছে তা সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল-দৃষ্ট। পরবর্ত্তীকালে বাংলার লোকজীবনে যে পালাগানের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল গীতগোবিন্দ হতেই তার সূত্রপাত। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য মানবীকৃত দৈববাদের চিত্রে সমুজ্জ্বল। দেবদেবীর এই মানবায়িত রূপ-করণের বীজ গীতগোবিন্দের বুকেই নিহিত। এছাড়াও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লৌকিক-অলৌকিকতার যে নিরন্তর সংমিশ্রণ দেখা যায় জয়দেবের গীতগোবিন্দেই রচিত হয়েছে তার প্রথম সূত্রপাত।

এখন প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক: ভাব ভাষা ছন্দ ইত্যাদি সকল দিক থেকেই গীতগোবিন্দ বাংলা কাব্যের সীমারেখা স্পর্শ করে গেলেও সংস্কৃতে রচিত হলো কেন। উত্তরে প্রথমতঃ বলা যায় যখন গীতগোবিন্দ রচিত হয় তখন বাংলা ভাষা অপভ্রংশের বক্ষ হতে জন্মলাভ করলেও তা ছিল নিতান্ত অপরিণত এবং মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাংলা ভাষায় সাহিত্যের কোন আদর্শই তখন গড়ে ওঠেনি। ফলে গীতগোবিন্দ বাংলায় রচিত হওয়ার পক্ষে

বেশ কিছুটা বাধা ছিল। দ্বিতীয়তঃ বাংলা ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতে জয়দেব ছিলেন বিশেষ পারদর্শী সুতরাং কাব্য রচনায় তিনি সংস্কৃতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তৃতীয়তঃ তখনকার দিনে বাংলা অপেক্ষা সংস্কৃতে রচনা বেশী দিন স্থায়ী এবং ব্যাপক প্রচারিত হতো। তার উপরেও জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। ফলে প্রতিভা-প্রতিষ্ঠার উন্মাদ স্পৃহায় অন্যান্য বাঙালী কবিদের ন্যায় জয়দেব তাঁর কাব্যরচনা করেন সংস্কৃতে। কিন্তু এই সংস্কৃতের আবরণে যে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে তা একান্তভাবে বাঙালীয়ানারাই পরিচায়ক।

গীতগোবিন্দের ভাব আমাদের অজানা নয়, এর পরিবেশ আমাদের অজ্ঞাত নয়, এর নায়ক-নায়িকা আমাদের জানাদিগন্তের ওপার হতে আসেনি, এর পরিবেশও বাংলার শ্যামলিমায় দূর্বা-কোমল। বাংলা কাব্য এর কোমলকান্ত পদাবলীর দ্বারা প্রভাবিত এবং এর মধুর রসধারার অভিসিঞ্চিত। এ কাব্যের দ্বারাই রচিত হয়েছে বাংলা কাব্যের নব জীবন-বেদ। গীতগোবিন্দকে বাংলা কাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত বলার সার্থকতা এখানেই। বস্তুতঃ গীতগোবিন্দের বুকেই শোনা গিয়েছে বাংলা কাব্যের প্রথম আগমনী।

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥

॥ এক ॥

॥ ভূমিকা ॥

চর্যাপদে এবং গীতগোবিন্দের মধ্যে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রারম্ভিক নিদর্শনের যে রূপ ও রেখার অনুসন্ধান করেছি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তা' অপূর্ব বর্ণ-গরিমায় বিকশিত। এ কাব্য যে বাংলা ভাষা এবং বাঙালী জীবন-ধর্মের সাথে অদ্বৈত সম্পর্কযুক্ত তা কোন প্রমাণ-পরীক্ষার অপেক্ষা রাখে না। চর্যাপদকে বাংলা ভাষার সমগোত্রীয় করবার জন্যে ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ভাষাতত্ত্বের মৌলিক গবেষণার দ্বারস্থ হতে হয়েছিল, গীতগোবিন্দের সুরটিতে বাঙালী মানস-ধর্মের যে বিশেষ গুঞ্জনটি অনুরণনিত হয়ে উঠেছে তা প্রমাণ করবার জন্যে অনুরূপে পণ্ডিত-জনকে গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ-পরিচয়ের সংগ্রহের আয়োজন করতে হয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে বিদগ্ধ পণ্ডিতবর্গের আলোচনা-সমালোচনার প্রয়োজন হয় নি। এ কাব্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের, রূপ ও রেখার, প্রাণ ও ভংগী দিবালোকের মত স্পষ্ট। সেজন্য অনেকেই চর্যাপদ পর্যন্ত পিছিয়ে না গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার আয়োজন করতে চান। এই পুথিটি আবিষ্কার করেন শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়। তিনি ১৩১৬ সালে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে কাকিল্যা গ্রামে ভ্রমণে যান এবং উক্ত গ্রামের এক গৃহস্থের গোয়াল ঘরের মাচা হ'তে আন্তখণ্ডিত এই পুঁথিটিকে আবিষ্কার করেন। পরে ১৩২৩ সালে বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষৎ হ'তে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এই পুথিখানিকে কেন্দ্র ক'রে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয় নিম্নের আলোচনায় আমরা তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করবো।

॥ দুই ॥

॥ চণ্ডীদাস-সমস্যা ॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কবিতা "সেকাল"-এ লিখেছেন :

> হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
> পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল॥

সঠিক সাল-তারিখ নির্ণয় বিবদমান পণ্ডিতদলের বিবাদের বহুতর উপকরণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বহুতর ক্ষেত্র এই উপকরণে সমস্যা সংকীর্ণ হ'য়ে আছে, বহুতর অন্ধকার গলিপথে এ সমস্যা আপন তমসাচ্ছন্ন আবরণের অন্তরালে সুবিস্তৃত। কিন্তু আমাদের আলোচ্য চণ্ডীদাস সমস্যাটি কেবলমাত্র সাল-তারিখ নির্ণয়ের সমস্যা নয়—সাল-তারিখের প্রশ্ন ছাড়াও স্বয়ং কবির উপর সন্দেহ আরোপিত হওয়ায় সমস্যাটি অধিকতর ক্রমজটিল ও ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে।

এই কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত চণ্ডীদাস-সমস্যা বলে কোন সমস্যাই ছিল না। তখন চণ্ডীদাস বলতে আমরা একমাত্র পদাবলীর চণ্ডীদাসকেই বুঝতাম এবং তিনি চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের কোন এক সময় অবতীর্ণ হ'য়ে যে কাব্য রচনা করেছিলেন সে বিষয় আমাদের কোনই সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু কবিত্বের রোমাঞ্চ-রঙীন স্পর্শ-বিহীন চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত রাসলীলার ৭১টি পদ ব্যোমকেশ মুস্তাফী কর্তৃক প্রকাশিত হওয়ার পর চণ্ডীদাস সমস্যার যে ক্ষীণতম উদ্ভব ঘটে—১৩২৩ সালে স্বর্গীয় বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্তৃক সাহিত্য পরিষৎ হ'তে চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পর সেই সমস্যা জটিলতম আকার ধারণ করে। বসন্তবাবু পুথিখানিকে বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কোন এক গৃহস্থের গোয়ালঘরের মাচা হ'তে আবিষ্কার করেন পুথিটি সে সময়েই ছিল আদ্যন্ত খণ্ডিত—ফলে লেখকের নাম এবং লিপিকাল ইত্যাদি কিছুই জানা যায়নি। কিন্তু লিপিকাল এবং লেখকের নাম না পাওয়া গেলেও পদাবলীর সুপরিচিত কবি চণ্ডীদাসের নামে অন্যান্য সহস্র পদের মত পুথিখানিও সহজেই চলে যেতে পারতো কিন্তু এই পথে সর্বাপেক্ষা বড় বাধার সৃষ্টি করেছে গ্রন্থখানির ভাষার দুর্বোধ্যতা এবং ভাবের অশ্লীলতা। পদাবলীর সাথে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাব ভাষার এক দুরতিক্রমী ব্যবধান রচিত হয়েছে এবং এই ব্যবধানের সুস্পষ্ট রেখাটি অঙ্কিত হয়েছে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভাষায়, "চণ্ডীদাসকে আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা মনে করিয়া আসিয়াছিলাম কৃষ্ণকীর্তনে সেই ধারণা

কতকটা ক্ষুণ্ন হইবার কথা। তিনি প্রেমের যে উচ্চগ্রামে সুর বাঁধিয়াছেন, কৃষ্ণকীর্তন যে তাহার অনেক নিম্নে। এ পাড়াগেঁয়ে কৃষক কবির অকপট লালসার কথায় সে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য কোথায়? চণ্ডীদাস বলিতে আমরা যে পবিত্রতা ও যূথিকাশুভ্র নির্ম্মলতা বুঝি, এখানে তাহা নাই। এ যে একান্ত স্থূল, একান্ত বিসদৃশ চিত্রপট, আঁধারে ভাল ছিল, চণ্ডীদাসকে যে এই কীর্তন হেয়, অশ্রদ্ধেয় করিয়া দিল; তাঁহার পদাবলীর সঙ্গে এক পংক্তিতে কৃষ্ণ কীর্তন রাখা যায় না। তাহা হইলে যে ব্রহ্মচণ্ডাল যোগ হয়।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী পরিকল্পনা এবং উপস্থাপন ভংগীর সঙ্গে পদাবলী-সাহিত্যের এই মৌলিক পার্থক্যের জন্যেই অবশেষে ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্‌লো অনস্বীকার্য চণ্ডীদাস-সমস্যা। চণ্ডীদাস-সমস্যার মূল জিজ্ঞাসাগুলি এই:

ক॥ পদাবলীর সুবিখ্যাত চণ্ডীদাস এবং নবাবিষ্কৃত পুথি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস কী একই ব্যক্তি?

খ॥ যদি একই ব্যক্তি হন তবে তিনি কোন সময়ে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন?

গ॥ যদি একই ব্যক্তি না হ'ন তবে চণ্ডীদাস কয়জন—দুই না ততোধিক?

ঘ॥ এঁরা সকলে কী একই সময় আবির্ভূত হ'য়েছিলেন—না বিভিন্ন সময়ে?

ঙ॥ সর্বোপরি প্রধান জিজ্ঞাস্য এই কোন চণ্ডীদাসের সৃষ্টি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কর্তৃক আস্বাদিত হ'য়েছিল?

এই প্রশ্ন-ব্যূহের কঠিন আবরণ ভেদ করে আমাদের চণ্ডীদাস-সমস্যা-সমাধানের কণ্টকাকীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধুর গলি-পথে অগ্রসর হ'তে হ'বে।

চণ্ডীদাস-সমস্যা-উদ্ভবের প্রাথমিক অবস্থায় সকল পণ্ডিতগণই প্রায় মত দিয়েছিলেন যে পদাবলীর চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লেখক চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি এবং তিনি চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে কোন এক সময়ে আবির্ভূত হ'য়ে আপনার অলোক-সামান্য প্রতিভার সায়াহ্ন-কোমল-মনোহর দ্যুতি ছড়িয়ে বাংলা-সাহিত্যের তমসাচ্ছন্ন দিগন্তের বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত করেছিলেন। পদাবলীর এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস যে একই ব্যক্তি সে সম্পর্কে স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের যুক্তিগুলি নিম্নলিখিত ভাবে দেখান যেতে পারে:

১॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা যায় চণ্ডীদাসের নাম 'অনন্ত', বাশুলী দেবীর বর তাঁর পদরচনার উৎসমূল এবং তিনি 'বড়ু' উপাধি ব্যবহার করতেন। পদাবলীতেও দেখা যায় কবি 'অনন্ত' নাম ব্যবহার করেছেন, বহুস্থানে 'বড়ু'

উপাধিও আছে এবং তিনি ছিলেন বাশুলী দেবীর পরম ভক্ত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস এক এবং অভিন্ন।

২॥ পদাবলীতে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এমন কতকগুলি পদ আছে যেগুলি একই সুরে ঝংকৃত হয়েছে। ভাষাগত সামান্য বিভিন্নতা ছাড়া উভয়ের মাঝে ব্যবধানের কোন স্পর্শ নেই। যথা:

"দোখিলেঁ। প্রথম নিশী স্বপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহি আঁরো তোহ্মারে হে।
বসিআঁ। কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥"......শ্রীকৃষ্ণকীর্তন॥

"প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥"...পদাবলী॥

উভয় গ্রন্থের এমনি আরো বহুপদ উদ্ধৃত করে অবশেষে মন্তব্য করেছেন: শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের "বিস্তর পদে চণ্ডীদাসের পরিচিত সুর আমাদের কর্ণে বাজিয়া উঠিতেছে।" সুতরাং উভয় চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি।

৩॥ "চণ্ডীদাসকে আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা....ব্রহ্মচণ্ডাল যোগ হয়" ইত্যাদি অংশে দীনেশবাবু উভয় গ্রন্থের ব্যাপক ব্যবধানের কথাটি সুন্দররূপে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এই বিপুল পার্থক্যের কথা স্বীকার করেও তিনি উভয় গ্রন্থের লেখককে একই ব্যক্তি বলেছেন অবশ্য এই বলার পিছনে উপযুক্ত কারণ রয়েছে। তিনি বলেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কবির বাল্যকালের লেখা। সেইজন্য এই গ্রন্থে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য লোভ-লালসার পরিমাণ অধিক। বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার অপেক্ষা সম্ভোগ-শৃঙ্গারের ধ্বনি গভীর ভাবে গুঞ্জিত হ'য়েছে। কিন্তু যৌবনের মধুবনে যখন তিনি রামী ধোবানীর অমর প্রেম-সুধা আস্বাদন করেন তখন তিনি এক স্বর্গীয় প্রেমের স্পর্শ পান এবং এই অন্তরস্পর্শী দিব্যজ্যোতি তাঁর মনোরাজ্যে এক অনাবিষ্কৃত প্রদেশের দিগন্ত-দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। এখান হ'তেই তিনি উদার উন্মুক্ত আকাশের গানে বিভোর হ'য়ে পড়েন—প্রাকৃত জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রেমের মাঝে নিবিড় হ'য়ে আসে অপ্রাকৃত প্রেম-জগতের সুমহান সুরতান। শুরু হয় পদাবলীর অশ্রু-সজল ইতিহাস। দীনেশবাবু তাঁর এই মন্তব্যের দৃঢ় ভিত্তি-ভূমি রচনার জন্যে Homer, Byron, রামপ্রসাদ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করেছেন। এঁরা সকলেই বাল্যকালে

যা' লিখেছেন তা' অতি নিম্নস্তরের রচনা কিন্তু পরবর্তীকালে পরিণত বুদ্ধিতে ভাবের উচ্চগ্রামে সুর বেঁধেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন অক্ষয় শাশ্বত সাহিত্য। এঁদের সকলের মত চণ্ডীদাসের বাল্যের রচনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একান্ত স্থূল-ভাবের পরিচয়বাহী কিন্তু পরিণত বয়সের রচনা বিরল-সৌন্দর্যের শ্রীক্ষেত্র। রামী ধোবানীর প্রেমের জন্যেই তিনি "ধরাতল হইতে উত্থিত হইয়া······ পৃথিবীর উপরে উঠিয়াছিলেন, তাঁহার মস্তক গৌরবের তুঙ্গগিরিশৃঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল।" এই দৃষ্টিতেও উভয়গ্রন্থের চণ্ডীদাস এক এবং অভিন্ন বলেই প্রতিভাত হয়।

৪॥ দীনেশ বাবুর চতুর্থ মন্তব্য দীনেশ বাবুর কথাতেই বলা যাক: "যদি কৃষ্ণকীর্ত্তন না পাইতাম, তবে বুঝিতাম না গীতগোবিন্দ ও কৃষ্ণধামালীর পরেই হঠাৎ চণ্ডীদাসের আবির্ভাব কি করিয়া হইয়াছিল।" এখানে দীনেশ বাবু কৃষ্ণকীর্তনকে গীতগোবিন্দ এবং পদাবলীর মধ্যকার সৃষ্টি বলে ধরেছেন এবং সাহিত্য-সৃষ্টির ক্রম-বিকাশ-ধারার একটি সহজ-সমাধানের ইংগিত দিয়েছেন।

উল্লিখিত মন্তব্যগুলি সত্য এবং বিচারসহ হ'লে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং পদাবলীর চণ্ডীদাসকে একই ব্যক্তি বল্‌তে আমাদের কোনই বাধা থাক্‌তো না কিন্তু আধুনিক অধিকতর তথ্য-সমৃদ্ধ যুক্তিতর্ক দীনেশ বাবুর এই মন্তব্যগুলির দৃঢ়পিনদ্ধতাকে শিথিল করে দিয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রমাণিকতার বিরুদ্ধে বলা যায় অন্য কোন প্রতিষ্ঠালিপ্সু লেখক চণ্ডীদাসের নামে নিজের লেখার প্রতিষ্ঠা দেখার জন্যে কবির ব্যবহৃত ভনিতা, নাম এবং ভাব-ভাষা চুরি করতে পারেন। বিশেষতঃ প্রাচীনকালে এমন ব্যাপার প্রায়ই সংঘটিত হ'তো। উভয় চণ্ডীদাস যে একই ব্যক্তি এমন কোন সুপ্রামাণিক সমর্থন যখন আমাদের হাতে নেই তখন উল্লিখিত সম্ভাব্যতাকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। তৃতীয় প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে স্পষ্ট করেই বলা যায় যে এ গ্রন্থ কখনই বাল্যবুদ্ধি দিয়ে লেখা নয়। সংস্কৃত উদ্ধৃতিগুলি কবির অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। গ্রন্থ-মধ্যে শাস্ত্র পুরাণাদির জ্ঞানের, অলংকার শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি-পরিচয়ের এবং পরিণত বাস্তব-জীবন-বোধের যে ছায়াপাত ঘটেছে তা'তে লেখককে অপরিণত বালক বলে গ্রহণ করতে আমাদের মন কোন মতেই সায় দেয়-না। চতুর্থ প্রামাণিকতায় দীনেশ বাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে গীতগোবিন্দ এবং পদাবলীর মধ্যকার সৃষ্টি বলে ধরেছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাব গীতগোবিন্দ হ'তে উচ্চ এবং পদাবলী অপেক্ষা নিম্নস্তরের কিন্তু একথাও কোন মতেই সমর্থনীয়

নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে অশ্লীলতা এবং উলঙ্গ রুচিহীন কেলি-বিলাস স্থান পেয়েছে তা'তে গ্রন্থখানির সুর নিঃসন্দেহে গীতগোবিন্দের নিম্ন-পর্যায়ে নেমেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দীনেশ বাবুর কোন মন্তব্যই শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধানের সুনির্দিষ্ট পথ-সন্ধান দিতে পারলো না। সুতরাং সমাধান পথের জন্যে আমাদের অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে।))

চৈতন্যপূর্ব যুগে যে একজন চণ্ডীদাস ছিলেন এবং তিনি উক্ত যুগে রাধাকৃষ্ণ অবলম্বনে পদ লিখে যে বিখ্যাত হ'য়েছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহহীন প্রমাণ রয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। মহাপ্রভুর জীবনীর সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত-এর বিভিন্নস্থানে চণ্ডীদাসের নামোল্লেখ আছে:

বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥ [আদি লীলা, ১৩শঃ পঃ]
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥ [মধ্যলীলা, ১০মঃ পঃ]
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥ [অন্ত্যলীলা, ১৭শঃ পঃ]

পদকর্তা নরহরিদাস, বৈষ্ণবদাস ইত্যাদির পদেও চণ্ডীদাসের সমর্থন আছে। জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ এবং নিত্যানন্দ দাস তাঁর 'প্রেমবিলাস'-এ নিম্নলিখিত ভাবে চণ্ডীদাসের সমর্থন করেছেন:

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত তারা করিল প্রকাশ॥—চৈতন্যমঙ্গল॥
সন্তোষ গোবিন্দ গোকুল সবে গায় গীত।
চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলায় হ'রে সবার চিত॥—প্রেমবিলাস॥

এ ছাড়াও সনাতন গোস্বামী মহাশয়··"শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিতদানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চজ্ঞেয়াঃ"···বলে চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের কাব্যের একটি অবিসংবাদিত স্থায়ী রূপ এবং বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। বিভিন্ন পুস্তকের এই সব উদ্ধৃতিতে চৈতন্যপূর্বে যে একজন চণ্ডীদাস ছিলেন তা' ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণিত হয়।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" যে চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগে লিখিত হ'য়েছিল তা বিভিন্ন পুস্তকের এই সব উদ্ধৃতি ছাড়াও গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণাদিতে বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়েছে। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থের লিপিতত্ত্ব এবং ডক্টর

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্ব নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকখানি পুরাতন শিলালিপি তাম্রশাসন এবং ছয়খানি পুরাতন পুথির (যাদের লিপিকাল ১০৮৫ থেকে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) হস্তাক্ষরের সাথে এই গ্রন্থের লিপিবদ্ধ অক্ষরের তুলনা করে স্থির সিদ্ধান্ত করেন "শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় 'কৃষ্ণকীর্তনে'র যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।" অনুরূপ ভাবে ভারতের সুবিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থের ভাষা নিয়ে গভীর আলোচনা করে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'Origin and Development of the Bengali Language' নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেন যে চতুর্দশ শতকের শেষপাদে পশ্চিম বাংলায় যে ভাষা প্রচলিত ছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা সেই ভাষারই সার্থকতম পরিচয়বাহী। লিপিতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্বের এই আলোচনা হ'তে নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাক্-চৈতন্য যুগে লিখিত হয়েছিল। এ ছাড়াও প্রাক্-চৈতন্য এবং চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী সাহিত্যের পার্থক্য লক্ষ্য করলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে চৈতন্যপূর্ব যুগে রচিত হয়েছিল তা নিম্নলিখিত আলোচনা হ'তে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়:

১ ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা লক্ষ্মীর অবতাররূপে কল্পিত হয়েছেন—এ সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-বিশ্বাস-বিরোধী। লক্ষ্মীর প্রেমে ঐশ্বর্য আছে কিন্তু রাধার প্রেমে ঐশ্বর্যের এতটুকু স্পর্শ নেই—তিনি সর্বকান্তাশিরোমণি।

২ ॥ পদাবলী সাহিত্যের সর্বত্রই শ্রীমতী রাধিকার পূর্বরাগ প্রথমে বর্ণিত হয়েছে—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়াইর মুখে রাধার রূপের কথা শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়েই প্রথমে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়েছে।

৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা এবং চন্দ্রাবলী অভিন্ন কিন্তু পর-চৈতন্য যুগের পদাবলীতে রাধা এবং চন্দ্রাবলী পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়াই রাধাকৃষ্ণের মধ্যে মিলন-সংযোগ ঘটিয়েছেন কিন্তু চৈতন্যোত্তর পদ-সাহিত্যে বড়াইর কোন উল্লেখ নেই। সেখানে রাধার নিত্য সহচরী হিসেবে ললিতা-বিশাখাদি সখীগণের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

৫ ॥ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা সংস্কৃতকাব্যাদর্শ সম্মত নায়িকা ;—অজ্ঞাত যৌবনা

মুগ্ধাবস্থা হতে প্রগল্‌ভাবস্থার পরিণাম পর্যন্ত অলংকার শাস্ত্রানুমোদিতভাবে তার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী যুগের রাধা প্রথমাবধিই কৃষ্ণে-সমর্পিতপ্রাণা,—কৃষ্ণ-প্রেমৈকসর্বস্বা। আরও পরবর্তীকালে, রূপগোস্বামীকৃত 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রভাবিত বৈষ্ণব আলঙ্কারিক আদর্শানুগা।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাথে পর-চৈতন্যযুগের এই বিপুল পার্থক্যের জন্যে এই গ্রন্থকে চৈতন্যপূর্ববর্তী বলে গ্রহণ করতে আমাদের কোনই বাধা নেই। যাঁরা প্রচলিত পদকর্তা চণ্ডীদাসকে চৈতন্যপূর্ববর্তী ব'লে স্বীকার করেন তাঁরা এখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাসকে এক এবং অভিন্ন বলে কল্পনা করার বড় সুযোগ পান। কিন্তু উভয় চণ্ডীদাসকে এক বলে স্বীকার করে নিলেও আবার সমস্যা দেখা দেয়। উভয় চণ্ডীদাস যদি একই হন তা' হ'লে 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' কিংবা 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' ইত্যাদির ভাষা ও ভাবের সাথে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার ও ভাবের এই দুরতিক্রমী ব্যবধান কেন? এর উত্তরে ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেছেন জনচিত্তহারী পদাবলীর ভাষা কালক্রমে গায়কগণের মুখে পরিবর্তিত হ'তে হ'তে বর্তমানের শুদ্ধরূপ পরিগ্রহ করেছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন এতদিন অনাবিষ্কৃত থাকায় তার ভাষায় কোন বিকৃতি ঘটেনি—চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষাই গ্রন্থখান আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এই বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখেই স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় মন্তব্য করেছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই। সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল—সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে একালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।"

বিষয়টিকে এত সরল এবং এমন সহজ করে দেখলে সমস্যার একটা সুন্দর সমাধান হয় বটে কিন্তু নতুনতর উপাদান আবিষ্কৃত হওয়ায় বিষয়টিকে আর এই সুন্দর সহজ সমাধানের মধ্যে ফেলে রেখে দেওয়া যায় না। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুর সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে দু'খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে গভীর ভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে এই পদগুলির অভ্যন্তরে চৈতন্য-পূর্ব অপেক্ষা পূর্বোক্ত পর চৈতন্য-যুগের পদাবলী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান। কেবল তাই নয়।

চৈতন্যোত্তর যুগের গোস্বামী-মহাজনগণের কারো কারো সংস্কৃত পদানুবাদ দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পাওয়া গেছে।এই সকল সাদৃশ্য লক্ষ্য করে শ্রদ্ধেয় মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় স্থির করেছেন "চণ্ডীদাস নামে দুইজন কবি বর্তমান ছিলেন। একজন চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগে, তাঁহার উপাধি ছিল বড়ু, অন্যজন চৈতন্যপরবর্তী যুগে, তাঁহার উপাধি ছিল দীন। ইঁহারা এক নহেন, বিভিন্ন। এই দুইজন ব্যতীত অন্য কোন চণ্ডীদাস ছিলেন না।" অনেকেই আবার বড়ু, দ্বিজ ও দীন উপাধিধারী তিনজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই : যারা দু'জন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন তাঁরা দ্বিজ চণ্ডীদাসের কতক পদ বড়ুর এবং কতক পদ দীনের রচনা বলে গ্রহণ করেছেন।

পদাবলীর চণ্ডীদাস যে পর-চৈতন্য যুগের সে সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। পদাবলীতে আমরা রাধার যে রূপ অবলোকন করি তা' 'মহাভাব-স্বরূপ শ্রীরাধাঠাকুরাণী'র মহিমামণ্ডিত রূপ এবং তা' 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত তনু শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যজীবনের আলোকচ্ছটায়' ভাস্বর। চৈতন্য পূর্ব যুগের পদাবলীর কোথাও রাধার এই মূর্তি পাওয়া যায় না।

বড়ু চণ্ডীদাসকে চৈতন্য-পূর্ব এবং দীন চণ্ডীদাসকে পর-চৈতন্য যুগের বলে ধরে নিলেও কতকগুলি বিশেষ প্রশ্নের সমাধান অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রধান প্রশ্নটি এই : মহাপ্রভু সপার্ষদ যে চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদন করতে করতে বিভোর হয়ে পড়ছেন তিনি কোন চণ্ডীদাস? মণীন্দ্র বাবু স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন : "মহাপ্রভু বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আস্বাদন করতেন।" কিন্তু এ মন্তব্য একেবারে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। কেননা গ্রন্থ মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যে চিত্র পাই তা একান্তভাবে স্থূল। কৃষ্ণ তো প্রাকৃত জগতের ইন্দ্রিয় পরায়ণ অসংযমী অধম মানুষ্যেতর জীব ছাড়া আর কেউ নয়। যে কৃষ্ণ রাধার অপরিণত যৌবনের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করতে উদ্যত, যে কৃষ্ণ মাতুলানীর সম্বন্ধ না মেনে রাধাকে শ্যালীকা সম্বোধনে রঙ্গরস করেন, যে কৃষ্ণ নারীর সতীত্বকে উড়িয়ে দিয়ে পুরাণাদি হতে প্রমাণ সংগ্রহ করে বলেন যে পরদারে পাপ নেই—সে কৃষ্ণের চরিত্রবর্ণনা শ্রবণ করে যে মহাপ্রভু উন্মাদ হয়ে উঠ্তেন এমন কথা বিশ্বাস করা দূরে, থাক কল্পনাতেও

আনা কষ্টকর। এ কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়লোলুপ, অসংযমী কামুক গোপ বালক ছাড়া আর কেউ নয়। এ ছাড়াও এ গ্রন্থের কয়েকস্থানে রাধা-কৃষ্ণের যে উলঙ্গ-রতি-বিহারের ছবি অঙ্কিত হয়েছে তা অতি আধুনিক যৌন-গ্রন্থগুলিকেও ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং এ গ্রন্থ মহাপ্রভু কর্তৃক আস্বাদিত হয়নি মনে করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু অন্যপক্ষ বলেন মহাপ্রভু ছিলেন পার্থিব ভোগ-লালসার উর্দ্ধে অপ্রাকৃত জগতের মানুষ। তিনি 'ক' শ্রবণেই কৃষ্ণ-চিন্তায় বাহ্যজ্ঞানরহিত হোতেন। তিনি উদার সর্বসংস্কার মুক্ত ছিলেন বলেই এই অশ্লীলতার ভিতরেও অনুভব করেছেন মহান অলৌকিক স্বর্গীয় সুষমার প্রাণ-স্পন্দন। মহাপ্রভুকেও যদি সংস্কারমুক্ত এবং বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত ধরা যায় কিন্তু তাঁর পার্ষদগণ তো বাহ্যজ্ঞান হারান নি। যদি তাঁর পার্ষদগণকেও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হিসেবে ধরা যায় তা' হ'লেও খেতুরীর মহোৎসবে যখন বিপুল জনসমক্ষে এ কাব্য সংকীর্তিত হয়েছিল তখন সাধারণ জনগণ এটাকে কেমন ভাবে নিয়ে ছিলেন? তাঁদের দৃষ্টিতে কী এ কাব্যের অশ্লীলতা ধরা পড়েনি? এ প্রশ্নের সদুত্তর পাবো কোথায়?

এ ছাড়া উপরে যে কারণ প্রদান করা হ'ল তা সর্বাংশে সত্য নয়। কোন গ্রন্থ শ্রবনের সময় মহাপ্রভুর শ্রবণেন্দ্রিয় সদাজাগ্রত থাকতো। চৈতন্যচরিতামৃত হ'তে জানা যায় মহাপ্রভু এবং স্বরূপ দামোদর কেহই রসাভাস বা সিদ্ধান্ত-বিরোধী ত্রুটিকে উপেক্ষা করতে পাতেন না :

> রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
> সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥ অন্ত্যলীলা, ৫ম প,॥

চরিতামৃতের এই অংশকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করলে মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন আস্বাদিত হয়নি বলেই মনে করা সঙ্গত। কেননা কৃষ্ণকীর্তনের বহু স্থানেই রসাভাস দোষ আছে। অসংখ্য রসাভাষের মধ্যে এখানে একটির উল্লেখ করা গেল : রসের আস্বাদন পদ্ধতি অনুযায়ী কালীয়দমন ও বস্ত্রহরণের পর রাসলীলা বর্ণিত হওয়া উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতে তাই বর্ণিত হ'য়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাসলীলার পর কালীয়দমন ও বস্ত্রহরণ বর্ণিত হওয়ায় প্রচণ্ড রসাভাস ঘটেছে। এই সব বিভিন্ন কারণ লক্ষ্য করে মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আস্বাদিত হ'য়েছিল বলে বিশ্বাস করতে আমাদের মন সংকুচিত। ফলে বড়ু চণ্ডীদাস এবং দীন চণ্ডীদাস এই দুই অংশে বিভক্ত করে সমস্যা-

সমাধানের প্রচেষ্টার প্রধান অন্তরায় এখানে নিবদ্ধ। এ ছাড়াও সনাতন গোস্বামী 'শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিতদানখণ্ডনৌকাখণ্ড'....বলে চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগের যে চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করা হ'য়েছে তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস নাও হ'তে পারেন। কেননা :

১॥ কৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড নৌকাখণ্ড মোটেই বৈচিত্র্যময় নয়—কাব্যিক প্রকাশের দিক হতে বিরহ ও বংশীখণ্ড অধিকতর ঐশ্বর্যময়। এই ঐশ্বর্যময় অংশকে বাদ দিয়ে সনাতন গোস্বামীর মত অগাধ পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের উল্লেখ আশ্চর্য বলেই মনে হয়।

২॥ দানখণ্ড নৌকাখণ্ড সমগ্র কৃষ্ণকীর্তনের তুটি পালা মাত্র—গীত-গোবিন্দের মত সম্পূর্ণ কাব্য নয়। অথচ টীকায় দানখণ্ড নৌকাখণ্ডকে তুটি পৃথক সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলেই মনে হয়।

৩॥ আজীবন সংস্কৃত গ্রন্থের পাঠক সনাতন গোস্বামীর পক্ষে বাংলা গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাঠ না করাই স্বাভাবিক। চণ্ডীদাস নামে একাধিক সংস্কৃত পণ্ডিতের নাম পাওয়া গেছে—সম্ভবতঃ সনাতন গোস্বামী এঁদের কারুর কথা উল্লেখ করে থাকবেন।

মহাপ্রভু যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আস্বাদন করেন নি সে সম্পর্কে আরো কতকগুলি প্রমাণ উল্লেখ করা যেতে পারে। মহাপ্রভু যে সকল পুস্তক আস্বাদ করেছিলেন সেগুলি মহাযত্নের সহিত রক্ষিত হ'য়েছে এবং বহু ভক্ত ও কবির কণ্ঠে তার কথা পুনোল্লিখিত হ'য়েছে। বিদ্যাপতির গীতি এবং রায়ের নাটক তাই ভক্তেরা সযত্নে রক্ষা করেছেন কিন্তু কেহই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রক্ষা করেন নি। আজ পর্যন্তও এর কোন দ্বিতীয় পুথিও পাওয়া যায় নি। এছাড়াও এতে যে পদগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে তাদের প্রচার নেই বল্‌লেই চলে। "শ্রীমণীন্দ্র মোহন বসু তাল শিখিবার পুথি হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দশটি মাত্র পদের প্রচলন দেখাইতে পারিয়াছেন।" শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই বিরল-প্রচারের কারণের কোন সুষ্ঠু সমাধান এবং উত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

বড়ু ও দীন অংশে বিভক্ত করে সমস্যা সমাধানের আর একটি প্রধান অন্তরায়ের অবতারণা এখানে করা যেতে পারে। দীন চণ্ডীদাসকে যদি চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবি হিসেবে ধরা যায় তা' হ'লে এর পদে গৌরচন্দ্রিকার

পদ বা গৌরাঙ্গ-বন্দনার পদ পাওয়া একান্ত স্বাভাবিক। বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকল পর-চৈতন্যযুগের কবির কাব্যে গৌরাঙ্গ-বন্দনা আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত দীনচণ্ডীদাসের যে সহস্রাধিক পদ পাওয়া গেছে তার একটিতেও গৌরাঙ্গ-বন্দনার পদ নেই। পর-চৈতন্য যুগের কবি হ'য়ে এইভাবে নীরব থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই মনে হয়।

সুতরাং শ্রদ্ধেয় মণীন্দ্রমোহন বসু চণ্ডীদাস সমস্যাকে বড়ু চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস এই দুই অংশে দ্বিভক্ত করে যে সমাধন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হলেও সম্পূর্ণ সমাধানের গৌরব-দাবী করতে পারে না। তাঁর এই প্রচেষ্টায় ঘননিশার নিকষ অন্ধকারের গাঢ়ত্বটা কিছু পরিমাণে হাল্কা হ'য়েছে মাত্র—'তিমির বিদারী উদার' আলোকোজ্জ্বল অভ্যুদয়ের এখনো অনেক বাকী। তার জন্যেও আমাদের ভবিষ্যতের নতুনতর উপাদান, হয়তো বা নতুনতর বিচার পদ্ধতির প্রয়োজন—কে জানে সাল-তারিখ নিয়ে বিবদমান পণ্ডিত সমাজের এই মসী যুদ্ধে কবে পূর্ণচ্ছেদ পড়বে।

॥ তিন ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাটকীয়তা ও গীতিধর্মিতা ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হওয়ার পর হ'তে এই কাব্যটিকে ঘিরে একটি রহস্যাবরণের সৃষ্টি হ'য়েছে। কাব্যটির রচনাকাল, কাব্যটির ভাষা, কাব্যটির রচয়িতাকে নিয়ে পণ্ডিতমহলে কত বিতর্ক, কত কথাকাটাকাটি, কত বিক্ষুব্ধতারই না সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহই সে রহস্যযবনিকার অন্তরাল হ'তে বাস্তব সত্যকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হননি। রচনাকাল ও স্বয়ং কবিকে নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি কাব্যের স্বরূপ নিয়েও ঠিক অনুরূপ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অসংখ্য প্রমাণ-পরিচয় এবং উদ্ধৃতি দিয়ে কেউ এ কাব্যকে ট্রাজেডির সমগোত্রীয় করেছেন, হাস্যরসের প্রাবল্য দেখে কেউ একে কমিকজাতীয় কাব্যের গণ্ডীতে ফেলার চেষ্টা করেছেন। কামাসক্ততার উলঙ্গ-প্রকাশ দেখে অনেকেই একে পদাবলী জাতীয় কাব্যের ত্রিসীমানা থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছেন, আবার শাশ্বত প্রেম-রূপিনী চিরন্তনী রাধার পরিচয় পেয়ে, কেউ একে সসম্মানে যুথিকাশুভ্র পদাবলীর অন্দর মহলের খাস

কামরায় স্থান দিয়েছেন। জটিল ঘটনাবর্তের দ্রুত নাটকীয় প্রকাশ ভংগী দেখে কেউ এ কাব্যকে নাট্যধর্মী কাব্য বলেছেন আবার বংশী বিরহখণ্ডাদিতে এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ নিটোল ভাব-জমাট কবিতা দেখে অনেকেই এ কাব্যকে গীতিকাব্যের কল্পলোকে প্রাবেশাধিকারের ছাড়পত্র দিয়েছেন। বস্তুতঃ এ কাব্যে অল্প-বিস্তর সকল উপাদনই বিদ্যমান। তবে সকল উপাদানের মাত্রা সমান নয়—নাটক ও গীতি কবিতার বেলাভূমির উপর দিয়েই বুঝি এ কাব্যের স্রোতধারা গভীর খাতে প্রবাহিত হয়েছে। নাট্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ এবং শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়দ্বয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই যে বাংলা নাটকের বীজ নিহিত আছে তা স্পষ্ট করেই স্বীকার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আবিষ্কারক কর্তা ভূমিকায় বলেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত গীতনাট্য শ্রেণীর গীতিকাব্য।" ডাঃ সুকুমাস সেন অনুরূপ মন্তব্য সমর্থন করে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত-কে 'নাট্যগীতিকাব্য' বলে উঃল্লখ করেছেন। প্রথমে আমরা গ্রন্থের অন্তর্নিহিত নাট্যধর্মিতার ওপর আলোক-সম্পাতের চেষ্টা করবো।

ক ॥ নাটকীয়তা :

কাহিনী উপন্যাসের প্রাণ—নাটকেও কাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কাহিনীর প্রবহমানতার ভিতর দিয়ে পাত্র-পাত্রীর চরিত্রের অন্তরগূঢ় পরিচয় উদ্ঘাটন করা যেমন উপন্যাসের লক্ষ্য নাটকেরও তেমনি প্রধান বৈশিষ্ট্য গল্পাংশের ক্রমপরিণতির ভিতর দিয়ে দোষগুণ সমন্বিত চরিত্রাবলীর অন্তরনিহিত স্বরূপের অত্যুজ্জল রূপায়ণ। তবুও উপন্যাস আর নাটক এক নয়। বর্ণনাবহুল যে ঘটনা উপন্যাসের পৃষ্ঠায় সাদরে রাজকীয় অভ্যর্থনা পায় নাটকের পৃষ্ঠায় তার প্রবেশাধিকার নেই। নাটকের জন্যে প্রয়োজন অন্তঃ-সংঘাত সৃজনী ঘটনা-বহুল গল্পাংশের। এ গল্পাংশের একদিকে থাকবে সদাচঞ্চল পাত্র-পাত্রীর কর্মপ্রবণতা অন্যদিকে থক্‌বে ঘটনার আকস্মিক উত্থান-পতন। উত্থান-পতনের তীব্র আঘাতে পাঠক কিংবা দর্শকদের মন বার বার আলোড়ন উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, শিহরণ-স্পন্দনে নতুনতর ঘটনার অভিঘাতে হ'য়ে উঠবে রোমাঞ্চ-রঙীন। নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য এখানে নিহিত—দ্রুত সঞ্চরমান এই কাহিনীর মধ্যে, উত্থান-পতন-স্পন্দিত ঘটনার মধ্যে, পাত্র-পাত্রীর কর্ম-ব্যাকুলতার মধ্যেই নাটকের যথার্থ মূল্যায়ন। বলা বাহুল্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের

মধ্যে এই সমস্ত নাটকীয় পরিস্থিতি অপূর্ব রেখাঙ্কনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই বিপুলায়তন গ্রন্থে পাত্র-পাত্রী মাত্র তিনটি: কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই; অথচ মাত্র এই তিন জনের উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতর দিয়ে সমগ্র গ্রন্থখানি অপূর্ব নাটকীয় গুণসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। প্রতিটি ঘটনায় কবি এমন নাটকীয় চমক দিয়েছেন যে পরবর্তী ঘটনা জানার জন্যে আমাদের সমগ্র মনপ্রাণ তীব্রভাবে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে যে রাধা কৃষ্ণ-বিরূপা—বংশীখণ্ড হতে তিনি আবার কৃষ্ণগতা-প্রাণা। বংশীখণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত যে কৃষ্ণ রাধিকা-প্রেম প্রার্থনায় কাঙাল বংশী-বিরহখণ্ডে সেই কৃষ্ণই রাধা-প্রেমের প্রতি আকর্ষণহীন। নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে এই বিরুদ্ধ মনোভাব বিশেষরূপে কার্যকরী হয়েছে। জন্মখণ্ডের মধ্যে আমরা একবার নারদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম—তারপর বহুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি—কিন্তু বিরহখণ্ডে পরম এক নাটকীয় মুহূর্তে তিনি আবার আবির্ভূত হলেন। কৃষ্ণগতা প্রাণা রাধা বড়াইকে নিয়ে ব্যাকুলচিত্তে বন-বনান্তরালে কৃষ্ণ-অন্বেষণে বৃথা ঘুরে বেড়াচ্ছেন হঠাৎ নারদ এসে উপস্থিত। রাধার প্রণয়-ব্যাকুল অবস্থা দেখে ধ্যানস্থ হয়ে তিনি বলে দিলেন যে কৃষ্ণ বৃন্দাবনের এক বকুলতলায় অবস্থান করছেন। মৃতপ্রায় রাধা যেন জীয়নকাঠির স্পর্শে নবীন প্রোল্লাসে জেগে উঠ্‌লেন—ছুটলেন বৃন্দাবনে। প্রিয়া-মানসের এই ব্যাকুলার্তির সাথে কবি ছন্দের যাদুস্পর্শে পাঠক-চিত্তকেও ক্রমোচ্চ আবেগে দোলাইত করছেন। রাধা এবং কৃষ্ণের মিলন-দৃশ্য অবলোকনের জন্যে যখন পাঠকের অন্তর্লোক ভিতরে ভিতরে তীব্র ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে ঠিক সেই মুহূর্তেই কবি কৃষ্ণ-দর্শনপ্রাপ্তা রাধাকে মূর্চ্ছিতা করে চরম নাটকীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করেছেন। তাম্বুলখণ্ডে পূর্বরাগোন্মত্ত কৃষ্ণের নিকট হতে পান তাম্বুলাদি নিয়ে বড়াই যখন রাধার নিকট এসে কৃষ্ণের অভিলাস জ্ঞাপন করেন তখন পাঠক-চিত্ত পূর্বাহ্ণ হ'তেই রাধার প্রেমাবেশ-বিহ্বল চৈতন্যহারা ব্যাকুল মূর্তিকেই কল্পনা করে নিয়েছে। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে দেখা গেল রাধা পান-তাম্বুলাদি পায়ে দলন-পূর্বক বড়াইয়ের কুঞ্চিত গালে চপটাঘাত করেই কৃষ্ণের পূর্বরাগের যথার্থ প্রতিউত্তর দিয়েছেন। চরিত্রাদির এই 'বিপরীত বিহার' নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির জীবন্ত সহায়ক। এ ছাড়াও "দানখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের উক্ত-প্রত্যুক্তিতে, নৌকাখণ্ডে হঠাৎ নৌকা নিমজ্জনে, নিদ্রিত কৃষ্ণের নিকট হইতে বংশী চুরিতে এবং কৃষ্ণের যোগীবেশ

খারণ প্রভৃতি ঘটনায় গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই নাটকীয় সংঘটনের আভাস পাওয়া যায়।" কিন্তু বিরহখণ্ডে যে অন্তরভেদী নাটকীয়তার সৃষ্টি হ'য়েছে বুঝি তার তুলনা নেই কোথাও। মরণোন্মুখ রাধা বড়াইয়ের সহায়তায় বৃন্দাবন-নিকুঞ্জে কৃষ্ণের সাথে মিলিত হলেন—এ মিলন যে কোন দিন বিরহের অন্তহীন উত্তাপে গলে যাবে তা কল্পনাও করা যায় না। রতি-বিহার-ক্লান্তা রাধা পরম কৃষ্ণের উরুতে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেলেন কিন্তু কৃষ্ণ উরু হ'তে নিদ্রাবিভুত রাধার মস্তক সন্তার্পণে ভূমিতে রেখে মথুরার পথে অদৃশ্য হ'লেন। এরপর জাগ্রত রাধার বুকে বিরহের যে তীক্ষ্ণ বজ্রশেল নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে তা' চরম নাটকীয়তায় পাঠকমনকেও বিদীর্ণ করে গেছে। বাণখণ্ডে কৃষ্ণের প্রণয়ের বিরুদ্ধে অজ্ঞাত যৌবনা রাধা যখন চরম প্রতিবাদে লিপ্ত তখন কৃষ্ণ পুষ্প-বাণ নিক্ষেপ করলেন :

বাম হাতে ধনুক ডাহিন হাতে বাণ।
রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান॥

এখানে কার্য্য এবং তার আকস্মিক পরিণতিতে নাটকীয় পরিবেশ অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে।

কালিয়-দমনখণ্ডে কৃষ্ণ যখন কালিয়দমনে যাওয়ার অভিলাস জ্ঞাপন করেন তখন তাঁর জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করে পাঠক-মনে কৃষ্ণের যে ঐশ্বর্যরূপ জাগ্রত হয় তা'তে নাগের ধংসস্তুপের ওপর কৃষ্ণ-ঐশ্বর্যের বৈজয়ন্তি উড্ডীন হওয়ার কথা কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় নাগের বিষে জর্জিত কৃষ্ণের মরণাপন্ন অচৈতন্য অবস্থা—এখানে সম্ভাব্য এবং বাস্তবতার সংঘর্ষে নাটকীয় পরিবেশ উচ্চ-গ্রাম (climax) স্পর্শ করেছে। এমনি ভাবে কৃষ্ণকীর্তনের অন্তরঙ্গের সর্বত্রই নাট-ধর্মিতা বিরাজমান। এই নাটকীয় পরিবেশ গ্রন্থখানির ঘটনা-সমুদ্রে গর্জনোন্মুখ ফেনিল-তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে, এই নাটকীয় পরিবেশ গ্রন্থের অন্তঃঘটনাপুঞ্জে তীব্র আলোড়নে এনেছে দুরন্ত উন্মাদনা এবং প্রচণ্ড গতিবেগ।

কাহিনীর ক্ষিপ্র গতি নাট্য-ধর্মিতার আর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। বলাবাহুল্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তার ব্যতিক্রম নয়। অবশ্য মাঝে মাঝে কাহিনী পুনরোক্তি দোষে শিথিল হ'য়েছে, এমন কী অবান্তর ঘটনার দীর্ঘ সংযোজনায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়েছে তথাপি কাহিনীর গতিশীলতা লক্ষণীয়। জন্মখণ্ডে কাহিনীর যে দ্রুত গতিবেগ দেখেছি তা' অভিনব এবং অত্যাশ্চর্য। এই দেবতাদের সভা, এই শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার জন্ম, এই নারদের বিবরণ, এই মাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও

রাধার ক্রমবর্ধমানের সংবাদ আবার এইমাত্র বড়াইর আগমন—সকল ঘটনা যেন মাত্র কয়েকটি মুহূর্তে একসাথে জমাট বেঁধে উঠেছে। একটি মাত্র ইংগিত দিয়েই, একটি মাত্র ইশারা করেই কবি সুদীর্ঘ ঘটনা ব্যক্ত করে প্রসঙ্গান্তরে গমন করেছেন। কাহিনীর এই ক্ষিপ্রতা, ঘটনা-স্রোতের এই বিদ্যুৎ-চঞ্চল গতি বাংলা সাহিত্যে বিরল-দৃষ্ট। তাম্বুল-খণ্ডেও কাহিনীর এই গতিবেগ অব্যহত। অন্যান্য খণ্ডেও রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে গতি সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হ'য়েছে।

প্রধান চরিত্রগুলির ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা নাট্য-ধর্মিতার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের যুগল চরিত্রের ক্রমবিকাশে বিভিন্ন নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্বের সুনিপুন প্রকাশ ঘটেছে। বড়াইয়ের নিকট হতে রাধার রূপ-বর্ণনা শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণের মনে পূর্বরাগের উদয় হয়েছে। কিন্তু রাধা তখন অজ্ঞাত যৌবনা—মুগ্ধা। তা ছাড়াও তিনি কৃষ্ণের মাতুলানী। সুতরাং বালিকা রাধা ও মাতুলানীর সাথে শ্রীকৃষ্ণের মিলন সম্ভব নয়। বয়সের পার্থক্য এবং সম্পর্কের বৈপরীত্যের মাঝে কাব্যের নাটকীয় বহির্দ্বন্দ্ব বিকশিত হয়ে উঠেছে। স্বর্গীয় মণীন্দ্র-মোহন বসু মহায়য়ের ভাষায় "সমাজ-চেতনা এখানে ব্যক্তি-চেতনার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষ্ণ জানেন যে তিনি স্বয়ং ভগবান। কংসবধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর রাধাও তাঁহার মূল প্রকৃতি স্বয়ং লক্ষী, কিন্তু রাধা তাঁহার স্বরূপত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহাতেই বহির্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে।" কৃষ্ণের কাতর প্রণয়-প্রার্থনাকে যখন রাধা 'সর্ব-সুলক্ষন দেহা' স্বামীর অজুহাতে উড়িয়ে দেন তখন মর্তে আগমন-হেতু নির্দেশ করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: "তোহ্মে নারী মোর, নহ আইহনের রাণী। কিন্তু রাধা ও সব কথা কর্ণপাতই করেন না। বিভিন্ন প্রত্যুক্তির ভিতর দিয়ে সকল কথাকে রাধা উড়িয়ে দেন। অবশেষে পরম বিরক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণ বলতে বাধ্য হ'য়েছেন: 'নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী'। এই উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যেই বুঝি কাব্যের নাটকীয় বহির্দ্বন্দ্ব উচ্চ-গ্রাম স্পর্শ করেছে।

কিন্তু সম্মোহণ-বাণে আহত হবার পর হ'তে এই বহির্দ্বন্দ্বের পরিবর্তে রাধার হৃদয়ে জেগেছে অন্তর্দ্বন্দ্বের সুতীব্র আলোড়ন। এখনকার রাধা জ্ঞাত-যৌবনা

এবং কৃষ্ণগতা-প্রাণা। মিলনের কাতরোক্তিতে তাঁর দেহমন তীব্রভাবে আন্দোলিত। কিন্তু আশ্চর্য—এখনকার কৃষ্ণ সম্পূর্ণ পৃথক মানুষ। রাধার প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ নেই—আকর্ষণ তো নেই বরং পূর্ব-প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে তিনি বদ্ধ পরিকর। রাধার শত কাতরোক্তিকে তিনি অবলীলাক্রমে এড়িয়ে যান। এখানে সৃষ্টি হ'য়েছে বহির্দ্বন্দ্বের। ঘটনা বিন্যাসের এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ, এই ঘাত-প্রতিঘাত, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব-বহির্দ্বন্দ্বের সৃষ্টিতে সমগ্র গ্রন্থখানি নাট্য-ধর্মের উজ্জ্বল-অভিব্যক্তি। রাধার অবচেতন মনে কৃষ্ণের প্রতি একটি আত্মিক আকর্ষণ ছিল কিন্তু মুগ্ধাবস্থায় রাধা তা' উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর অন্তরের এই প্রসুপ্ত প্রীতিকে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে উন্মেষিত করাই বুঝি ছিল বড়ু চণ্ডীদাসের প্রধান লক্ষ্য। বস্তুতঃ রাধাচরিত্রের বিকাশ ও পরিণতিতে কবি যে রূপ অপূর্ব দক্ষতা ও চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা' প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় রহিত। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের ভাষায়ঃ "তাম্বুলখণ্ডে যে 'চন্দ্রাবলী রাহী'র সহিত প্রথম পরিচয় হইল, সে সংসারানভিজ্ঞ রূঢ় অথচ সত্যভাষিণী, অশিক্ষিতা গোপবালিকা। কিন্তু কবি প্রত্যক্ষ ঘটনায় অসামান্য কৌশলে এই মূঢ় বালিকাচিত্তের উন্মেষ ও জাগরণ দেখাইয়া যখন পাঠককে শেষ পালায় লইয়া আসিলেন, তখন দেখি, সেই গোপকন্যা কখন যে শাশ্বতরসিকচিত্ত-বলভীর প্রৌঢ়পারাবতী শ্রীরাধায় পরিণত হইয়াছেন, তাহা জানিতেও পারি নাই।" 'রূঢ় রাধা'কে 'প্রৌঢ়পারাবতী শ্রীরাধায়' রূপান্তরিত করার জন্যে যে অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের বন্ধুর স্তর অতিক্রম করতে হ'য়েছে তার ফলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নিয়তির মত অনিবার্য কারণেই নাট্য-ধর্মী হ'য়ে উঠেছে।

॥ খ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্বরূপ, গীতি-স্পন্দন ও কাব্যত্ব :

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্বরূপ নির্ণয়ে অনেকেই গ্রন্থটিকে মহাকাব্যের পর্যায়ে ফেলেছেন। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয় তো স্পষ্ট করেই ঘোষণা করেছেন, "অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত মহাকাব্য-লক্ষণের কিছুই ইহাতে না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন মহাকাব্য।" অবশ্য এই মন্তব্যের মধ্যে সত্যভাষণ অপেক্ষা যে আবেগ মিশে আছে বহুল পরিমাণে তা' সহজেই অনুমেয়। প্রাচ্য অলংকারশাস্ত্রে মহাকাব্যের বাহ্যিকস্বরূপ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা' এই: 'কোন দেবতার

অথবা সদ্বংশজাত অশেষ গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের বৃত্তান্ত নিয়ে মহাকাব্য রচিত হবে। এতে অষ্টাধিক সর্গ-সংখ্যা থাকবে। গ্রন্থের উদ্দেশ্য বর্ণনাপূর্বক গ্রন্থারম্ভ হবে। বিবিধ ঋতু এবং প্রাকৃতিক বর্ণনা প্রভৃতি এর অঙ্গীভূত হবে। এতে আদি, বীর, করুণ অথবা এদের মধ্যে কোনও একটি রসের প্রাধান্য থাকবে এবং অন্যান্য রসও এর পরিপোষক হতে পারে। নায়ক ধীরোদাত্ত, ধীর-প্রশান্ত, ধীরোদ্ধত অথবা ধীর-ললিত হ'তে পারে; তন্মধ্যে ধীরোদ্ধত নায়কের বিশেষত্ব এই যে, ইনি মায়াবী, উদ্ধত, চঞ্চল, অহংকার ও দর্পে পরিপূর্ণ এবং আত্মশ্লাঘা বিষয়ে নিরত হবেন ইত্যাদি।' মহাকাব্যের এই সকল লক্ষণ সমূহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সুন্দর রূপে বিধৃত হ'য়েছে। 'রাধা ও কৃষ্ণ যথাক্রমে লক্ষ্মী ও নারায়ণের অবতার। অষ্টাধিক সর্গ এর অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণের রসসম্ভোগের জন্য দেবতাগণের অনুরোধে যে লক্ষ্মী এসে রাধারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই নির্দেশ কাব জন্মখণ্ডেই প্রদান করেছেন। অতএব আদিরসাত্মক রাধা-কৃষ্ণলীলা যে এই গ্রন্থে বর্ণিত হবে প্রথমেই তার সন্ধান পাওয়া যায়। বসন্ত, বর্ষা, শরৎ প্রভৃতি ঋতুর, এবং বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করে কবি গ্রন্থের সৌষ্ঠব সাধন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদিরসপ্রধান গ্রন্থ, এবং হাস্য ও করুণকে এর পরিপোষক রূপে নিয়োজিত করা হয়েছে। অলংকার শাস্ত্রের মতে কৃষ্ণ ধীরোদ্ধত নায়ক।' সুতরাং মহাকাব্যের বাহ্যিক লক্ষণগুলি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্তমান আছে তা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। অন্ততঃ বাহ্যিক লক্ষণ দেখে গ্রন্থখানিকে মহাকাব্যেব পর্যায়ে ফেল্‌তে আমাদের কোনই সংকোচ নেই।

কিন্তু গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে গ্রন্থখানিকে মহাকাব্যের পর্যায়ে ফেল্‌তে আমাদের মন কিছুতেই সায় দেয় না। মহাকাব্যে যে উদার গম্ভীর পরিবেশের প্রয়োজন তা' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই। মহাকাব্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে অসীম বিপুল উদার-গম্ভীর সমুদ্র-কল্লোল শোনা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তা কোথায়? মহাকাব্যের লক্ষণ অপেক্ষা গীতিকাকাব্যের লক্ষণগুলি এ কাব্যের অঙ্গ-সুষমাকে মনোহর-মসৃণ করে তুলেছে। দুটি হৃদয়ের অন্তরবেদনা এবং অনুভূতির অভিব্যক্তিই এ কাব্যের প্রাণসম্পদ। একটি চির-সুন্দর নিটোল ভাবাবলম্বনে নায়ক-নায়িকা-চিত্তের ব্যথা-বেদনা সুন্দর হয়ে ফুটেছে। একটি ক্ষণ-অনুভূতিকে ছন্দ-বন্ধনে শাশ্বত রূপ প্রদান করাই গীতিকাব্যের প্রধান লক্ষণ। বলাবাহুল্য বংশী এবং বিরহখণ্ডের অনেকগুলি পদে মানবহৃদয়ের

কতকগুলি চিরন্তন অভিব্যক্তি স্বয়ং সম্পূর্ণাকারে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। গীতিকাব্যে কোন কাহিনী থাকে না—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিভিন্ন অধ্যায়গুলি খণ্ডকাব্যের রীতিতে সংযোজিত হয়ে কাহিনী-কাব্যের রূপ ধারণ করেছে। কাহিনীর রূপধারণ করলেও এই গ্রন্থের অঙ্গ-বাস গীতিকাব্যের স্বর্ণ-চেলীতে স্বপ্ন-রঙীণ। কাহিনীর কাব্য-কুঞ্জ হতে গীতি-বেণু অমিয়-গুঞ্জনে বেজে উঠেছে।

নিম্নের কয়েকটি উদাহরণে আমাদের মন্তব্য স্পষ্ট হবে :

মেঘ আন্ধারী আতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতে না পাও।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাও॥

কিংবা :

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে॥

কিংবা :

বড়াই গো, কত দুখ কহিব কাঁহিনী।
দহ বুলী ঝাপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল,
মোঞেঁ নারী বড় অভাগিনী॥

ইত্যাদির পদের অন্তরনিহিত ক্রন্দন-সিক্ত মর্মভেদী ভাবরাশি গ্রহণ করতে কোনই বেগ পেতে হয় না। স্বয়ং-সম্পূর্ণ এ পদগুলির অভ্যন্তরে প্রণয়-ব্যাকুল-হৃদয়ের কী গভীর অতলস্পর্শী আর্তিই না বিরাজিত। তাই এ পদগুলি কাহিনীর অংশ হয়েও কাহিনী-সম্পর্ক শূন্য, কাহিনীর অঙ্গ হয়েও গীতি-কবিতার কোমল সুরে ঝংকৃত।

এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যত্ব নিয়ে আরো কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। কাব্যের কাব্যত্ব নির্ণয়ে বিভিন্ন আলংকারিকগণ যে মানদণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলির মধ্যে রস, অলংকার, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, ধ্বনি, ইত্যাদি প্রধান। বলাবাহুল্য আলোচ্যমান গ্রন্থে এদের প্রত্যেকটিরই সুন্দর সমাবেশ ঘটেছে। সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে প্রত্যেটির আলোচনা করা হল :

রস : রসতত্ত্বের আলোচনা যখন হতে শুরু হয়েছে সেই সুদূর অতীত কাল হতে বিভিন্ন আলংকারিকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। রসতাত্ত্বিকগণ যে আট প্রকার রসের কথা স্মরণ করেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রায় তাদের সব কটিরই সন্ধান মেলে। রসের রাজা আদি রস বা শৃঙ্গার রস। বলা বাহুল্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদি রসের খনি। শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগের জন্যেই যে শ্রীরাধার জন্ম সে কথা গ্রন্থের প্রারম্ভে বলা হয়েছে। কাহিনীর ক্রমাগ্রসতার সাথে সাথে সম্ভোগ শৃঙ্গারের যে চিত্র বর্ণগরিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং আদিরসের যে অফুরন্তধারা আপন আবেগে প্রবাহিত তা পাঠকের সমগ্র চিত্তকে বিপুল আকর্ষণে কেন্দ্রিভূত করে রাখে। উদ্ধৃতি সহ বিস্তৃত আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। আলোচ্য গ্রন্থে হাস্যরস যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে হাস্যরস" অংশে আমরা তার সবিস্তার আলোচনা করেছি। কাব্যের মধ্যে করুণ রসের অবদান অনন্ত এবং অসীম। যে রসের প্রীতি-পক্ষপাতে মনীষী বাল্মীকির চিত্ত ক্রন্দন-ফেনিল হয়ে উঠেছিল, যে রসের সঞ্জীবনী ধারায় আমাদের মর্মমূল অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে— শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঘটেছে সেই করুণ রসের অবাধ পদসঞ্চার। বংশীখণ্ড এবং বিশেষ করে বিরহখণ্ডের মধ্যে শ্রীমতীর মনোবীণায় বিপ্রলম্ভের যে সকরুণ রাগিনী গুঞ্জিত হয়ে উঠেছে তার বেদনা-বিধুর স্পর্শে আমাদের সমগ্র মনপ্রাণ ক্রন্দনের দুর্ণিবার আবেগে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন স্থানে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই শ্রেণীর বহু পদ উদ্ধৃত করেছি—এখানে উদ্ধৃতি-লালসা সংবরণ করলুম।

অলংকার-উৎপ্রেক্ষা : 'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ' বলে আলংকারিকেরা কাব্যের যে সংগা দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহুস্থানেই তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অবশ্য সর্বত্রই যে এই অলংকার-প্রয়োগ সার্থক এবং সুন্দর হয়েছে সে কথা বলা চলে না কিন্তু কয়েক স্থানে এই উপমা-অলংকার প্রয়োগ যে কোন প্রথম শ্রেণীর কাব্যের উপযোগী হয়েছে। নিম্নের উদাহরণগুলি আমাদের মতের পরিপোষক :

> নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।
> তাত ময়ূরের পুচ্ছ দিল সুবেশ॥…
> মাণিক-রচিত চন্দ্রসম নথপান্তী।
> সজল জলদ-রুচি জিনি দেহকান্তী॥

রাধার রূপ বর্ণনায় কবির রূপ-স্রষ্টা শক্তির এবং অলংকার-প্রয়োগ নিপুনতা সার্থকতার উচ্চ-গ্রাম স্পর্শ করেছে :

নীল জলদসম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পক মালা॥
শিশত শোভএ তোর কাম-সিন্দুর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূর॥
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডল-মণ্ডিত চারু শ্রবণ যুগলা॥

এ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় মণীন্দ্রমোহন বসু মন্তব্য করেছেন: "উৎপ্রেক্ষা-উপমাদির ব্যবহারে ব্যঙ্গার্থের প্রাধান্য দিয়া এই যে সরল, তরল, প্রাঞ্জল ভাষার পঙ্‌ক্তি-গুলি রচিত হইয়াছে, ইহাতে আনন্দের উদ্রেক করিয়া রসবোধ জন্মাইয়া থাকে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।...ইহা সংস্কৃত রচনার অনুকরণ হইতে পারে, কিন্তু প্রকাশা-ভঙ্গিমার সরসতার দিক্ দিয়া বিচার করিলে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি অপেক্ষাও মধুরতর হইয়াছেন।"
কবির বাক্-সংযম অপূর্ব। মাঝে মাঝে তিনি দুর্লভ চিত্র-বর্ণনার লোভ সংবরণ করে কয়েকটি মাত্র ইংগিত-ইসারায় একটি অরূপ দিগন্তের আবরণ উন্মোচন করে দিয়েছেন। তাম্বুলখণ্ডে তন্বী রাধার রূপ-বর্ণনা এই :

কেশাপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সূর॥
কনককমলরুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দা দুই লাখ যোজনে॥

রাধা-কৃষ্ণের মিথুন-দৃশ্যে কবির এই বাক্-সময়ম ও চিত্র-গরিমা অনবদ্য :

যেহ্ন নিকষত শোকে কনক রেহা।

অন্যত্র :

নীল মেঘ যেহ্ন পড়এ বিজুলী।
শক্রের ধনু যেহ্ন উয়িল আকাশে।

নাটকীয়তা ও গীতিধর্মিতা : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির বলিষ্ঠ কবিত্ব শক্তির পরিচয় রয়েছে গ্রন্থের নাটকীয় পরিবেশ এবং পরিস্থিতি সৃষ্টির মধ্যে। এ কাব্যের গীতি-স্পন্দনের মধ্যে নিহিত রয়েছে কাব্যত্বের অন্তরতন। অন্যত্র

আমরা এই উভয় ধর্মের বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আধ্যাত্মিকতা : এ গ্রন্থের কাব্যত্বের সুনিবিড় পরিচয় পাই বংশী এবং বিরহখণ্ডে কর্দম হ'তে জন্মগ্রহন করে সুদূরের আলোক পিয়াসী কমলের মত রাধা তার হৃদয়ের দলগুলি মেলে দিয়েছে এই স্থূল বস্তুপুঞ্জের অতীত এক স্বর্গীয় সৌন্দর্যলোকে। যে দুর্লভ কবিত্ব শক্তি থাকলে সম্ভোগ-শৃঙ্গারে কলুষিত কাব্যকে নম্র-বিধুর বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের সৌন্দর্যভূমিতে উন্নিত করা যায় সেই হ্লাদিনী শক্তি বড়ু চণ্ডীদাসের ছিল এবং তার সার্থক প্রয়োগও লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে এ কাব্যের মধ্যে। কেবলমাত্র একটা স্থূল কাহিনী-বিন্যাসের মধ্যে এ কাব্যের কাব্যত্ব নেই—এ কাব্যের পৃষ্ঠা-ভূমির উপর দিয়ে কাহিনীর যে দুরন্ত আবর্ত প্রবাহিত হয়েছে তাতে এ কাব্যের মূল্যায়ণ নির্ণীত হয়নি—স্রোত-প্রবাহের পর তলভূমে গীতকাব্যের যে সায়াহ্ন-কোমল মসৃণ পলি সঞ্চিত হয়েছে সেই পেলবতার ওপরেই পাওয়া গিয়েছে এ কাব্যের সোনার ফসল। কাব্য হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চরম সার্থকতা এখানেই। কাহিনীর কুঞ্জে কুঞ্জে গীতি কাব্যের যে বেণু বেজে উঠেছে কাব্য-রসিক-হৃদয়ে সেই সুরই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি বিশিষ্ট মূল্য দান করেছে।

॥ চার ॥

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের হাস্যরস ॥

আমরা হাসি কেন—এ বিষয়ের গবেষণায় বার্গস বোধহয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'Le Rire' নামক গ্রন্থে। তাঁর ঘোষণাটি এই : The laughable element consists of a certain mechanical inelasticity, just where one would expect to find the wide awake adaptability and the living pliableness of a human being—অর্থাৎ "যখন মানুষের সদাজাগ্রত নমনীয় ও সামঞ্জস্য সমর্থ স্বভাব একটা যন্ত্রসুলভ অনমনীয়তার দ্বারা আক্রান্ত হয় তখনই সৃষ্টি হয় হাসির উপাদান।" অসামঞ্জস্যের মর্মমূল থেকে হাসির উৎপত্তি। সামঞ্জস্য থাকলে হাসির উৎপত্তি হয় না। কথা-বার্তা, চাল চলন, কাব্য-নাটক প্রভৃতিতে যেখানেই অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় সেখানেই আমরা হেসে উঠি। উদাহরণ স্বরূপে ধরা যাক, একটি ভদ্রলোকের হাঁচি পেয়েছে। হাঁচির দমকে

তিনি চোখ বন্ধ করে ক্রমান্বয়ে মুখবিবর বৃহত্তর করতে করতে বজ্রনির্ঘোষে হাঁচির সাথে সাথেই চেয়ার উল্টিয়ে পড়ে গেলেন—এ অবস্থায় আমরা না হেসে থাকতে পারিনে—কেন না চোখের সামনে যা ঘটে গেল পরিবেশের সাথে তার কোন সামঞ্জস্য নেই। স্বর্গীয় মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বলছেন: "অপ্রত্যাশিত ঘটনার সন্নিবেশে, আকস্মিক বিচিত্রতায় এবং নূতনত্বের মৃদু উত্তেজনায় আমাদের স্বাভাবিক চিন্তাধারার কিছু ব্যতিক্রম সংঘটিত হলেই হাস্যরস অনুভূত হয়।' এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা, আকস্মিক বিচিত্রতা এবং সর্বোপরি অসামঞ্জস্যের সুর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহু স্থানেই ধ্বনিত হয়েছে। গ্রন্থারম্ভেই অর্থাৎ জন্মখণ্ডের প্রারম্ভেই কংসের সভায় নারদ মুনির যে চিত্র কবি অঙ্কিত করেছেন তা যেমন আকস্মিক-বিচিত্র তেমনি কৌতুকবহ:

পাকিল দাড়ী মাথার কেশ। বামন শরীর মাকড় বেশ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতি। বিকৃত বদন উমত মতী॥
লম্ফ দিয়া খণে আকাশ ধরে। খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে॥
মিলে ঘন ঘন জীহের আগ। রাঅ কাড়ে যেন বোকা ছাগ॥

নারদ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণায় নারদ মুনির যে ছবি আমাদের অন্তর্মূলে অঙ্কিত হ'য়ে আছে এই বিবরণ তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। এবং এই ব্যতিক্রম ও বিচিত্রতার জন্যেই নতুনত্বের সৃষ্টি হওয়ায় হাস্যরসের স্ফুরণ অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। বিকৃত অঙ্গাদি যে হাস্যরসোদ্দীপক তা' ভরতের নাট্যশাস্ত্র হ'তে আরম্ভ করে সকল রসশাস্ত্রেই স্বীকৃত হয়ে এসেছে। এখানে নারদের অঙ্গাদি বিকৃত তো বটেই তা ছাড়াও কবি ছাগ, ভেক, মাকড় প্রভৃতি শব্দ দিয়ে নারদের চালচলন ইত্যাদি বর্ণনা করায় হাস্যরস জমাট বেধে উঠেছে। নারদের এই বিকৃত অঙ্গাদি দেখে শেষ পর্যন্ত অসুরপতি কংসও না হেসে থাকতে পারে নি: 'দেখিয়া কংসেতে উপজিল হাস।'
এই জন্মখণ্ডেই কবি বড়াই বুড়ীর যে বিবরণ দিয়েছেন তাও অনুরূপ ভাবে হাস্যরসবহ:

শেত চামর সম কেশে। কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে॥
ভ্রুহি চুনরেখ যেহ্নদেখি। কোটর বাটুল দুঈ আখি॥
কাঠীসম বাহুযুগলে। নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে॥

পূর্ব হ'তে নেপথ্যে পরামর্শ করে আমরা যদি কাকেও অপ্রতিভ করতে পারি তা' হলে সার্থকতার সাথে পরম হাস্যরসের অনাবিল প্রবাহে আমাদের মন-প্রাণ

কৌতুক-স্নাত হ'য়ে ওঠে। নেপথ্যলোকের পরামর্শ অনুযায়ী হাস্যরসের স্ফুরণ ঘটেছে 'দানখণ্ডে'। পূর্ব পরামর্শ অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ দানী সেজে পথে বসে আছেন—এবং এই দানীর হাতে পড়ে রাধার যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদিগকে যথেষ্ট পরিমানে হাসিয়েছে। বিশেষ করে রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি হাস্যরসের যেন একটী নির্মল ফোয়ারা। কৃষ্ণ বলেন, 'তোমার নিকট বার বছরের দান পওনা আছে—আজ তা' আদায় করবো।' উত্তরে অবাক-বিস্মিত রাধা বলেন :

সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে॥

অর্থাৎ সবেমাত্র আমার এগার বছর বয়স—বার বছরের দান চাও কেমন করে! এ 'যেন কথামালার সিংহ ও মেষসাবকের উক্তি-প্রত্যুক্তি'। এই দুই ছত্রে হাস্যরস নিবিড় হয়ে ধরা দিয়েছে।

ইংরেজীতে হাস্যরসের যে সকল বিভাগ পরিকল্পিত হয়েছে তন্মধ্যে wit, Satire, Humour ইত্যাদি প্রধান। আশ্চর্যের বিষয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এদের প্রত্যেকটি সুনিপুণ দক্ষতার সাথে সুঅঙ্কিত হয়েছে। ভারখণ্ডে দেখি রাধার কৃপা-প্রাপ্তির আশায় শ্রীকৃষ্ণ (?) অতি সহজেই ভার বইতে সম্মত হলেন। দীনবন্ধু মিত্রের' বিয়ে পাগলা বুড়োর'-র বহুপূর্বেই যে বঙ্গসাহিত্যাঙ্গনে আর এক বিয়ে পাগলা বুড়োর জন্ম হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই তার প্রমাণ পেয়ে আমরা অবাক হই। বংশীখণ্ডে নিদ্রোত্থিত কৃষ্ণ যখন জান্‌তে পারলেন যে তাঁর বংশী চুরী হয়ে গেছে তখন সাধারণ জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌লেন। অবশেষে বড়াইর পরামর্শানুযায়ী আমরা যখন দেখি তীব্র-বিচলিত কৃষ্ণ গোপীগণের নিকটে হাত জোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন তখন আমাদের অন্তরে সঞ্চিত হাস্যোদ্বেগ হাল্‌কা করার জন্যে কিছুক্ষণ পাঠ বন্ধ করে হেসে নিতে হয়। শ্রীরাধার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রেম-প্রার্থী হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ব্যাকুল আবেদন জানান :

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর।
প্রাণ জেন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর॥

কালবিলম্ব না করে রাধা উত্তর দেন :

যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতে না পারে।
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে॥

অর্থাৎ 'আমার রূপ দেখে যার বুক ফেটে যায় গলায় পাথর বেধে সে দহে ডুবে মরুক।' ব্যঙ্গ-কৌতুকের (wit) এমন সার্থকতম উদাহরণ আর কোথায় আছে ?

রাধিকার চিত্তকে আপন-ঐশ্বর্যরূপে আকৃষ্ট করাবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, তিনি লঙ্কা ছারখার করে রাবণ-বধ করেছিলেন কিন্তু স্পষ্ট ভাষিণী রাধা উত্তর দেন :

আকাশ প্রমাণ লঙ্কার গড়
তোহ্মার পরাণে তথাঁ জাই
গরু-রাখোআল গোঠে থাকহ
মিছা বোলহ তুঈ ভাই ॥

অর্থাৎ 'তুমি গরু-রাখাল গোঠে থাক, আকাশ প্রমাণ লঙ্কার গড়ে তোমার প্রবেশ করার সাধ্য কোথায়।' হাস্য-কৌতুকের (Humour) এ এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণ তবুও হাল ছাড়েন না। রাধাকে আপন-ঐশ্বর্যে মুগ্ধ করাবার জন্যে আবার বলেন যে, তিনি বরাহরূপে মহী ধারণ করেছিলেন এবং নর-সিংহরূপে তিনিই হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছেন। উত্তরে পূর্বের মতই রাধা কালবিলম্ব না করে উত্তর দেন :

বুঝিল কাহ্ণাঞিঁ তোমার বিরতে
মিছা না করহ দাপে।
আছুক তোহোর কথা হেন করিতেঁ
নারে তোর বাপে ॥

এখানে 'বাপে' কথাটি শ্লেষ বা বিদ্রূপোক্তি (Satire)।

এমনি ভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সর্বত্রই হাস্যরসের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। হাস্যরসের অনাবিল ধারায় সকল কিছুই সরস এবং অভিনব হয়ে উঠেছে। এই হাস্যরসই গ্রন্থখানির লীলার আস্বাদনীয়তাকে অপূর্ব রসমণ্ডিত করে তুলেছে। সকল তত্ত্বকথা, সকল আধ্যাত্মিকতা, সকল গীতি-ঝংকারের উপরেও যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে হাস্যরসের একটি বিশেষ রসমূল্য আছে তা কোন প্রকারেই অস্বীকার করা যায় না। স্বর্গীয় মণীন্দ্রমোহন বসু তাই সত্যই বলেছেন : "গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই কবি নানা কৌশলে তাঁহার অভিপ্রেত

হাস্যরসের সমাবেশ করিয়াছেন। ইহা সমস্তই প্রেমের লীলাভিনয়, নিবিড় মিলনের পূর্বাভাস রূপে উভয়কে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে॥"

॥ পাঁচ ॥

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সামাজিকতা ॥

সুদূর অতীতকালের বাংলার গ্রামীন জীবনের একটি অপূর্ব বাস্তব-চিত্র পাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। নৈতিক ধংসস্তুপের উপর ব্যভিচারোন্মত্ত বাঙালীর গ্রামীন জীবনের যে চিত্রাঙ্কনা ফুটে উঠেছে এ গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তা বাস্তব জীবনের এক রঙীন-রেখাচিত্র। নৈতিক-জীবনের এই ধংস-সাধন কেমন করে দিনের পর দিন উন্নতর সমাজ-জীবন হতে গ্রাম্য জীবনে ছড়িয়ে পড়েছিল এ প্রসঙ্গে তার ইতিহাসটুকু আমাদের জানা প্রয়োজন।

দ্বাদশ হতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী—এই সুদীর্ঘ তিন শতকে বঙ্গ এবং উড়িষ্যার সামাজিক জীবনে এক অতিশয় নৈতিক দুর্গতির দিন ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দে তার প্রমান আছে। এ গ্রন্থে আধ্যাত্মিকতা যাই থাক—রুচি প্রত্যেকের চোখে পড়বে। পদ্মাবতী নাম্নী এক অনন্যসাধারণ বযুতী লক্ষ্মণসেনের সভায় নৃত্য করতেন—এই যুবতীই ছিলেন জয়দেবের "সেবাদাসী"। পর-স্ত্রী গমনে কোন আত্মগ্লানী-পীড়ন অনুভূত হতো না—বরং সবাই গৌরব অনুভব করতেন।

সমাজ ছিল এই আনন্দ-বোধের সহচর। জয়দেব যখন উপপত্নী পদ্মাবতীর প্রেমামৃত জয় করলেন তখন তিনি নব রসিকের একজন হয়ে উঠলেন—বিবাহিত পত্নীদ্বারা এই উপাধি পাওয়া সম্ভব ছিল না। অনুরূপে লক্ষ্মণসেন যখন কলিঙ্গ রমণীগণের প্রেম লাভ করেছিলেন তখন তাম্রশাসনের প্রশংসাপত্র প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভাষায় "এই যুগের তাম্রশাসনগুলিতে হর-পার্বতী বন্দনায়, তাঁহাদের হাব-ভাব ও পরস্পরের আলিঙ্গন বদ্ধ প্রেম যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—তাহা শীলতার অভাব ও রুচির বিকার সুচনা করিতেছে। সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় হর-পার্বতীর সেই সময়কার একখানি বীভৎস প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। পুরী ও কোনার্ক মন্দিরের গাত্রে খোদিত মূর্তি সমূহের দিকে চাহিতে চক্ষু লজ্জায় অবনত হইয়া পড়ে। দ্বাদশ শতাব্দীতে তন্ত্রাদির বিশেষ অনুশীলনের ফলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শীলতার স্বাভাবিক ব্যবধান অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল।

রাজসভায় যে ভাব-বিকার উপস্থিত হয়, সমাজের নিম্নস্তরে তাহা যখন আসিয়া পৌঁছায়, তখন তাহা অতি বিকট হয়। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর পরে বঙ্গ-দেশের জনসাধারণের মধ্যে অতি ঘোর রুচি বিকার দেখা গিয়াছিল।" শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ঘটেছে সেই 'অতিঘোর রুচি-বিকার' সমন্বিত তৎকালীন সমাজের সার্থক জীবন-চিত্রায়ণ। এ কাব্য তাই লোকজীবনের একনিষ্ঠ সাধনা এবং উপলব্ধি-সম্ভূত সার্থক 'লোক-কাব্য'। তাই এ কাব্যকে আমরা যে রুচি হীনতার এবং অশ্লীলতার দোষে পদাবলী সাহিত্যের দিগন্ত-পারে রেখে দিই তা' কবির কল্পনা-প্রসূত নয়, গ্রন্থমধ্যে তা' ইচ্ছা পূর্বক আরোপিতও হয়নি—এই রুচি-হীনতা ও অশ্লীলতা সে যুগের সমাজ-জীবনের অবিমিশ্র বাস্তবালেখ্য, জীবন-চিত্রায়ণের অপরিত্যাজ্য অঙ্গ। সেই সুদূর অতীত কালের অন্ধকারাচ্ছন্ন লৌকিক-সমাজ-জীবনের অস্পষ্ট গতিবিধি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আলোকে হঠাৎ ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। এ কৃষ্ণ 'শ্রীকৃষ্ণ' নয়, এ রাধা 'শ্রীরাধা' নয়। কবিশেখর কালিদাস রায়ের ভাষায়, এ কৃষ্ণ "গোপ-পল্লীতে প্রতিপালিত হইয়া অমার্জিত চরিত্রের সবলকায় কিশোর। এই গোপ-পল্লী সেই যমুনাতীরের বিদগ্ধ ভাবাপন্ন আভীর-পল্লী নয়, এ যেন বাঙলার ভাগীরথী-তীরের অশিক্ষিত গোপপল্লী।"

সত্যিই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই অশিক্ষিত গোপপল্লী তথা অনভিজাত শ্রেণীর জীবন-যাত্রার বাস্তব সমাজ-চারণার নিখুঁত আলেখ্য। শ্রদ্ধেয় ভূদেব চৌধুরীর ভাষায় এই বাস্তব-রূপায়ণ সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে: "রাধা-চরিত্র সেই জীবন-ব্যবস্থা-প্রভাবিত অপরিহার্য 'ট্রাজেডি'-র বাস্তব আলেখ্য। যে যুগে, যে সমাজে পরিণত যৌবন পুরুষের সঙ্গে অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বালিকার বিবাহ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল,—অন্য কারণ ব্যতিরেকেও সেই সমাজের পক্ষে আলোচ্য দুর্নৈতিক পরিণাম অপরিহার্য না হলেও নিতান্তই স্বাভাবিক। সদ্য-জাগ্রত যৌবন পুরুষের লালসা অপ্রাপ্ত-চেতন 'অজ্ঞাত-যৌবনা' বালিকার হৃদয়ে আঘাত করে অকাল বোধন প্রচেষ্টা জনিত যে বিভীষিকাময় পরিণতির সৃষ্টি করতো,—অধুনাতন কালের সুধী-জনের নিকটেও তার পরিচয় একেবারে অস্পষ্ট নয়। কিন্তু অনৈসর্গিক উপায়ে নির্বোধ বালিকার নারিত্বকে অকাল জাগ্রত করার পর তার মধ্যেকার সদ্যজাগ্রত কুম্ভকর্ণের বুভুক্ষাকে অপরিতৃপ্ত রেখেই পুরুষের পৌরুষ অপচয়ের মধ্যে স্তিমিত হ'য়ে পড়তে হ'তো প্রায়ই;

—জীবনের সেই বিভীষণ মুহূর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিরুপায় নারীত্বের অনিবার্য আর্তনাদ-ধ্বনিই " ঝংকৃত হ'য়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। রাধা-বিরহ খণ্ডে শুনি সেই ঝংকারেরই অভিনব রেশ :

"যে কাহ্নু লাগিআঁ মো আন না চাহি লো"

বড়ায়ি :

না মানিলোঁ লঘু গুরুজনে।
হেন মনে পড়ি হাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥···

জাগ্রত-যৌবনা রাধার এই ব্যাকুল অন্তরার্তির মধ্যেই ধ্বনিত হ'য়েছে গোপ-পল্লী-বালার ভগ্নহৃদয়ের 'ট্রাজেডি'র সুতীক্ষ্ণ করুণ আর্তনাদ।

তৎকালীন সমাজের এই ক্লেদ-ক্লিন্নতার আবরণ উন্মোচনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সামাজিক চিত্র-রূপায়ণের সার্থকতম রূপ। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা, চাল-চলন ইত্যাদি অন্যান্য যে সকল গৌণ-বিষয় আমরা এই গ্রন্থ-মধ্যে প্রাপ্ত হই—নিম্নের আলোচনা হ'তে তাদের স্বরূপ পরিস্ফুট হবে।

'দুহিতা' শব্দের উৎপত্তি আর্য সমাজে যে জন্যে হয়েছিল তা' আমাদের অজানা নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রমণীগণের এই দুহিতা নামের চরম সার্থকতা দেখি। দুগ্ধ দোহন এবং দুগ্ধ-দধির পসার নিয়ে বাজারে বিক্রি গোপরমণীগণের দৈনন্দিন কর্তব্য ছিল। এই অবশ্য কর্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে সখীগণের সঙ্গে রাধাকে প্রতিদিন বনপথ বেয়ে মথুরা নগরে যেতে হতো। বাজারে না যেয়ে ঘরে বসে থাকা ছিল মেয়েদের কিংবা কুলবধূদের পক্ষে দুর্ণামের। কৃষ্ণের অত্যাচারে রাধা যখন বাজারে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন তখন তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল শ্বাশুড়ীর গঞ্জনা : 'ঘরক থাকিতেঁ চাহ কিসের আসে।' নদীতে খেয়াপারের ব্যবস্থা ছিল—খেয়ারি খেয়া দিয়ে আপন-জীবিকা নির্বাহ করতো। 'নৌকাখণ্ডে' আমরা খেয়া পারাপারের উজ্জ্বল চিত্র পাই। 'দানখণ্ডে' আমরা পাই মহাদানীর কথা—বাজার-হাটে এখনকার কর (ট্যাক্স) আদায়ের মত তখনকার দিনেও দান তোলার ব্যবস্থা চালু ছিল। দরিদ্র মেহনতী মানুষের জন্যে মজুরী প্রথা তখনকার দিনেও প্রচলিত ছিল—'ভারখণ্ডে' কৃষ্ণ কর্তৃক রাধিকার দধি-দুগ্ধের পশার বহনে এ কথার নিশ্চয়তা প্রমাণিত হয়। •

রাখাল-বালক, বেণু-ধ্বনি এবং দিগন্ত-বিথার শ্যামল-প্রান্তর চিরদিন বাঙালী কবি-কুলের ভাব-প্রেরণায় বেগ সঞ্চার করেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিও বাংলার এই সুপ্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা-প্রতিষ্ঠিত রাখাল বালক এবং বংশীর নাদকে ভুলতে পারেন নি। শ্যামাঙ্গ-উজ্জ্বল সুবিশাল-প্রান্তর কবির কল্পনাকে প্রগাঢ় করেছে, গোপকুমার শ্রীকৃষ্ণের রাখালিয়া বাঁশির সুর সেই প্রগাঢ় ভাব-তরঙ্গকে ফেনিল-নির্ঝরণী করে তুলেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাই গোচারণ ভূমি এবং রাখাল-জীবনের একটি সুন্দর চিত্র পাই।

মিলনের বন্ধুর পথকে প্রশস্ত করার জন্যে পুষ্প-পান প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল সে যুগের এক অপরিহার্য অঙ্গ। কৃষ্ণের হৃদয়াকাঙ্ক্ষাকে রাধার নিকট প্রকাশ করার জন্যে তাই বড়াই কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করেছে: 'আহ্মার হাথত দেহ কিছু ফুলপানে।' অবশ্য এই সামাজিকতা আজো বাংলার বুক হ'তে একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়নি। বিবাহের কথাবার্তায় এমন কি বিবাহ-নিমন্ত্রণ জ্ঞাপনের জন্যে আজো বহু স্থানে তাম্বুলাদি প্রেরণের ব্যবস্থা আছে।

বাঙালী সমাজ চির দিনই ছুঁতমার্গ। আচার-অনুষ্ঠানের, নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে এ সমাজের চতুর্দিক পরিবেষ্টিত। তাই সামান্য কিছু অমঙ্গল-চিহ্ন-দর্শনে বাঙালী মানস-চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর এই বিচার-বিশ্লেষণময় বিজ্ঞানালোকিত যুগেও বহির্গমনের সময় পিছু ডাক্‌লে আমাদের মন বিষিয়ে ওঠে, হাঁচি উঠ্‌লে অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করি, খাওয়ার সময় শ্বাসনলী রুদ্ধ হলে ভাবি আত্মীয়-স্বজন নাম করছে। শুচিবায়ুগ্রস্ত বাঙালী সমাজের এই স্পর্শ-কাতরতার চিত্রটি সুন্দররূপে বিধৃত হয়েছে 'বংশীখণ্ডে'র একটী পদে:

> কোন আসুভ খনে পাঅ বাড়ায়িলোঁ।
> হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ॥
> শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
> বাঞঁর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ॥
> হাতে খাপর ভিখ মাঙ্গ-এ যোগিনী॥
> কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।
> সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ॥...

হাঁচী পাওয়া, টিকৃটিকি ডাকা এবং শূন্য কলস দেখা, বাঁয়ের শিয়াল ডাইনে

যাওয়া' হাতে নরকঙ্কাল নিয়ে যোগিনীর ভিক্ষা করা, কাঁধে কেঁড়ে নিয়ে তেলীর অগ্রগমন এবং শুষ্ক ডালে উপবিষ্ট কাকের কাতর ধ্বনি এ সবই তৎকালে ভীষণ অমঙ্গলের চিহ্ন বলে গণ্য হ'তো।

কুলনারীগণের সতীত্ব নষ্টের জন্যে যে সমস্ত কুট্টিনী বুড়ী অদ্যাবধি সমাজে বর্তমান এবং যাদের ব্যাপক-প্রতিষ্ঠা দেখেছি "মৈমনসিংহ গীতিকা"য়—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও তেমন চরিত্র দুর্লভ নয়। বড়াই এই সকল কুট্টিনী জাতীয় চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছে। 'তাম্বুলখণ্ডে' সেই কৃষ্ণের মনকে রাধিকার দিকে অধিকতর আকৃষ্ট করে বলেছে :

আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারি।
সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারি॥

সতী নারীকে কু-পথে আনা সহজ ছিল না। তাই কৃষ্ণের নিকট হতে তাম্বুলাদি নিয়ে রাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের মনাভিলাস জ্ঞাপন করলে সতী রাধা পাপ-প্রণয়-উপচার তাম্বুল-পুষ্প পদদলিত করে বড়াইকে চপেটাঘাতে সমুচিত উত্তর দান করেন। এখানে রাধা ধর্ম এবং সমাজের সুদৃঢ় পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম তাঁকে শাসন করেছে, সমাজ তাঁর পাপাচারের পথ রুদ্ধ করেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগে বাংলা দেশে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। সমাজের সর্বত্রই তার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল অবাধ। 'রাধাবিরহ' খণ্ডে এই তান্ত্রিক-অধ্যাত্মবাদ সাধনার একটি সুন্দর চিত্র বর্ণগরিমায় উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে। সুদীর্ঘ বিরহের পর কৃষ্ণের সাথে রাধার মিলন হ'লে রাধা কৃষ্ণের অঙ্গ প্রার্থনা করেন কিন্তু উত্তরে কৃষ্ণ জানান যে তিনি এখন অধ্যাত্ম-সাধনায় নিমগ্ন :

আহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই॥···
ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মনপবন তাত কৈল বন্দী॥···

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ইত্যাদিতে তন্ত্রাদি শাস্ত্রের ষট্‌চক্র ও তাদের ভেদক্রম সুন্দররূপে বর্ণিত হয়েছে। গায়ের মাংস কেটে মকর ভোজ এবং চণ্ডীপূজা ইত্যাদি মানসিকের প্রচলন এ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এমনি ভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সর্বত্র সামাজিকতার সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। লোক-জীবনের অন্তরাত্মার সাথে এ কাব্যের এক ঘনিষ্ঠ যোগ বর্তমান। এবং এই যোগসূত্রের পটভূমিতে এ কাব্যে সামাজিকতার চিত্র মূর্তিমান হয়ে উঠেছে। বাস্তবানুভূতির বিস্ময়কর চিত্রন এবং লোক-জীবনের গভীরতম স্পন্দনে এ কাব্য দোসরহীন অনন্তসুন্দর।

॥ ছয় ॥

॥ চণ্ডীদাসের পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥

পদাবলীর কেন্দ্রভূমি হতে যে বিরামহীন স্বর্গীয় রাগিনী অনুরণনিত হ'য়েছে তার মধুরতম আবেশে আমাদের নিখিল মনপ্রাণ মহাকবি চণ্ডীদাসের প্রতি বিশ্বাস, নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায় এবং ঐকান্তিক ভক্তিতে নম্র-নত হয়ে পড়েছিল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হওয়ার পর হতে নানা কারণে কেন্দ্র-সংহত সেই জমাট প্রীতি-প্রেম শিথিল হয়ে পড়েছে। সেই ভালবাসা সেই ভক্তি, সেই শ্রদ্ধা অনেকখানি সন্দেহের আবরণে ঢাকা পড়ে মলিন হয়ে গেছে। অবশ্য এই ভাবান্তরের পিছনে উপযুক্ত কারণ বিরাজমান। চণ্ডীদাসের একতারা হতে যে মহান প্রেম-সঙ্গীতের অপূর্ব রাগিনী ঝংকৃত হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বেসুরো বাঁশীর অশ্রাব্য সুর সেই মহান রাগিনীর মর্ম্মমূলে আঘাত হেনেছে। যূথিকা-শুভ্র নির্মল পবিত্র পদাবলীর যে স্বর্গীয় সুরভি আমাদের দেহমনকে পরমপবিত্রতায় স্নিগ্ধ ও নম্র-বিধুর করে রেখেছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কুরুচিপূর্ণ কামোন্মত্ততার দুর্গন্ধ সে পবিত্রমাধুরিমাকে বিনষ্ট করেছে। চণ্ডীদাসের পদাবলী মনোরম, মহান এবং মর্মস্পর্শী আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একান্ত স্থূল, রুচিহীন এবং গ্রাম্যতা দুষ্ট। ভাষায়, প্রকাশ ভংগীতে এবং ভাবে পদাবলী এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে এক সুদূর প্রসারী ব্যবধান রচিত হয়েছে। উভয় গ্রন্থের রাধা ভিন্ন, উভয় গ্রন্থে কৃষ্ণ-স্বরূপও এক নয়, উভয় গ্রন্থের ভাবধারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুই স্বতন্ত্রখাতে প্রবাহিত।

ক ॥ উভয়গ্রন্থের ভাষার পার্থক্য :

পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভাব গভীরতার সাথে ভাষার সারল্য তাঁর পদাবলীকে এক অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করেছে। এই পদাবলীর একদিকে আছে বাহ্যচেতনবিহীন ঐকান্তিক আত্মিকতা আর অপরদিকে আছে ভাববাহী

ভাষার আকর্ষণীয় সরলতা। এই উভয়ের সংমিশ্রণে, এই উভয়ের মনিকাঞ্চন যোগে চণ্ডীদাসের পদাবলী অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতায় মহিমান্বিত হ'য়ে উঠেছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা অলংকার-দীপ্ত না হয়ে ওঠার পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে। কাব্য-সৃষ্টিতে কবির দু'টি সত্তা ক্রিয়াশীল—একটি দ্রষ্টা সত্তা অপরটি স্রষ্টা সত্তা। দ্রষ্টা সত্তায় কবি উপলব্ধি করেন আর স্রষ্টা সত্তায় তিনি সেই উপলব্ধিজাত সত্যকে বর্ণদীপ্ত ভাষায় প্রকাশ করেন। এই স্রষ্টা সত্তায় চণ্ডীদাস ছিলেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তিনি যত বড় রূপদক্ষ ছিলেন ততবড় রূপশিল্পী ছিলেন না। তিনি রূপ দেখেছেন—দেখে আত্মহারা হ'য়েছেন সেই আত্মতন্ময়তাকেই তিনি 'গুছিয়ে না রাখা সাদা কথায়' প্রকাশ করেছেন। অনুভূতি যেখানে তীব্র, হৃদয়াবেগ যেখানে দুর্নিবার—সেখানে ভাষা এমন সরল এবং সহজ হ'তে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা এই ভাবের অনুবর্তন দেখেছি। 'সোনারতরী' এবং 'চিত্রা' যুগের অলংকারোজ্জ্বল ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাষা 'খেয়া-গীতাঞ্জলী-গীতালি'-তে কি অনাড়ম্বর সারল্যেই না কায়াবদল করেছে। কেননা এ যুগে রবীন্দ্রনাথ অধিকতর অনুভূতি-নির্ভর। আত্মার লেন-দেনের সময়, মনে মনে কথা কওয়ার সময় কোন প্রকার আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না। চণ্ডীদাসের বেলাতেও তাই হয়েছিল। জ্যোস্না-স্বচ্ছ জলধারার মত তাঁর অন্তরাবেগ সহজ সরল ভাষায় শুচি-শুভ্র হয়ে উঠেছে। সরলতা ছাড়াও পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভাষার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল আধুনিকতা। এ ভাষা প্রায় আধুনিক বাংলা ভাষার প্রান্ত-সীমা স্পর্শ করে গেছে। কোন কোন পদের ভাষা একেবারেই আধুনিক বলে মনে হয়:

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরনে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥

এ ভাষায় ছন্দাবদ্ধ পদাবলীর অন্তর্নিহিত রূপাল্পনা হৃদয়াঙ্গম করতে আমাদের কোনই বেগ পেতে হয় না। অত্যুজ্জ্বল স্পষ্টতায় মূলভাবসহ এ ভাষা আমাদের গহন মনের অন্তঃদ্বার উন্মুক্ত করে হৃদয়লোকে প্রবেশ করে। একটি উদাহরণে আমাদের বক্তব্য অধিকতর স্পষ্ট হবে। পূর্বরাগের নবোন্মেষে শ্রীরাধা ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন—নিবিড় মিলনোন্মাদনায় অপেক্ষমান রাধা বার বার যখন শ্যামোজ্জ্বল কদম্বকাননের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, মানসিক সেই

ব্যালকুতা চণ্ডীদাস সরল ভাষার যাদু-স্পর্শে কী গভীর ভাবেই না সজীব করে তুলেছেন :

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন
কদম্বকাননে চায়॥

ভাষার মূল উদ্দেশ্য যদি হয় রসমণ্ডিত ভাবরাশিকে সহৃদয় পাঠকের মন-দেউলে স্বর্ণ-রাধিকা রূপে প্রতিষ্ঠিত করা তা' হলে চণ্ডীদাসের পদাবলীর এই ভাষা বাংলাকাব্যে অনন্যসুন্দর এবং দ্বিতীয়রহিত। এই অনাড়ম্বর সরল ভাষার ভাব-বহন ক্ষমতা যে কি গভীর এবং ব্যাপক তা' একমাত্র পদাবলীর পাঠকই জানেন। অবশ্য মাঝে মাঝে ভাষার দুর্বলতাও লক্ষিত হয় এবং কোন কোন স্থলে দুর্বোধ্যও মনে হয়। কিন্তু এখন ভাষা প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদে বিরল-দৃষ্ট। পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন চণ্ডীদাসের ভাষা এমন আধুনিক-গন্ধী ছিল না। জনপ্রিয় পদাবলীর ভাষা যুগে যুগে লোকমুখে রূপান্তরিত হ'তে হ'ত বর্তমান অবস্থায় এসে পড়েছে।
চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষায় যে অননুকরণীয় সারল্য এবং প্রায় আধুনিকতার স্বরূপ আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় কিন্তু তা' অনুপস্থিত। এ কাব্যে বাংলা ভাষার গঠমান যুগের ছাপ সুস্পষ্ট। সুদূর অতীতকালে বাংলা ভাষার আদিম রূপটিকে এই কৃষ্ণকীর্তন কাব্য বিংশ শতাব্দীর জনসমক্ষে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। প্রাচীনতার লক্ষণ এ কাব্যের সর্বাঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে প্রথম দর্শনে এ কাব্যকে হিন্দী বা অন্যকোন ভাষায় রচিত বলে মনে হয়। বাস্তবিক যদি কেউ 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু' স্থলে 'যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ।' আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেন তা হলে শেষোক্ত ভাষাকে বাংলায় প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র দিতে আমাদের বেশ কুণ্ঠিত হ'তে হয়। আদিম মানবের মধ্যে যেমন একটি বন্যভাব সুস্পষ্ট তেমনি এ ভাষার মধ্যে বন্যভাবাপন্ন অনাবশ্যক আনুনাসিকতার উৎপীড়ন লক্ষিতব্য। এ কাব্যের এই আনুনাসিকতা 'ঁ' (চন্দ্রবিন্দু) সঙ্গীন খোঁচার মত উঁচু হ'য়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন ভ্রূকুটি করে। কোন তীরন্দাজ যেন ধনুকের ছিলায় শর-যোজনা করে

নিক্ষেপের জন্যে অপেক্ষমান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে :

ক ॥ এ কাব্যে প্রাকৃত ও তদ্ভব শব্দসংখ্যাই অধিক।

খ ॥ বর্ণবিন্যাস প্রণালী বিচিত্র।

গ ॥ 'ণ'-কার 'স'-কারের প্রয়োগ শৌরসিনী ভাষার প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ ॥ "ঁ" চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ অজস্র। চন্দ্রবিন্দু আনুনাসিক উচ্চারণের দ্যোতক। এবং আনুনাসিক উচ্চারণের প্রাচুর্য প্রাকৃত ভাষা সমূহের অন্যতম বিশেষত্ব।

ঙ ॥ অনার্য দ্রাবিড় এবং ফারসী-আরবী মূলক অনেকগুলি শব্দও কাব্যে আছে।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীন ভাষার অভ্যন্তরে যে আধুনিকতার লক্ষণ নেই তা' নয়—মাঝে মাঝে এ গ্রন্থের ভাষাকে একেবারে আধুনিক বলেই মনে হয় :

> 'মনের উল্লাসে দেখি তোর পয়োভার।
> মজি গেল মোর নয়ন চকোর ॥'
> 'দৃঢ় করে ভুজ যুগে ধরি কৈল আলিঙ্গন।'
> 'হৃদয়ের মাঝে তোর কেন নাহি হার।'
> 'সব নারীজন মোর করিল সম্মানে।'

উল্লিখিত পদগুলির ভাষাকে প্রাচীনতার গণ্ডীতে ফেল্‌বে কে? অন্ততঃ প্রাচীনতার বিশেষ কোন লক্ষণ এই পদগুলির অঙ্গভূষণ হ'য়ে জড়িয়ে নেই। স্বর্গীয় দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভূমিকায় এমনি কতকগুলি পদ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে প্রাচীন কালের অঙ্গীভূত করার কোন হেতু নেই। "ইহা প্রাচীনতার ছাপমারা ভাষার সহিত আধুনিক ভাষার সংমিশ্রণে অর্দ্ধসিদ্ধ খিচুড়ি।"

কিন্তু এই মত সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না। সুপ্রাচীন বিশাল কাব্যারণ্যে কোথাও যদি যৎসামান্য আধুনিকতার আভাস এসে থাকে সেই ক্ষীণসূত্র ধরে এ কাব্যকে আধুনিক কালের সৃষ্টি বলে ঘোষণা করার পিছনে সার্থক ও বলিষ্ঠ যুক্তি নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্য বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য—"শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শব্দের বানান

একটু বিশেষ রকমের, এবং ইহার ভাষা প্রাচীন বলিয়া কিছু দুর্বোধ্য বটে কিন্তু অবোধ্য নহে। আনুনাসিকের সঙ্গীন খোঁচা এড়াইয়া, মহাপ্রাণ বর্ণের কণ্টক মাড়াইয়া, অপরিচিত শব্দের লতাগুল্ম ছাড়াইয়া যিনি এই কাব্য কুঞ্জে একবার প্রবেশলাভ করিবেন, তিনি কৃতার্থ হইবেন।" কাব্য-কুঞ্জে প্রবেশ করতে পারলে কোন কথা নেই, কিন্তু না পারলে পাঠককে বাইরে দাঁড়িয়ে ' ̐ ' চন্দ্রবিন্দুর সঙ্গীন খোঁচা খেয়ে, আহ্মে-তোহ্মে-কাহ্নের শরে বিদ্ধ হয়ে অর্দ্ধমৃত হ'তে হবে।

খ॥ উভয় গ্রন্থের প্রকাশ ভংগীর বৈচিত্র্য :

কেবল ভাষায় নয় রচনাবৈশিষ্ট্য, প্রকাশ-ভংগী ইত্যাদিতেও উভয় কাব্যের মধ্যে এক দুরতিক্রমী ব্যবধান রচিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপস্থাপন-রীতি একান্ত স্থূল, অন্তরে সুতীব্র আলোড়ন তোলার মত উপাদান তাতে বিশেষ নেই, কিন্তু পদাবলীর উপস্থাপনা রীতি সূক্ষ্ম, ব্যঞ্জনাধর্মী এবং তা' অন্তরের গভীরতম তলদেশ স্পর্শ করে। কৃষ্ণকীর্তন পয়ার, ত্রিপদীতে রচিত, পদাবলীও তাই— কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনে বহু পয়ারে অন্ত্যাক্ষরে মিল নেই। প্রায়ই দুই ছত্রের অক্ষর সমতা বা তাল সমতা রক্ষিত হয়নি। চর্যাপদেও ঠিক অনুরূপ ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। এদিক দিয়ে কৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ দুর্বল। উভয়কাব্য গীতোদ্দেশ্যে রচিত কিন্তু পদাবলীর অঙ্গ হ'তে যে সুরঝংকার স্বতঃ বিরামহীন ভাবে উৎসারিত হ'য়েছে কৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ-বন্ধন হ'তে তার কণা মাত্রও শ্রুত হয় না।

উভয় কাব্যের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে উপমার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় কিন্তু এই উপমা প্রয়োগে পদাবলীতে যে অপূর্ব নৈপুণ্য ও অনন্য-ব্যঞ্জনা ফুটেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তার বড় একটা আভাস পাওয়া যায় না। কাব্যের উপমা স্থূলধর্মী—বাইরের আবরণ ভেদ করে অন্তঃস্থলে রসের আবরণ উন্মোচন করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু পদাবলীর উপমা-প্রয়োগের ব্যঞ্জনা শ্যাম-নাম-শ্রবণের মত কাণের ভিতর দিয়ে পাঠকের মর্মে প্রবেশ ক'রে এক অপূর্ব সৌন্দর্য-লোকের আবরণ উন্মোচন করে দেয়। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মাঝে মাঝে কয়েকটি উপমা রসোত্তীর্ণ হ'য়েছে। কৃষ্ণকে মেঘ ও রাধাকে বিজুলী কল্পনা করে কবি লিখেছেন :

কাহ্নের উপরে শোভে সুন্দরী গোআলী।
নীল মেঘে যেহ্ন পড়য়ে বিজুলী ॥

অথবা রাধার বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর রূপলাবণ্যের যে বৃদ্ধি ঘটেছে সূর্য এবং মেঘকে উপমা হিসেবে গ্রহণ করে কবি কি সুন্দরভাবেই না তা' জীবন্ত করে তুলেছেন :

কেশপাশে শোভে তার সুন্দর সিন্দুর।
সজল জলদে যেন উইল নব সূর ॥
কনক কমল রুচি বিমল বদনে ॥
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাহিনীমূলক কাব্য কিন্তু পদাবলী একান্তই গীতিধর্মী। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে শুরু করে রাধার বিরহ পর্যন্ত একটী অখণ্ড কাহিনী-স্রোত গড়ে উঠেছে কৃষ্ণকীর্তনে। এ কাব্যে কাহিনীই প্রধান। অবশ্য এই কাহিনী বর্ণনার মাঝে মাঝে দু' একটি পদে গীতিকবিতার পদধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু পদাবলীতে কোন নির্দিষ্ট কাহিনী নেই। প্রতিটি পদ স্বয়ংসম্পূর্ণ গীতিকবিতার জমাট রূপায়ণ। আর কবি কাহিনীর আকারেও সেগুলি লেখেননি। পূর্বরাগের পদরচনার পর ভাবসম্মিলনের পদরচনাও বিচিত্র নয়। মোট কথা আনুপূর্বিক কোন সংগতি রেখে পদাবলী রচিত হয়নি। কবি ভাবের জোয়ার কল্লোলে গা ভাসিয়ে বিপুল-বিস্তারী সুনীল জলধি হ'তে তুলে এনেছেন অতল-সুপ্ত-শুক্তি। অঙ্কন করেছেন গহনচারী মনের স্মৃতি-আল্পনা।

গ ॥ উভয় গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণ :

আমরা পূর্বে বার বার উল্লেখ করেছি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী এই উভয়বিধ রচনায় বহিরঙ্গ ছাড়াও অন্তরঙ্গে এবং ভাবজগতে এক সুস্পষ্ট ও গভীর ব্যবধান রচিত হয়েছে। এইখানে উভয় কাব্য আকাশ-পাতালের মত অতল-স্পর্শী ব্যবধানে পৃথক হ'য়ে পড়েছে। পদাবলীতে আছে অসীম-লোকের ইংগিত—সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ধুলিময় মাটির কলঙ্ক-রেখা—ব্যঞ্জনাহীন সীমিত স্থূলকাব্য। এই মূল পার্থক্যের মত উভয় কাব্যের চরিত্রগুলিও সূক্ষ্ম এবং স্থূল। প্রথম হ'তেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের যে চরিত্রের সাথে আমাদের সাক্ষাত হয় তা' একান্ত গ্রাম্য। চরিত্র বলে কোন জিনিষ তাঁর নেই—কামনাই তাঁর কাছে বড়, দেহ-ভোগ-লিপ্সাই

তাঁর কাছে প্রধান। কিন্তু পদাবলীর কৃষ্ণ মহৎ, মহান—ঐশ্বর্য এবং মাধুর্যে ভাস্বর। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ পাড়াগেঁয়ে—অকপট লালসার দাস। পক্ষান্তরে পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণ সমুন্নত চরিত্রের অধিকারী—প্রেমের উচ্চ-গ্রামে তাঁর সুর বাঁধা।

পদাবলীতে কোথাও শ্রীরাধা পূর্বরাগহীনা নন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখি রাধিকা পূর্বরাগ হীনা—পূর্বরাগে পাগল হ'য়ে উঠেছেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এ পূর্বরাগও পদাবলীর পূর্বরাগের পাশে একান্ত নিষ্প্রভ—ম্লান। পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ দৈহিক স্থূলতাকে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয়-লোকে প্রবেশ করেছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরবেদনা, হৃদয়াকুলতা নিখিল পাঠকের অন্তরবীণায় সুর-মূর্চ্ছনা জাগিয়ে তোলে। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনেও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ দৈহিক আকর্ষণকে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয়লোকে পৌঁছুতে পারেনি। একান্ত দৈহিক স্থূলতার মধ্যে, নিখিল মানবের আদিম রিপুর মধ্যে, এ পূর্বরাগ গুম্‌রে মরেছে।

শ্রীরাধিকার দোসরহীন দেহকান্তি ও রূপলাবণ্য দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছেন। পদাবলীতে এই ব্যাকুল আত্মবিস্মৃত শ্রীকৃষ্ণকে বল্‌তে শুনি:

'সখা, রূপ কে চাহিতে পারে!

জুড়ায় কেবল নয়নযুগল চিনিতে নারিনু কে।'

শ্রীকৃষ্ণের এই হৃদয়ভেদী ব্যাকুল অন্তরার্তি আমাদের সমগ্র চেতনাকে একান্ত-ভাবে স্পর্শ করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি তাঁর অন্তর্দাহের তীব্রতায় আমাদিগকে দোলায়িত করতে পারে না। যখন শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনি:

'তোর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনী
ধরিবাক না পারো পরানী'.........

কিংবা:

'রাধার বচন না পাইলেঁ বড়াই
কাহ্নাঞির প্রাণ জাএ'।.........

তখন মাধুর্য-হীন অক্ষম প্রেমিকের স্থূল আর্তি শুনে আমরা হেসে উঠি। কামান্ধ কৃষ্ণ এগার বৎসর বয়স্কা রাধার কাছে যখন বার বৃছরের দান চান তখন স্থূল প্রেমের অভিনব প্রকাশ ঘটে। কিন্তু কামান্ধ কৃষ্ণের উলঙ্গ মূর্তি

প্রকাশিত হ'য়েছে যখন মাতুলানী-সম্বন্ধ না মেনে তিনি রাধা-বিহারে উদ্যত। কৃষ্ণের বলপূর্বক আক্রমণ এবং কু-আচরণের বিরুদ্ধে রাধা বলেন: 'তোহ্মে ভাগিনা আহ্মে তোহ্মার মাউলানী।' কিন্তু কে শোনে কার কথা। কামান্ধ ভাগিনা 'মাউলানী'র সম্পর্ক উড়িয়ে দিয়ে মামীকে শ্যালীকা বলে সম্বোধন করেন এবং তারপরেই প্রকাশ করেন তাঁর কুৎসিত কামনা:

'না বোল সম্বন্ধ রাধা আহ্মার আগে।
রতির উপসন্ন আহ্মে তোর ভাগে॥'

এই অধম কৃষ্ণ-চরিত্রে আধ্যাত্মিকতা খুঁজতে যাব কোন্ সাহসে!

কলঙ্কময় কৃষ্ণের চারিত্রিক দৈন্য সর্বাপেক্ষা প্রকট হয়ে উঠেছে যখন প্রেম-ভিক্ষু হয়ে তিনি রাধার ভারী সাজেন। ভার বহন না করলে রাধার সাথে মিলন সম্ভব নয় অতএব তিনি ভারী সাজেন, মাথায় ছত্র না ধরলে মিলন সুদূর পরাহত অতএব তিনি ছত্র ধরতে রাজী হন। দেহ ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থের সম্ভাবনায় কৃষ্ণ পারেন না এমন কাজ পৃথিবীতে নেই। ভগবানের অবতার কৃষ্ণের এ কী দৈন্য দশা! পদাবলীর মাধুর্যময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'ভূখা ভগবানে' পরিণত হয়েছেন।

পদাবলী আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ চরিত্রে আর একটি মূল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পদাবলীর কোথায়ও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক রূপের বর্ণনা নেই—পদাবলীর ভগবান মাধুর্যময়, নিকুঞ্জ-বিহারী। এতে তাঁর প্রেমিক সত্তার অত্যুজ্জ্বল রূপায়ণ ঘটেছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য বর্ণনা প্রকট হয়ে উঠেছে। রাধিকাকে আপন ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট করার জন্যে কৃষ্ণ স্বায় ঐশ্বর্যময় রূপের বর্ণনা দিয়েছেন: 'আহ্মে দেব সংসারের সার।' আপন গুণগান এই উচ্চকণ্ঠ-প্রচারে 'প্রেমিক রূপে তাঁর যে রসসত্তাটি তা বারংবার ম্লান হয়ে গেছে। এই সরব ঘোষণা কামান্ধ কৃষ্ণের কলুষিত চরিত্রে আর এক পোঁচ তুলির আঁচড় টেনে দিয়েছে।

ঘ॥ উভয় গ্রন্থে রাধার চরিত্র এবং আধ্যাত্মিকতা:

কৃষ্ণচরিত্রের মত উভয় গ্রন্থের রাধা-চরিত্রেও অপরিসীম ব্যবধান রচিত হয়েছে। পদাবলীর রাধা আত্মবিস্মৃত নবানুরাগিনী মুগ্ধা কিশোরী—তাঁর এই আত্ম-বিস্মৃত মুগ্ধ ভাবটি' পদাবলীর কবির হৃদয়াতিরেক কল্পনা-ঐশ্বর্যে অপূর্ব বর্ণ-গরিমায় দুষ্প্রাপ্য' মনোহর হয়ে উঠেছে। এ রাধার অন্তর্বেদনা, এ রাধার

হৃদয় ব্যাকুলতা, এ রাধার মিলনোন্মুখ করুণ কামনা যেন দুঃসহ অন্তর্ভেদী প্রেম-বাণের মত আমাদের গহন মনকে বিদীর্ণ করে যায়। এ রাধা কৃষ্ণগত-প্রাণা, এ রাধা পরিণত নায়িকা। কৈশোর-যৌবনের মিলন-ভূমির কল্পনা-রঙীন, কামনা-মদির ব্যাকুল-বিহ্বল দিনগুলি পিছনে ফেলে এ রাধা এখন 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত' হয়ে উঠেছে। সেই প্রেম-বিহ্বল দিনগুলির কোন চিহ্নই আর চলমান দিনগুলিতে ফুটে ওঠে না। পদাবলীর রাধা তাই 'দিক নেহারিতে 'পুলকে আকুল' হয়ে 'সব শ্যামময়' দেখেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কৃষ্ণগতপ্রাণা নন—বরং কৃষ্ণকে পদাঘাতে দূরে সরিয়ে দেন। শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের ভাষায়, "পদাবলীতে আমরা যে রাধার সহিত পরিচিত এ সে নহে।...এ রাধা দুরন্ত বালিকা, অনভিজ্ঞা কিশোরী, গর্বিতা যুবতী। কৃষ্ণের দেবত্বে ইহার বিশ্বাস নাই, পরকীয়া প্রেমের মহত্ত্বে এ সন্দিগ্ধা, এ হাসিয়া রাগিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া মারিয়া ধরিয়া ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া কথার মুখে মুখে তীব্র শ্লেষ নিক্ষেপ করিয়া সমস্তক্ষণ পাঠকের মর্মকে টানিয়া রাখে।" পদাবলীর রাধা পরমধন কৃষ্ণের জন্য নিজের কুলধর্ম বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁরই জন্যই তিনি রাঙাবাস পরিধান করে যৌবনে যোগিনী সেজেছেন, বিরল-রূপ-মনোহর কৃষ্ণের অফুরন্ত শ্যামল যৌবনের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধা। তাইতো কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে তাঁর দেহমন অবশ হয়েছে এবং যে কৃষ্ণনাম করেছেন তিনি তাঁর পদযুগল জড়িয়ে ধরেছেন : 'যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।' কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুরন্ত বালিকা বড় রূঢ়। কৃষ্ণের নাম শ্রবণে বক্তার পদযুগল জড়িয়ে ধরা তো দূরের কথা—বাচনিক বজ্রশেল নিক্ষেপ করে দূর পথে তাড়িয়ে দেন। বড়াইর কুঞ্চিত গণ্ডে তাইতো পড়ছে চপেটাঘাত। এখানেই শেষ নয়—কৃষ্ণকে 'গরু-রাখোআল' বলে ধিক্কার দিয়েছেন :

ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দর ঘরের গরু রাখোআল
তা সনে কি মোর নেহা ॥

কৃষ্ণের মাধুর্য, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য কোন কিছুই তাঁকে কৃষ্ণেন্দ্রিয় আকর্ষণে আকৃষ্ট করতে পারেনি। বড়াই যখন কৃষ্ণের অপরিসীম ঐশ্বর্যের স্বরূপ তুলে ধরে বলেন

যে কৃষ্ণের সাথে প্রেম করলে স্বর্গলাভ অনিবার্য তখন ক্রোধান্ধ রাধার উক্তি এই :

> ধিক জাউ নারীর জীবন দহেঁ পসু তার পতী।
> পরপুরুষের নেহাএ যাহার বিষ্ণুপুরে স্থিতী॥

কৃষ্ণ যখন বলেন যে তিনি স্বয়ং বিষ্ণু, নর-সিংহ মূর্তিতে তিনিই হিরণ্যকশিপু অসুরদ্বয়কে বধ করেছেন ইত্যাদি তখন রাধার উক্তি রীতিমত অপমানকর :

> শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ এড়িআঁ।
> দান সাধ কেহ্নে কাহ্নাঞি পথত বসিআঁ॥

পদাবলীতে রাধার যে অতলস্পর্শী প্রেম চিত্রিত করা হয়েছে মহাসিন্ধুর বিপুল জলোচ্ছ্বাসের দুর্নিবার জোয়ার কল্লোলের ন্যায় সে প্রেমের মর্মমূল হ'তে অবিরাম অধ্যাত্ম-রাগিনীটি বেজে উঠেছে। নায়ক-নায়িকার দেহের রূপ, দেহের সম্বন্ধ, মিলন, বিরহ সকলের ভিতর দিয়ে এমন এক মধুর সুর বেজে উঠেছে যা সকল বাধা, সকল বিরহ, সকল মিলন, সকল সম্ভোগ অতিক্রম করে অজ্ঞাতে স্বর্গদ্বারে এসে উপনীত হয়েছে। পদাবলীর অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা এখানেই। আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিশিষ্টতা তার কামনাযুক্ত সম্ভোগময় কেলি-বিলাস চিত্রনে।

কিন্তু এই সম্ভোগ-চিত্রন বংশী ও বিরহ খণ্ডে অনেকখানি শিথিল হয়ে পড়েছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি পথ নবীন প্রেমালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নির্জন বনভূমির পত্রান্তরালে নাম-না-জানা শুভ্র বনফুলের মত এই কাব্য-কুঞ্জের স্থানে স্থানে [বংশী ও বিরহ খণ্ডের] এমন শিশির-স্নাত নির্মল শুভ্র-যূথিকা ফুটে উঠেছে যা সমগ্র কাব্যখানিকে এক অপূর্ব স্বর্গীয় সৌরভে বিমণ্ডিত করে তুলেছে। এই সৌরভ সকল গলিত গন্ধকে ছাড়িয়ে আপন মাধুরিমা বিস্তার করেছে। এই জীয়ন-কাঠির স্পর্শে সমগ্র কাব্যের মৃত অঙ্গে প্রাণের দুর্নিবার স্পন্দন জেগেছে।

বাণ খণ্ড পর্যন্ত কাব্যটি পবিত্র রুচিবোধের সীমারেখায় প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পায় নি, সর্বত্র কেমন যেন একটা উলঙ্গ গ্রাম্যতা লক্ষণীয়। কিন্তু বংশী খণ্ডের সুরু হ তে এই অমার্জিত গ্রাম্যতা বিদূরীত হয়েছে। বংশীর সুমহান সুরতানে কাব্য-দিগন্ত হ'তে সকল জঞ্জাল, সকল অপবিত্রতা দুরীভূত হয়েছে। ভোরের আকাশ ঘিরে পলয়মান অন্ধকারের মত সকল কলুষ কালিমা বংশীর সুর-তরঙ্গে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। রাধা এখন আপন স্বরূপে ক্রম বিকাশ-

মান। বংশীধ্বনি শ্রবণে শুরু হয়েছে উন্মাদিনী রাধার বৃন্দাবন-কুঞ্জে প্রেমাভিসারে ছোটার ব্যাকুল-যাত্রা, 'বেআকুল মনের' বেলাভূমিতে আজ এসেছে স্বর্গীয় প্রেমের নবীন জোয়ার-কল্লোল :

কেনা বাঁশী বাএ বড়াই কালিনী নই কূলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়াই এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।...

এই আকুল শরীর এবং বেআকুল মন নিয়েই রাধার সুরু হ'য়েছে অনির্দিষ্ট অসীমলোকের পথে যাত্রা—এখান হ'তে সুরু হয়েছে পদাবলীর অশ্রুসজল ইতিহাস।

এই পদটি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন, "কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন। সেই বাঁশীর স্বরের নিকট সকল তত্ত্বকথা, সকল শাস্ত্রকথা মিলিয়া যায়।"

যে রাধা একদিন কৃষ্ণকে 'নান্দের ঘরের গরু রাখোআল' বলে উপেক্ষা করেছিল—আজ সেই মহাজনের পদযুগলে আপনাকে সমর্পণের কী ব্যাকুল আর্তি : 'দাসী হঞাঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।'

অলস-বিভোর তন্দ্রানিমগ্ন রাধার নিদ্রার দিন চলে গেছে, এখন এসেছে জাগরণের পালা। নিশিদিন তাঁর মর্মমূলে বসে আছেন কৃষ্ণ, চোখে নিদ্রা নেই :

অহনিশি মো আন না জানো
এ দুখ কহিব কাএ।
কাহ্নের ভাবে চিত্ত বেআকুল
লাজে না মো কান্দো রাএ॥

এই তো পদাবলীর মর্মনিঃসৃত করুণ বিপ্রলম্ভের ধ্বনি। এ রাধিকার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ থেকে এক কণা মলিনতা আবিষ্কার করা দুষ্কর। গোপ বালিকা বলে এ রাধাকে দূরে সরানো অমার্জনীয় অপরাধ, অমার্জিত রুচির প্রশ্ন তোলা এখানে অবান্তর। রূঢ় বালিকা এখন জাগ্রত প্রেম-বোধে শাশ্বত প্রেমিকা। অনভিজ্ঞ কিশোরী এখন প্রৌঢ়া পারাবতী। এই রাধার কণ্ঠে তাইতো আজ শোনা যায় কৃষ্ণ-পদসেবিকা হ'য়ে আত্মসমার্পণের দৃঢ়-কঠিন শপথ-বাণী :

'দাসী হঁআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।' চণ্ডীদাসের 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল' ইত্যাদি যে বহু বিখ্যাত পদটি আজও অগণিত জনগণের চিত্তকে অশ্রুসজল করে তোলে তারই অভিনব প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই পদে :

দহ বুলী ঝাঁপ দিলেঁা সে মোর শুখাইলো ল
মে াঞ নারী বড় অভাগিনী।

কৃষ্ণের জন্যে রাধা ব্যাকুল। বড়াইর নির্দেশে রাধা শয্যা প্রস্তুত ক'রে প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করেন। রাত গভীর হয়—তবুও কৃষ্ণের দেখা নাই। নব মেঘমালার গভীর অন্ধকারে ঢেকে যায় চারদিক, সুরু হয় রাধার করুণ বিলাপ :

মেঘ আন্ধারি আতি ভয়ঙ্কর নিশি
একসরী ঝুরেঁা মো কদমতলে বসি।

এই পদে মিশে আছে গোবিন্দদাসের সেই বহু বিখ্যাত 'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা' পদটির অবিকল সুর-বৈচিত্র্য। রাধা-চিত্তের ব্যাকুল ভাবটি বোধ করি সর্বাপেক্ষা প্রকাশিত হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে। এমন কি এই একটি মাত্র পদে সমগ্র পদাবলীর ভাবধারা ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না :

যে কাহ্নে লাগিআঁ মো আন না চাহিলো,
বড়াই
না মানিলো লঘু গুরুজনে।
হেন মনে পরিহাসে আহ্মা উপেখিআ রোষে
আন লআ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥

যে কৃষ্ণের জন্যে অতন্দ্র রাত্রি জাগরণ অবশেষে সেই কৃষ্ণই তাঁকে ফাঁকি দিয়ে অন্য রমনীকে নিয়ে বৃন্দাবনে বিহার করছেন। রাধার ক্রন্দনে দিন যায়, জাগরণে রাত্রি কাটে। ব্যাকুল মন, অবশেষে চণ্ডীদাসের 'সই কেন বা এমন হৈল'-এর মত বড়াইর কাছে রাধার সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে :

বড়াই গো, কত দুখ কহিব কাঁহিনী।

বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা যে মধুর প্রেমগীতি, ব্যাকুল-শান্ত ধীর-স্থির বিরহ-

অনল-দগ্ধ শ্রীরাধার ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি পাই উদ্ধৃত অংশ সমূহের মাধ্যমে সেই চিত্রই পরিপূর্ণ বিকশিত কমলের মত আমাদের মানস-সরোবরের শান্ত-নীরে ফুটে উঠেছে। এখানে লালসা-কামনার কোন গন্ধ নেই, দেহ ভোগাকাঙ্ক্ষাও এখানে প্রবল নয়—সমুদয় পার্থিব ধ্যান-ধারণার গণ্ডী ছাড়িয়ে আমাদের মন এক সমুন্নত সৌন্দর্যানুভূতির রূপলোকে গিয়ে মিশে যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আধ্যাত্মিকতা এখানেই। রাধিকার এই ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি অঙ্কনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমাপ্তি ঘটেছে—আর পদাবলীর সুরু হয়েছে কৃষ্ণ-প্রিয়া চির-যৌবনা রাধার এই ধ্যান-সমাহিত মূর্তি নিয়েই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যেখানে শুদ্ধ পদাবলী সেখানে তুনিবার, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যেখানে শেষ—পদাবলীর সেখানে সুরু।

॥ বৈষ্ণব পদাবলী ॥

॥ এক ॥

॥ ভূমিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আলোচনার পরিসমাপ্তিতে আমরা ঘোষণা করেছি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যেখানে শেষ, পদাবলীর সেখানে সুরু। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যেখানে স্তব্ধ, পদাবলী সেখানে উদ্বেল। এ মন্তব্যটি কেবল ভাবের ক্রম-বিবর্তনের দিক হ'তেই সার্থক নয়—ভাব ও ভাষা, প্রাণ ও ভংগী, রূপ ও রেখা সকল দিক হ'তেই এ মন্তব্যটির মধ্যে সত্য-সার বিধৃত হ'য়েছে। ভাবের দিক হতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থূল কেলিবিলাস এবং রুচীহীন অশ্লীলতা যেমন ক্রম পরিবর্তিত হ'তে হ'তে সূক্ষ্মতার স্তর অতিক্রম করে স্বর্গীয় সৌরভে পদাবলীর বুকে সঞ্চারিত হ'য়েছে তেমনি ভাষা ও ছন্দ, মন ও ভংগী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থূলতা হ'তে সরে এসে পদাবলীর বুকে বলিষ্ঠতর স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্যে আত্মপ্রতিষ্ঠিত। বস্তুতপক্ষে পদাবলীর ভাষা ও ছন্দের সাথে কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও ছন্দের কোন তুলনাই হয় না। এ যেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আকস্মিক যৌবন-সঞ্চার, কৈশোর হ'তে যৌবনের বনে দুর্গম যাত্রা। কৃষ্ণকীর্তনে ভাষার যে দুর্বলতা, ভাবের যে দীনতা লক্ষ্য করেছিলাম পদাবলীর বুকে তাই বিপুল শক্তি-সামর্থে শতধারায় বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। পদাবলী সাহিত্যের এই বলিষ্ঠ ভাব-সম্পদ এবং রূপ-বিশ্লেষণের পূর্বে পদাবলী সাহিত্যের সাথে গীতিকবিতা, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ ধারার মধ্যকার সম্পর্কটি দেখে নিতে চেষ্টা করব।

॥ দুই ॥

॥ পদাবলী ও গীতি কবিতা ॥

পদাবলী-সাহিত্য গীতি কবিতার মর্ম-নির্যাস। এই উভয় রূপ-সৃষ্টিকে সাধারণতঃ আমরা এক এবং অভিন্ন বলে কল্পনা করি। বুদ্ধিদীপ্ত আলাপ-চারণা নয়—হৃদয়বেগবিরল তীক্ষ্ণাগ্র বাণী-বিন্যাস নয়—অনুভূতির অত্যন্ত

গভীরতাই উভয় কাব্যের সূতিকাগার। স্বাদ-বৈচিত্র্য উভয়ের এক, গঠন-রীতিও উভয়ের ভিন্ন নয়। গহন-মনের স্পন্দন-স্পর্শে উভয়ের অন্তরসত্তা স্পন্দমান। একটি ক্ষণোজ্জ্বল মুহূর্ত, একটি ক্ষণ-দীপ্ত ভাব, একটি নিটোল-চিন্তা উভয় কাব্যের অন্তরঙ্গে বেগ সঞ্চার করেছে। সুতরাং স্থূলভাবে গীতি কবিতা এবং পদাবলীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয়না কিন্তু বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে এই উভয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরা পড়ে।

বৈষ্ণব পদাবলীর মূল প্রেরণা এসেছে সমষ্টিগত সম্মিলিত সাধনা এবং গোষ্ঠী-চেতনা-সম্ভূত ঐতিহ্য হ'তে—ব্যক্তিগত অনুভূতির নিবিড়তা হ'তে নয়। এখানে ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং আনন্দ-বেদনা সমষ্টিগত সাধনা ও ঐতিহ্যের অন্তরালে আত্মগোপন করেছে। ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার সুর ম্লান করে দিয়ে সরব হ'য়ে উঠেছে সমষ্টিগত সাধন-ধারার গীতি-মূর্চ্ছনা। কিন্তু আধুনিক গীতি কবিতা ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার বাঙ্ময় প্রকাশ। সমষ্টিগত কোন বাঁধন তাকে শাসন করতে পারে নি। কবির গহনচারী নিভৃত মনের রূপায়নায় গীতি কবিতার ক্ষুদ্রবক্ষ হীরকোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। আত্মানুভূতি এবং ব্যক্তি-মানসের প্রকাশই গীতি কবিতার প্রাণ-সম্পদ। আত্মানুভূতির এই প্রকাশ-স্বাধীনতায় গীতি কবিতা একের হ'য়ে সমষ্টির, সমষ্টির হ'য়ে বিশ্বনিখিলের সামগ্রী হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী সমষ্টি-চেতনার শাসনে শাসিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ব-বিহারী হ'য়ে উঠ্‌তে পারে নি। যখন আমরা শুনি :

> আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
> পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
> আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
> নাই যে ঘুম নয়নে মম,
> দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম
> চাই যে বারে বার।
> পরাণ-সখা, বন্ধু হে আমার॥

তখন আমাদের সমগ্র মন-প্রাণ শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহের পথ বেয়ে পরাণ-সখা বন্ধুর সাথে মিলনের জন্যে নিখিল-ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। স্রষ্টা সৃষ্টির

মাঝে, চিরন্তন ও ক্ষণিকের মাঝে যে অনাদি মধুর সুর-তরঙ্গ বেজে চলেছে অবিরাম—এখানে কবির নিভৃত মনের সংগীত-গুঞ্জনে সেই সুরই বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু পদাবলীর ক্ষেত্রে এ সুর-প্রকাশের পথ বাঁধা, রাধাকৃষ্ণকে ছেড়ে পদাবলীর একতারায় অন্য মীড় রচনা করবে এমন দুঃসাহস বৈষ্ণব-মহাজনদের কোথায়? তাঁদের সুরের গদ বাঁধা, চারণ-ভূমি সীমিত। গণ্ডীর বাইরে গেলেই কুলত্যাগী হ'তে হয়। বীণার স্বরে বিচিত্র পথে তার প্রকাশ ঘটে। গীতি কবিতা তাই কবির নিভৃত মনের গান, ব্যক্তি-ধর্মী মন্ময়তার (Subjectivity) ভাবোদ্বেল প্রকাশ।

ছন্দের দিক দিয়েও গীতি কবিতা এবং পদাবলীর মধ্যে একটি পার্থক্য দেখান যেতে পারে। পদাবলীর ছন্দ পয়ার এবং ত্রিপদী কিন্তু আধুনিক গীতি কবিতার ছন্দ বহু বিচিত্র—কখনো পয়ার, কখনো ত্রিপদী, কখনো চৌপদী, কখানে যাণ্মাত্রিক ছন্দ আবার কখনো বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দাশ্রয়ী। ভাবের দিক দিয়ে যেমন আধুনিক গীতি। কবিতা বহুবিচিত্র তেমনি রূপ ও রসের এলাকায় এর যাতায়াত বহু বিচিত্র স্বর্ণ পথেই।

পদাবলীর ভাষা অপেক্ষা গীতি কবিতার ভাষা অধিকতর সাংকেতিক ধর্মী, ভাববাহী এবং সমৃদ্ধশালী। ভাষার দিক দিয়ে এক রবীন্দ্রনাথের হাতেই গীতিকবিতা যে অলংকার ও সৌন্দর্য-সুষমায় বিভূষিতা হয়েছে সমগ্র পদাবলীতে তার তুলনা মেলে না। অবশ্য পদাবলীর ভাষা-সৌষ্ঠব কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণীয়।

পদাবলী সংগীতের জন্যে রচিত। এদের ভাব-ব্যঞ্জনার অর্ধেক প্রকাশ ঘটে পাঠে আর অর্ধেক মুক্তি পায় সুরে। কিন্তু গীতিকবিতার সাথে সংগীতের এ যোগ নাও থাকতে পারে। গীতি কবিতা রচিত হয় পাঠের জন্যে এবং এটাই এর প্রধান উদ্দেশ্য—পরে অবশ্য গীত হ'তে পারে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে পদাবলী এবং গীতি কবিতা এক নয়—উভয়ের মাঝে ব্যবধান অনেক।

॥ তিন ॥

॥ পদাবলী ও মঙ্গলকাব্য ॥

বৈষ্ণব পদাবলী এবং মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। প্রায় এক হাজার বৎসর ব্যাপী এই কাব্য-শাখা দুইটি বাংলা সাহিত্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ-পথে অনির্বাণ দ্যুতি বিকীর্ণ করেছে। এই আলোকোজ্জ্বল পথেই নেমে এসেছে বাংলা সাহিত্যের অযুত-সম্ভাবনা। কিন্তু বৈষ্ণব এবং মঙ্গল এই উভয় কাব্যধারা সমান্তরাল ভাবে দীর্ঘদিন একই সঙ্গে প্রবাহিত হলেও উভয়কাব্যের প্রান্ত-সীমায় রচিত হয়েছে দুর্ভেদ্যতার সুদৃঢ় প্রাচীর। উভয় কাব্যের অন্তরবীণা হতে বেজে উঠেছে দুই স্বতন্ত্র রাগিনা। উভয় কাব্যের বহিরঙ্গে এবং অন্তরঙ্গে এই রাগিনী-পার্থক্য সুপ্রকট হয়ে উঠেছে।

(ক) বহিরঙ্গের দিক দিয়ে প্রথমেই যে পার্থক্য আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে তা' উভয়ের গঠন-রীতি। বৈষ্ণব পদাবলী গীতি মূলক খণ্ড খণ্ড কবিতাবলীর সমষ্টি। অসংখ্য বনফুলের সমবায়ে গড়া সুরভি-মাল্যের মত খণ্ড খণ্ড গীতির সমবায়ে সৃষ্ট বৈষ্ণবপদাবলী কেবল অপূর্বই নয় দ্বিতীয়রহিত। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে খণ্ডতার কোন স্থান নেই—একাব্য আখ্যানমূলক। আদ্যন্ত একই ঘটনার বিরামহীন প্রবাহ—সে প্রবাহ কখনো শিথিল কখনো বেগবান।

খ ॥ অবশ্য বহিরঙ্গের এই পার্থক্য উভয় কাব্যের অন্তরনিহিত ভাব-সম্পদের জন্যেই গড়ে উঠেছে। 'বৈষ্ণব সাধকগণ সখ্য-বাৎসল্য-মধুর প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির কাব্যপ্রকাশে সূক্ষ্ম ঝংকার তোলার জন্যে গীতিকাব্যের আশ্রয় নিয়েছেন, আবেগ-প্রধান অন্তর্মুখীন গীতিকাব্যের ভংগীটি তাঁদের উদ্দেশ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। মঙ্গলকবিরা দেবীর শক্তিকে, তাঁর ভীষণতাকে, তাঁর কঠোরতাকে প্রকাশ করেছেন, তাঁর শক্তির মহিমা বর্ণনা করে শ্রোতার চিত্তে ভক্তি ও শ্রদ্ধা আনবার চেষ্টা করেছেন, দেবীর প্রতি অনুগত থাক্‌লে যে সুখ সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং তাঁকে উপেক্ষা করলে যে দুঃখ বেদনা বিপৎপাত ও ভয়ঙ্করতার সম্মুখীন হ'তে হয় তা' বিভিন্ন কাহিনী ও উপাখ্যানের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাতে গিয়েছেন; তাই গীতিকাব্য অপেক্ষা বর্ণনামূলক আখ্যানকাব্যের ভংগীটি তাঁদের কাব্যপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল।' এ জন্যেই বৈষ্ণবপদাবলী বরাবরই কবি-মানসের

চিন্তাভাবনার আলাপনায় সমৃদ্ধ হয়ে গীতিকবিতার আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে আর মঙ্গলকাব্যসমূহ আখ্যানধর্মী হয়ে বিপুলবিস্তারী কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে মঙ্গল-দেব-দেবীর শক্তি-সামর্থে প্রচণ্ডতা।

গ। উভয়কাব্যের অন্তরনিহিত এই ভাব পার্থক্যের জন্যে বৈষ্ণব কবিতা হ'য়েছে আত্মকেন্দ্রিক আর মঙ্গলকাব্য হ'য়েছে বস্তুকেন্দ্রিক। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বৈষ্ণবপদাবলী গীতিকা-ধর্মী। কবির সৃষ্টিতে আপন-অলক্ষ্যে আপন মনের মাধুরী না মিশলে তার অভ্যন্তর হ'তে কখনই গীতিকবিতার কোমল সুরটি ধ্বনিত হয় না। কল্পন-প্রবণ গীতিকবিতায় বস্তুর স্থান কোথায়? পদাবলীর মন্ময় কল্পনাবেগে বস্তুধর্মিতা স্থানচ্যুত। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে ব্যক্তিগত কল্পনার কেলি-বিলাসের স্থান নেই—একের পর এক ঘটনা-সংঘাতে কল্পনার ইন্দ্রজাল টুটে গেছে—অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বস্তু-ধর্মের প্রাণাবেগ। বস্তুতপক্ষে ঘটনা-সংঘাতময় কাহিনা-কাব্যে কল্পনার অবসর খুবই কম। পদাবলী কল্পনা-প্রবণ গীতি-ধর্মী হওয়ায় ভগবানের লীলা-মাধুর্য বহির্বিশ্ব হ'তে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে অন্তরলোকে—আপন মনের স্বর্ণ-দেউলে তাই এ কাব্যের স্থান। আর মঙ্গলকাব্য কাহিনী-মূলক আখ্যান ধর্মী হওয়ায় এ কাব্যের অন্তঃসত্তা গণ্ডী ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়েছে বস্তু-পুঞ্জে, বহির্বিশ্বই এ কাব্যের সঞ্চারণ ভূমি।

ঘ॥ ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কের মাঝেও উভয় কাব্যে রচিত হয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। মঙ্গলকাব্যে ভক্ত ও ভগবান, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্ক কামনা-শূন্য নয়—সকাম। মঙ্গল-দেব-দেবীগণ চেয়েছেন ভক্তের মাধ্যমে নিখিল বিশ্বে আপন-পূজা-প্রচার, আপনার অটল প্রতিষ্ঠা আর ভক্তগণ চেয়েছেন আরাধ্য দেব-দেবীর কাছে অসীম শক্তি-সামর্থ, অজস্র ধন-ঐশ্বর্য। এখানে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যকার সম্পর্ক রসি-নৃত্যের (rope-dance) মত সর্বদা সন্দেহাকুল—প্রীতি ও মিলনের আকর্ষণে উভয়ে নিবিড় হতে পারেন নি। আন্তরিকতা ও স্নেহনিষ্ঠার পরিবর্তে উচ্চশির হয়েছে ভয়াল হিংস্রতা এবং স্বার্থসিদ্ধির কুৎসিত কামনা। প্রয়োজনবোধ একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন, প্রয়োগ করেছেন আপন শক্তি ও সামর্থ। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে সম্পর্ক দেখি তা' কামনার দ্বারা কলুসিত নয়, প্রীতি ও স্নেহের বর্ষণে তা' প্রেমসিক্ত। উপাস্ত

ও উপাসকের মাঝে কোন ব্যবধান নেই—গভীর হৃদয়নৈকট্যে উভয়ে নিবিড় ঐকান্তিকায় এক হ'য়ে মিলেছে। পূজা পাওয়ার জন্যে এখানে ভগবানকে কোন দিনই ভক্তের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করতে হয়নি। ভালবাসার আকর্ষণে, প্রেমের দুর্জয় টানে উভয়ের মধ্যবর্তী বিভেদ-প্রচার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। তাই এ কাব্যেও ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক নিষ্কাম, বিষয়বুদ্ধিশূণ্য এবং প্রেমোজ্জ্বল।

॥ ঙ ॥ বৈষ্ণব এবং মঙ্গল উভয় কাব্যই সাম্প্রদায়িক তবে মঙ্গলকাব্যে এই সাম্প্রদায়িকতার সুর অধিকতর প্রকট। বৈষ্ণবপদাবলী সাম্প্রদায়িক হলেও তার অন্তর্নিহিত ভাব সত্যটি বিশ্বজনীন—কিন্তু মঙ্গলকাব্য একান্তভাবেই সাম্প্রদায়িক। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাই সত্যই মন্তব্য করেছেন : "খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ একপ্রকার সাম্প্রদায়িক (Sectarian) সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।" বস্তুতঃ প্রাথমিক যুগের মঙ্গলকাব্যগুলি ছিল সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ততম প্রকাশ।

চ ॥ উপরে আমরা মঙ্গল কাব্যের মধ্যকার যে সাম্প্রদায়িকতা ও ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধ নির্ণয় করলাম তা' অবশ্য দীর্ঘদিন রক্ষিত হয় নি। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভাষাতেই বলি, "এই সকল লৌকিক দেবতা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বেশী দিন রক্ষা করিতে পারেন নাই। কারণ এই দেশে এই সকল সংকীর্ণতা মূলক সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের উপর দিয়া বৈষ্ণবসাহিত্যের কূলপ্লাবনী বন্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে এই সমাজের প্রায় সমগ্র সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের বৈষম্যের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে।" এই বৈষ্ণব-কূল-প্লাবনী বন্যাই হল চৈতন্য-সংস্কৃতি। চৈতন্যদেব আজীবন ব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এর ফলে বাংলাদেশ হ'তে সাম্প্রদায়িকতা প্রায় তিরোহিত হয়ে উঠেছিল। মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও এসেছিল সেই সংগ্রামের জোয়ার। তাই চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব এবং মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটি নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। শ্রদ্ধেয় ভূদেব চৌধুরীর ভাষায় "বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী চৈতন্য সংস্কৃতির আত্মলীন শৈল্পিক প্রকাশ—(Subjetive representation) আর এই যুগের মঙ্গলকাব্য একই সংস্কৃতির বস্তু লীন অভিব্যক্তি,—objective representation."

ছ॥ ভাষা এবং প্রকাশভংগীর দিক দিয়েও উভয় কাব্যের মধ্যে সুগভীর পার্থক্য বিরাজমান। বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ পদকর্তাই সুপণ্ডিত এবং রসিক। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রাদির সাথে তাঁরা একান্তভাবে পরিচিত।" তাই পদাবলীর ভাষা যেমন উপমা-অলংকার মণ্ডিত—ছন্দও তেমনি বৈচিত্র্যময়। এ কাব্যে দুর্বল অংশ বড় কম। প্রতিটি পদই প্রায় শিল্প সুষম এবং হীরকোজ্জ্বল—কুন্দে যেন নিরমান। পক্ষান্তরে মঙ্গলকাব্যের কবিগণের অনেকেই সুশিক্ষিত ছিলেন না—অলংকার শাস্ত্রাদির সঙ্গেও হয় তো তাঁদের ঐকান্তিক যোগ ছিল না। তাই বৈষ্ণব পদাবলীতে যে শিল্প নৈপুণ্য এবং প্রকাশ বৈচিত্র্য দেখি মঙ্গলকাব্য সমূহে তার শোচনীয় অভাব পরিলক্ষিত হয়।

জ॥ এই শৈল্পিক-প্রকাশের দিক বাদ দিলেও বৈষ্ণপদাবলী মঙ্গলকাব্যাপেক্ষা অধিকতর সজীব এবং প্রাণবন্ত। পদাবলীর কোমল-মধুর সংগীত লহরী আমাদিগকে কেবল মুগ্ধ করে না সমগ্র অন্তর লুট করে নয়। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক মঙ্গলকাব্যকে বলেছেন বাংলা মাটির সম্পদ (Product of the soil)—আমরা বৈষ্ণবপদাবলীকে বলতে পারি নিখিল বাংলার প্রাণ স্পন্দন (spirit of the Country),

॥ চার ॥

॥ পদাবলী : প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর ॥

ঘনশ্যাম-সবুজ বাংলার বুকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা। জড়গ্রস্থ বাঙালীর আত্মোপলব্ধিতে, মোহগ্রস্ত বাঙালীর মোহ নির্মুক্তিতে, এমন কী তার সুপ্ত মনীষা এবং লুপ্তপ্রায় শিথিল অধ্যাত্ম চেতনা-জাগরণের মধ্যে মহাপ্রভুর লোকোত্তর চরিত্র-মহিমা এবং দিব্য জীবনোন্মাদনা অপরিসীম বেগ সঞ্চার করেছিল। লৌকিক জীবন-যাত্রায়, ধর্মে, দর্শনে, সাহিত্যে - জীবনের সর্বত্র এই বেগ কূল-প্লাবী হয়ে উঠেছিল। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষীণ, সাম্প্রদায়িক, একান্ত দেবনির্ভর শাখা এই মহান মনীষার জীয়ন-কাঠির স্পর্শে হয়ে উঠেছিল একান্ত সজীব, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। আপন-জীবন মাহাত্ম্য দিয়ে দৈবীসত্তাকে মানবীয় সত্যের মাধ্যমে উপলব্ধি করার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর আজীবন ব্যাপী-সাধনধারার মর্মবাণীটিই নিহিত রয়েছে মানবকে

দেবায়িত এবং দেবতাকে মানবায়িত করে 'দেবে-মানবে' একাকার করার মধ্যে। পদাবলী সাহিত্যের মধ্যেও তাঁর আজীবন আচারিত এই বাণীটি সুন্দররূপে বিধৃত হ'য়েছে।

ক॥ প্রাক-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে প্রধানতঃ একটি সত্তা অন্তরাল হ'তে তাতে বেগ সঞ্চার করেছে। শ্রদ্ধেয় ভূদেব চৌধুরীর ভাষায় "চৈতন্য পূর্ববর্ত্তী বৈষ্ণবপদসাহিত্যের প্রেম-রচনায় শিল্প-চিত্তের একটা তদ্গত আন্তরিকতার পরিচয় নিবিড়,—এই ব্যক্তিগত প্রেম-তন্ময়তাই জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদ-সাহিত্যের মূলীভূত সত্য। চৈতন্য-পূর্ববর্ত্তী যুগে যে প্রেম-সত্য ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে মাত্র গুহায়িত হয়েছিল,—ব্যক্তিগত সীমাতিক্রমী উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য ছাড়া যার কোন দ্বিতীয় নিয়ামক ছিল না—চৈতন্য-জীবনের সাধনা এবং প্রচারের ফলে তাই একটা বৃহত্তর ধর্মগত উপলব্ধির পটভূমিকায় 'সর্বজনীন' যদি না'ও হয়, তবু বহুজনীন রূপপরিগ্রহ করে।" এখন আর প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবিদের মত কল্পনার সাগরে অবগাহন করে ব্যক্তিগত সীমাতিক্রমী আবেগ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণ প্রেমাঙ্কনের কোন প্রয়োজন রইলো না—এখন রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্য জীবনের আলোকচ্ছটায় রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব বাস্তবরূপে জীবন্ত হয়ে উঠলো। কল্পনাশ্রয়ী প্রেম-ব্যাকুল শ্রীমতীর স্বরূপ মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গৌরকান্তির মধ্যেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলেন। তাই চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের দৃষ্টিতে :

মহা ভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্ত'-শিরোমণি॥

এই 'মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী'র অন্তরালেই ভগবানের আত্মোদ্‌ঘাটন। মানুষ এখানে দেবধর্মী হয়ে উঠেছে, মানুষের মধ্যেই দেবতার লীলামাধুরীর অনন্ত প্রকাশ ঘটেছে। তাইতো গোবিন্দদাসের কণ্ঠে শুনি :

আবেশ সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া॥

এ রাধার অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে মহাপ্রভুর 'আবেশ মূরতি।'

খ॥ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ব্যক্তিগত সীমাতিক্রমী আবেগ উচ্ছ্বাসই ছিল চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবিদের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে

চৈতন্য-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার তীব্রতায় পূর্বের আবেগ-উচ্ছ্বাস মন্দীভূত হয়ে উঠলো।

গ ॥ চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে বৈষ্ণব ধর্মের গোষ্ঠী-চেতনার যে কথা বলা হয়ে থাকে তা আংশিক সত্য—তখন গোষ্ঠী-চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে নি। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর একক জীবন-সাধনায় কবির ব্যক্তিত্ব-সঞ্জাত সৃষ্টি পরিপূর্ণ রূপে গোষ্ঠীর সাহিত্যে পরিণত হলো। বস্তুতঃ সর্ববিভেদ সমন্বয়কারী মহাপ্রভুর পর হতেই বৈষ্ণব-ধর্মে গোষ্ঠী-চেতনা সুস্পষ্টরূপ লাভ করে—এবং চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-সাহিত্য সেই গোষ্ঠী-চেতনার অনবদ্য-প্রকাশ।

ঘ ॥ চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীর গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরচন্দ্রিকানুসারী রাধাকৃষ্ণ লীলা-কীর্তন প্রাক্-চৈতন্যযুগের পদাবলী সাহিত্য হ'তে এই যুগের পদাবলী সাহিত্যের একটি গভীর পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। গৌরচন্দ্রিকা পদ ছাড়া যে চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী রচিত হ'তে পারে এমন কথা কল্পনাই করা যায় না। সুরধনী-তীরে গৌরাঙ্গ-রূপের যে বর্ণনা বাসুঘোষের তুলিকায় অঙ্কিত হ'য়েছে তা' এই :

একদিন ঘাটে জলে গিয়াছিলাম
কিরূপ দেখিনু গোরা।
কনক কষিল, অঙ্গ নিরমল,
প্রেমরসে পঁহু ভোরা ॥

এই 'কনক কষিল গোরার অঙ্গই চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তাদের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। তাই চৈতন্যোত্তর যুগের সকল পদকর্তার পদেই গৌরচন্দ্রিকার পদ পাওয়া যায়।

ঙ ॥ প্রাক্ চৈতন্য যুগের পদাবলী অপেক্ষা চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী অধিকতর অলংকার সমৃদ্ধ এবং কলানিপুণ—জয়দেব এবং বিদ্যাপতির কথা স্মরণ রেখেই আমরা একথা বলছি। চৈতন্যোত্তর যুগের কবির হাতে গোষ্ঠীগত চেতনা হৃদয়ানুভূতি ইত্যাদির সাথে ছিল 'বৈষ্ণব মহাজন-চেতনা-সৃষ্ট বিরাট দার্শনিক এবং আলংকারিক ঐতিহ্য।' ফলে তাঁদের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি এই দার্শনিক আলংকারিক পটভূমিকায় হয়ে উঠেছিল আধকতর শিল্প-সুষম এবং কলানিপুণ। মণ্ডণ-শিল্প চাতুর্যে,চৈতন্যোত্তর যুগের অধিকাংশ পদাবলী তাই দীপ্তিময় এবং প্রজ্জ্বোল।

৫॥ প্রাক-চৈতন্য যুগের পদাবলীতে প্রার্থনা বিষয়ক যে সমস্ত পদ বিধৃত হয়েছে তাদের অঙ্গ-সুষমা এবং ভাবগভীরতা আমাদিগকে মুগ্ধ করে কিন্তু এই সমস্ত পদে পৃথিবীর ধূলি মলিনতা হ'তে পরিত্রাণ লাভের যে ব্যাকুল আর্তি প্রকাশিত হয়েছে চৈতন্যোত্তর যুগের বিপুল পদাবলীর কোথাও তা' দৃষ্ট হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু আজীবন ব্যাপী আচরণের দ্বারা এই শিক্ষা দিয়েছেন যে অহৈতুকী ভক্তিই শ্রীভগবানের নিকট আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। অন্তর্মূলে মোক্ষবাঞ্ছা প্রধান হয়ে উঠ্‌লে কৃষ্ণভক্তি অবলুপ্ত হ'তে বাধ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কণ্ঠে তাইতো শুনি এই সতর্ক বাণী :

………মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥

তাই চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তাগণ ভবসিন্ধু হ'তে পরিত্রাণ লাভের আকাঙ্খায় ব্যাকুল না হয়ে অহৈতুকী ভক্তির শান্ত ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে বলেছেন : 'চাইনা আমি রাধা হ'তে হব রাধার পরাণ-প্রিয়া।' গোবিন্দদাস কবিরাজের পদে তাই তো প্রকাশ পেয়েছে কৃষ্ণ-পদ-সেবন দাসী হ'য়ে থাকার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা :

শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ-সেবন দাসীরে।
পূজন সখীজন আত্ম-নিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষী রে॥

এই অহৈতুকী ভক্তির চরম প্রকাশ ঘটেছে নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনার পদ-গুলিতে। কিন্তু জয়দেব বিদ্যাপতি ইত্যাদি চৈতন্যপূর্ব যুগের কবিগণের পদে অহৈতুকী ভক্তির বদলে মোক্ষ-বাঞ্ছা প্রধান হয়ে উঠেছে। কেননা তাঁদের কাছে আত্ম পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা 'কৈতব প্রধান' ছিল না। তাই বিদ্যাপতির পদে কৃষ্ণ পদ সেবা নয়—ভবসিন্ধু হ'তে পরিত্রাণ লাভের কী গভীর আর্তিই না প্রকাশিত হয়েছে :

ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

ছ॥ প্রাক্-চৈতন্য যুগের পদাবলীতে প্রাধান্য লাভ করেছে সম্ভোগ-শৃঙ্গার। জয়দেব বড়ু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি এই সম্ভোগ-শৃঙ্গারেরই কবি। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীর মর্মমূল হ'তে অনুরণনিত হয়ে উঠেছে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের সকরুণ রেশ। এখানে সম্ভোগ-শৃঙ্গার জৈবিক-বৃত্তিতে প্রবল হ'য়ে উঠতে পারে নি। মিলন ও বিরহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বিশ্বকবি বলেছেন "মিলন ও বিরহ উভয়ের মধ্যে বিরহই আমাদের অধিকতর কাম্য; কেননা, মিলনে যাহাকে একান্ত ভাবে কাছে পাই, বিরহে তাহাকে নিখিল ভুবনে ব্যাপ্ত করিয়া দিই।" 'পদাবলী সাহিত্যে যেখানে রাধিকার আর্তি বর্ণিত হয়েছে, সেখানে প্রাকৃত পাঠকের মনও ইন্দ্রিয়ের বন্ধনকে অতিক্রম করে কোন্ এক উর্দ্ধলোকে বিচরণ করে। এই জন্যই এ যুগের অনেক পণ্ডিতের মতে প্রাক-চৈতন্য যুগের রাধিকা প্রধানত প্রাকৃত নায়িকা কিন্তু পরবর্তী কালে মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের প্রভাবে পদাবলী-সাহিত্য প্রাক্তন ধারা হ'তে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হ'লেও অধ্যাত্মলোকে পর্যবসান লাভ করেছে।'

জ॥ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য লীলা-বর্ণনায় প্রাক্-চৈতন্য এবং চৈতন্যোত্তর যুগের পদ সাহিত্যে এক বিপুল পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাক-চৈতন্য যুগের পদ সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য লীলার সাথে ঐশ্বর্য লীলার বিশেষ চিত্রণ সহজেই আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। জয়দেব ভগবানের দশাবতারের স্তব করেছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখি বড়ু চণ্ডীদাস ভগবানের ঐশ্বর্য রূপের অত্যুজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র কংসবধের জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের পদসাহিত্যে পদকর্তাগণের প্রধান উপজীব্য হলো শ্রীভগবানের মাধুর্য লীলার অভিনব রূপায়ণ। ভগবানের ঐশ্বর্য লীলার চিত্রণ এই যুগের পদ সাহিত্যে বিরল-দৃষ্ট।

॥ চণ্ডীদাস ॥

॥ এক ॥

॥ চণ্ডীদাসের কবি-মানস ॥

বৈষ্ণব কবি এবং কাব্য সম্পর্কে স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়ন জলের রাজ্য।...বাঞ্ছিতের দেহ স্পর্শ করিতে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ব পরিমল আঘ্রাণ করিতে, মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় স্বর্গীয় প্রেমিক কবিগণ কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন, পদাবলী সাহিত্য তাঁহাদের অশ্রু-ইতিহাস। বৈষ্ণব পদাবলীর কেন্দ্রীভূত এক স্বর্গীয় উপাদান আছে, উহা মানবীয় প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহসা সুর চড়াইয়া এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিনী ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে"—এই মন্তব্য মহাকবি চণ্ডীদাস এবং তাঁর পদাবলী সম্পর্কে যেমন ভাবে প্রযোজ্য, বোধকরি তেমন আর কোন কবি ও তাঁর পদাবলী সম্পর্কে নয়। এই কথাগুলির ভিতর দিয়ে সাধক কবি চণ্ডীদাসের মর্ম-বাণী ও হৃদয়ার্তিটুকু সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে। মরমী কবির সুদীর্ঘ কাব্য-জীবন-ইতিহাস একান্তভাবে অশ্রুজলেরই ইতিহাস। এই অশ্রুর ভাগটা চণ্ডীদাসের মধ্যেই অধিক। অন্য কোন কবির কাব্যে অশ্রুর প্লাবন ঠিক এমন অবিরল ধারায় প্রবাহিত হয় নি। এই অশ্রুর উৎসমূল হ'ল বাহ্য-চেতনা-বিহীন গহন মনের গভীরতম অনুভূতি। চণ্ডীদাস এই গভীরতম অনুভূতির সহজতম প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী।

কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ে নিখিল বিশ্বের পণ্ডিত মহলে যত বিতর্কই থাকুনা কেন—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে সার্থকতম কাব্যের রসলোক-সৃজনে দু'টি সত্তা ক্রিয়াশীল। এই দ্বৈতসত্তার একটি হলো কবির দ্রষ্টা-সত্তা—এবং অপরটি হলো তাঁর স্রষ্টা-সত্তা। একটি সত্তা দিয়ে কবি অবলোকন করেন বিপুল বিশ্বের অনন্ত-সৌন্দর্য-সম্ভার, অপর সত্তা দিয়ে তিনি এই বিপুল সৌন্দর্য-সম্ভারকে আপন জারক রসে জরিয়ে দেন তার শিল্প-সুষম রূপায়ণ। এই দ্রষ্টা ও স্রষ্টা সত্তার মহা সম্মিলনে গড়ে ওঠে মহাকাব্যের মহিমোজ্জ্বল রূপ। কিন্তু

মহাকবি চণ্ডীদাস কাব্য-ক্ষেত্রে যতবড় দ্রষ্টা ছিলেন ততবড় স্রষ্টা ছিলেন না। তিনি গহনমনের আত্মবিভোল সত্তা দিয়ে সব কিছুই অনুভব করেছেন কিন্তু প্রকাশ ক্ষেত্রে রূপ, ভাব, এমন কি ভাষা কিছুরই সৃষ্টি করেন নি। মনের কথাটাকে তিনি যেভাষা মুখে এসেছে সেই অনাড়ম্বর, সরল, সহজ, 'সাদা' ভাষা দিয়েই প্রকাশ করেছেন। তাই কাব্য-ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস যত বড় রূপ-দক্ষ তত বড় রূপ-শিল্পী নন। তাঁর কাব্যের "অনেক স্থলেই ছন্দ অপরিণত, বাক্য অসম্পূর্ণ, রীতি অসংহত, মণ্ডণ-কলার অভাব ত সর্বাধিক প্রস্ফুট"—তথাপি চণ্ডীদাস মহাকবি কেননা 'না বলা বাণীর নীরব ভাষায়' তিনি সমস্ত পাঠকের কাছে 'মনে মনে লিপি' লিখেছেন। এই 'না বলার' ভিতরেও তিনি এত বেশী বলেছেন যে তেমন করে বলা পৃথিবীর খুব কম কবিই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সহজ কথার গুণ এই যে, তাহা যতটুকু বলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বলে। সে সমস্তটা বলে না।" অনাড়ম্বর বাণীই বুঝি গহন মনের ধ্যান স্বপ্নের শ্রেষ্ঠতম বাহন। সহজতম প্রকাশ আমাদের 'কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ' ক'রে তার সকল অভাসটুকু হৃদয়াভ্যন্তরে সঞ্চারিত করে দেয়; অলক্ষ্যে মর্মমূলে শিহরণ জাগিয়ে অনুভূতির রঙীন ফাগ মাখিয়ে দিয়ে যায়।

কাব্যক্ষেত্রে চণ্ডীদাস 'রূপদ্রষ্টা'—'রূপস্রষ্টা' নয় এ কথাটি তাঁর পদালোচনায় অধিকতর প্রতীয়মান হবে। প্রসঙ্গতঃ এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আজকাল চণ্ডীদাসের অনুভূতির কথা বাদ দিয়ে কেউ কেউ কেবল মাত্র শিল্প-সৃষ্টির প্রসঙ্গ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই আলোচনা যে 'প্রায়-ব্যর্থ' তা' বলাই বাহুল্য। কেননা অসংখ্য পদের মধ্য হ'তে মাত্র কয়েকটি শব্দালংকার ও অর্থালঙ্কারযুক্ত পদ বার করে চণ্ডীদাসের কাব্যকে মণ্ডণকলানিপুণ বলা যে একান্ত একদেশদর্শী তা' সহজেই অনুমেয়। বৈষ্ণব পদাবলী পূর্ব-সংস্কার গঠন-রীতি এবং ধর্ম-গোষ্ঠীগত নিয়ম-নীতি অনুসরণে গড়ে উঠেছে—এমন কথা সাধারণ ভাবে বলা হয়ে থাকে। এ কথা চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তাদের সম্পর্কে বিশেষ রূপে প্রযোজ্য—জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের কাব্য যে অলংকারশাস্ত্র অনুযায়ী গড়ে উঠেছে সেকথা ঐতিহাসিক সত্য। প্রাক্-চৈতন্য যুগের জয়দেব এবং বিদ্যাপতি সম্পর্কেও একথা আংশিক সত্য—চণ্ডীদাসের কাব্য সম্পর্কে এমন কথা নিঃসন্দেহে

জোর করে বলা চলে না। যদি ধৃষ্টতা না হয় তা' হলে বলবো চণ্ডীদাস-কাব্য সম্পর্কে এমন কথা না বলাই সঙ্গত। চণ্ডীদাসের কাব্য যখন রচিত হয়েছে তখন বৈষ্ণব সংস্কারও দৃঢ়-পিনদ্ধ হয়ে ওঠেনি। এবং এ কাব্য যে অলংকার শাস্ত্র-অনুযায়ী গড়ে ওঠেনি তার প্রমাণ এ পদাবলীর অঙ্গেই বিজড়িত। বস্তুতঃ পূর্ব-সংস্কার-সঞ্জাত কোন নিয়ম-নীতি অন্তরাল হতে চণ্ডীদাসের কাব্যে বেগ সঞ্চার করে নি—কবি আপন ধ্যান স্বপ্নের সুধা পিয়ে আপনি বিভোর হয়েছেন, আপন মানস-সরোবরের স্বর্ণ-কমল চয়ন করে আপনি দিয়েছেন পুষ্পাঞ্জলি।

চণ্ডীদাসের কাব্যে 'কবি-ব্যক্তিত্ব' নেই। সজাগ 'আমিত্ব'-বোধ হতে কবি ছিলেন বহু দূরে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলায় তিনি এমন ভাবে মনে প্রাণে মজে ছিলেন যে বাহ্য-চেতনা-বিহীন অবস্থায় শ্যাম ও শ্রীমতীর চরণ-প্রান্তে আপন ব্যক্তিত্বটুকু সহজেই বিসর্জন দিয়েছেন। বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস আমিত্বের সজাগ প্রহরী বেষ্টনে কাব্য রচনায় ব্যস্ত—এমন কি জ্ঞানদাসের কবিতাতেও মাঝে মাঝে আমিত্বের শঙ্কিত সজাগ স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে কিন্তু চণ্ডীদাসের কাব্যে প্রধান হয়ে উঠেছে আত্মবিমুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত মনের ব্যক্তিত্বহীন অনুভূতি। কবির চিন্তা-ভাবনার সাথে কবির ব্যক্তিত্ব কিংবা আমিত্ব-বোধ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-তীর্থে এক হয়ে মিলেছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তাই কবি-ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র-অস্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

চণ্ডীদাসের এ প্রেম-কাব্য চির পুরাতন অথচ চির নূতন প্রেম-গীতা। এ কাব্য কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রেমামৃত নয়—রাধাকৃষ্ণ-লীলামৃতকে অতিক্রম করে এ কাব্য হয়ে উঠেছে শাশ্বত 'যুগল প্রেমের' চিরন্তন প্রেমগাথা। আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী বৈষ্ণবকাব্যের প্রসারের অন্তর্নিহিত কারণটি হলো এ কাব্যের অন্তরালবর্তী এই যুগল-প্রেম-সত্তার চিরন্তন রূপায়ণ। এর অন্তর্মূল হ'তে যখনই মুরজ-মুরলী রাধা বোলে বেজে উঠেছে তখনই আত্মজ্ঞান হারিয়ে আপামর বাঙালী ছুটে এসেছে সে সুর-সভা তলে। কেন না, ধর্মীয় দেবতা নয়—প্রাণের দেবতাকে তারা খুঁজে পেয়েছিল রাধা-কৃষ্ণের লীলামৃতের মাঝে। দেবতাই তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল প্রিয়। বাঙালী-মানসের এই চিরন্তন উপলব্ধির সুন্দরতম প্রকাশ দেখি রবীন্দ্রনাথের "বৈষ্ণব কবিতায়" :

দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

চণ্ডীদাসের কাব্যে প্রিয়ই দেবতার রূপ পরিগ্রহ করে প্রিয়-দেবতায় একাকার হয়ে গেছে। প্রেমের এই সুগভীর অনুভূতিই চণ্ডীদাসের কাব্যের প্রাণ-স্পন্দন। "বর্ণনার কোনও আড়ম্বর নেই, কোনও প্রকার বক্তব্য-প্রতিপাদনের ব্যস্ততা নেই, অতীব অনায়াসে নিছক ঘটনার উপস্থাপনা—Statement of facts—কেবল অনুভূতির গভীরতার ফলে কাব্য হ'য়ে উঠেছে।" চণ্ডীদাসের কাব্য এই অনুভূতিরই বাঙ্ময় প্রকাশ, 'অসংজ্ঞান মনের আত্মকথা।'

চণ্ডীদাসের কাব্যে বিরহ-বেদনা তীব্র হয়ে উঠেছে। পূর্বরাগ, বিরহ এমন কী মিলনের মাঝেও বিরহের সকরুণ ধ্বনি আমাদের স্পর্শ করে। অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনের পদাবলীতে বিপ্রলম্ভের এমন মর্মভেদী করুণ ধ্বনি অনুরণনিত হয়ে ওঠেনি। বিদ্যাপতি সৌন্দর্যের কবি, জ্ঞানদাস মাধুর্যের কবি, গোবিন্দদাস সুরের কবি আর চণ্ডীদাস হলেন বিরহের বাণী-পূজক। প্রকাশ-ভংগীর সারল্যের সাথে সমগ্র কাব্যব্যাপী বিরামহীন এই বিরহ-বেদনা চণ্ডীদাসের পদাবলীকে অপূর্ব লাবণ্য-সুষমা দান করেছে। কোন কোন বৈষ্ণব কবির কবিতায় রাধার 'দেহের ভাগ' অধিক হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে—চণ্ডীদাসের রাধা এসব অভিযোগের অনেক উর্দ্ধে। পূর্বরাগের স্বপ্নঘন লীলা-চাপল্যের সময় হতেই তাঁর কাব্যে যে, বিরহের সুর মিশেছে—সেই সুরই ক্রমান্বয়ে পর্দা অতিক্রম করে করে দুর্বার হয়ে উঠেছে। বিরহের উত্তাপে চণ্ডীদাসের রাধা খাদ-হীন দীপ্তোজ্জ্বল নিটোল হীরক-খণ্ড।

ভগবৎ-প্রাপ্তির তিনটি পথ—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। বৈষ্ণব কবিগণ এই ভক্তিমার্গেরই সাধক এবং বাণীপূজক। ভগবানকে পাওয়ার জন্যে ভক্তের আকুতি এবং আকাঙ্ক্ষাই হল পদাবলীর সূতিকাগার। বিভিন্ন বৈষ্ণব-কবি বিভিন্ন ভাবে এই আকুতিকেই আপনাপন কাব্যে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে চণ্ডীদাসের কাব্যে ভক্তের এই সাধনা অপূর্ব ব্যঞ্জনা-গরিমায় বিকশিত। এ কাব্যে আমরা যে তদাত্মতা এবং ঐকান্তিক সাধন-ধারার সাথে পরিচিত হই, ভগবানকে পাওয়ার জন্যে ভক্তের অতন্দ্র-প্রয়াস ছাড়া তা' আর অন্য কিছু নয়—অন্য কিছুতে সম্ভবও নয়।

ভগবান কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্যে ভক্ত রাধিকার যে হৃদয়ার্তি এবং সাধনা—চণ্ডীদাসের কাব্যে তা' কোথাও লৌকিক পর্যায়ে নেমে আসেনি কিন্তু অন্যান্য কবির পদে শ্রীমতীর সাধনার মধ্যে নিরন্তর লৌকিক সুরটি সংমিশ্রিত হ'য়েছে। এসাধন-ধারা-চিত্রণে চণ্ডীদাস একক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এবং এখানেই চণ্ডীদাসের কাব্য Romanticism এর আশা-নিরাশার আন্দোলন হ'তে সরে এসে Mysticism-এর গভীর প্রশান্তির মধ্যে পরিব্যাপ্ত। Romanticism-এর মধ্যে পাওয়া-না-পাওয়ার ভয় থাকে, এ পর্যায়ে কাব্য দ্বন্দ্ব-দ্বিধায় দোলায়িত এবং দূরপ্রসারি। দূরপ্রসারি—কিন্তু সম্মুখে কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থল নেই, আবরণের অন্তরালে সকল কিছুই অজ্ঞাত কিন্তু Mystic কাব্যের দিগন্ত অধিকতর দূর প্রসারি, এ স্তরে কাব্যের মধ্যে Romanticism-এর আবরণ উন্মোচিত হয়, লক্ষ্যস্থল সম্মুখে আসে, সকল অজ্ঞাতলোক প্রকাশিত। এ স্তরে কাব্যের মধ্যে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না—পরম প্রাপ্তির মধ্যে চিত্তের সকল ব্যাকুলতা প্রশান্ত হ'য়ে ওঠে। চণ্ডীদাসের রাধিকার মধ্যে এই প্রশান্তির ভাবটা ফুটেছে সর্বধিক। এখানে শ্রীমতীর কণ্ঠে বিরহের গুঞ্জন আছে কিন্তু সে বিরহের মধ্যে কোন আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব নেই। লক্ষ্যস্থল অজ্ঞাত নয়—সম্মুখে, আবরণের অন্তরালে সকল কিছু অবলুপ্ত নয়—উন্মুক্ত, শ্রীমতীর সাধনা সেই অদ্বয় সত্যকে গভীরতর ভাবে আপন হৃদয়ে গ্রহণ করা। বেদনার সাথে পরম প্রশান্তির মধ্যে শ্রীমতী ধ্যান-গম্ভীর যোগিনী। চণ্ডীদাসের কাব্য এখানেই Romanticism-এর রহস্যাবরণ হ'তে সরে এসে Mysticism-এর অদ্বয় সত্যের বুকে করেছে পদ-সঞ্চার।

বিভিন্ন রস পর্যায় নিয়ে পদরচনা করলেও পূর্বরাগ, বিরহ, আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভা সার্থকতার সীমা-স্বর্গে উন্নীত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন চণ্ডীদাসের বিভিন্ন রসপর্যায়ের পদে স্পষ্ট কোন ব্যবধান নেই। বিদ্যাপতির পদের আলোচনায় আমরা দেখব বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, বিরহ ইত্যাদি পদগুলির প্রত্যেকটি আপন স্বরূপ-[illegible]তন্ত্র্যে একে অপর হ'তে পৃথক কিন্তু চণ্ডীদাসের বিভিন্ন রসপর্যায়ের পদের মাঝে এমন কোন বিভেদ রেখা গ'ড়ে ওঠেনি। প্রত্যেকটি পদেই অন্তহীন বিরহের নম্র-বিধুর ছায়াপাতে কম্পমান, প্রত্যেকটি পদের অন্তরালেই বিরহের গুঞ্জন

ধ্বনিত। সুতরাং খাঁটি অর্থে চণ্ডীদাসকে পূর্বরাগের কবি বলা চলে না—পূর্বরাগের পদে ভীতির সাথে (বিরহ নয়) যে আনন্দের হিল্লোল জাগে তা' চণ্ডীদাসের কাব্যে নেই। সুতরাং চণ্ডীদাস পূর্বরাগের নয়—বিরহেরই বাণী-পূজক। এখানে তিনি দ্বিতীয়রহিত। পূর্বরাগের পদে তিনি যদি হন শ্রেষ্ঠ বিরহের পদে তিনি শ্রেষ্ঠতম। নিম্নের বিভিন্ন পদের আলোচনা হ'তে পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি পদে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিরহের প্রতি কবি-মানসের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হবে।

॥ দুই ॥

॥ পূর্বরাগ ॥

সাধারণতঃ বয়ঃসন্ধির সদা চঞ্চল রোমাঞ্চ-রঙীন মুহূর্তে নায়ক-নায়িকার হৃদয়-বেলায় অনুরাগের যে প্রথম পুলকবন্যা উদ্বেল হয়ে ভেঙে পড়ে 'প্রেমের সেই প্রথম চুপি চুপি আনাগোনা'র স্বপ্ন-মধুর ক্ষণটিতে দয়িতার রহস্যময় মানসিক অবস্থাটির নাম পূর্বরাগ। সমগ্র প্রেম-লীলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনুভূতি-রঙীন ও পুলক-মধুর দুষ্প্রাপ্য-সুন্দর ক্ষণ এই পূর্বরাগের অপরিসীম আবেগ-উচ্ছ্বাসের অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে। এই সময় প্রেমের একটি আভাস মনের গহনে ধরা দেয় কিন্তু প্রেমের কোন স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। অনির্দেশ্যকে নিকটে পাওয়ার জন্যে, প্রেমের সকল শিহরণকে হৃদয়ে গ্রহণ করার জন্যে নায়ক-নায়িকার চিত্তে এক অসীম আকুলতা জন্মে—পাওয়া-না-পাওয়ার দ্বন্দ্বে, আলো-আঁধারের মিলন-লীলায় এই দুর্বার অস্পষ্ট অসীম আকুলতা মনোরম হয়ে ওঠে। আধুনিক কবির বাণীতে পূর্বরাগের এই আবেশ-বিহ্বল ক্ষণ, প্রেমের এই প্রথম আনাগোনা, এই তিলে তিলে নতুন হওয়ার কথা সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে :

হৃদয়ের কাছাকাছি সেই
প্রেমের প্রথম আনাগোনা,
সেই হাতে হাত ঠেকা, সেই আধো চোখে দেখা
চুপি চুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা।
অজানিত, সকলই নূতন
অবশ চরণ টলমল,
কোথা পথ কোথা নাই কোথা যেতে কোথা যাই,
কোথা হ'তে উঠে হাসি কোথা অশ্রুজল।

পূর্বরাগের একদিকে আনন্দ অন্যদিকে আছে অশ্রু, একদিকে উল্লাস অন্য দিকে আছে বেদনা—এই আনন্দ-অশ্রু, এই উল্লাস বেদনাই পূর্বরাগের প্রাণ-স্পন্দন। পূর্বরাগের সকল মাধুর্য এই আশা-নিরাশার মধ্যে দোলায়িত হ'য়ে ওঠে।

অলংকার শাস্ত্রে পূর্বরাগের দুটি কারণ নির্দেশ করা হয়েছে—শ্রবণ এবং দর্শন। শ্রবণ বিভিন্ন প্রকারে সম্ভব হ'তে পারে। সখী কিংবা দূতীর মুখে প্রেমাস্পদের নাম এবং গুণাবলী শ্রবণ করে অনেক ক্ষেত্রে যে পূর্বরাগের সঞ্চার হয় তার প্রমাণ পাই বৈষ্ণব কাব্য সমূহে এবং বিভিন্ন রসশাস্ত্র গ্রন্থে। শ্রবণের মাধ্যমে পূর্বরাগ সঞ্চারের আর একটি বিশেষ উপাদান বংশীধ্বনী। বংশীধ্বনী পূর্বরাগ সঞ্চারে নিখিল বৈষ্ণব সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছে। এই বংশীধ্বনীর প্রেমোম্মাদিনী আহ্বানে রাধার অন্তরবেলায় নীরবে হয়েছে কৃষ্ণ-প্রেমের আবেশ-সঞ্চার। শ্রবণের মত দর্শনও বিভিন্ন প্রকারে সম্ভব হতে পারে। সাক্ষাৎ অর্থাৎ চাক্ষুষ দর্শন ছাড়া ইন্দ্রজাল কিংবা চিত্রপটে দর্শনের কথা সর্বজনবিদিত। এ ছাড়াও আছে স্বপ্নে দর্শন। প্রেমাস্পদকে স্বপ্নে দর্শনের মধ্যেও যে নায়িকার চিত্তে অপূর্ব বর্ণরাগে পূর্বরাগের উন্মেষ হ'তে পারে,—বৈষ্ণব-পদ-সাহিত্যে বহুস্থানে তার পরিচয় নিহিত রয়েছে।

প্রেমের প্রথমোন্মেষের কাল হ'তে পরিণতি পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়টিতে প্রেমের ক্রম-গাঢ়তায় নায়ক-নায়িকার চিত্তে বিভিন্ন প্রকার অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। আলংকারিকগণ লালসা ইত্যাদি হ'তে মৃত্যু পর্যন্ত দশ অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

লালসোদ্বেগ-জাগর্য্যা তানবং জড়িমাত্রতু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশাদশ ॥

'অভীষ্ট প্রাপ্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা হ'তে লালসা, মনের কম্প বা চাঞ্চল্য হ'তে উদ্বেগ ; নিদ্রাহীনতা হ'তে জাগর্য্যা ; শরীরের কৃশতা ও দুর্বলতা হ'তে তানব ; ইষ্টানিষ্টের জ্ঞান নেই, প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না এরূপ অবস্থাকে জড়িমা ; ভাবের গভীরতা হেতু যে চিত্তবিক্ষোভ জন্মে তা' সহ্য করতে না পারলে বৈয়াগ্র ; বৈবর্ণ্য, উত্তাপ, শীত প্রভৃতি শারীরিক গ্লানি হ'তে ব্যাধি ; প্রিয়ের প্রতি একান্ত আবেশ হেতু সর্বত্র অতিভ্রান্তি হ'তে উন্মাদ, বিমনস্কতা অর্থাৎ

বিপরীত গতি হ'লে মোহ; এবং প্রিয়-সমাগম অসম্ভব বোধ হ'লে মৃত্যুর উদ্ভব হয়।'

এখন আমরা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পূর্বরাগের স্বরূপ বিচার করবো। এ পদামৃতে আমরা নায়ক-নায়িকা উভয়েরই পূর্বরাগের পরিচয় পেয়েছি। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়তলে পূর্বরাগের উন্মেষ ঘটেছে চাক্ষুষ দর্শনে আর শ্রীরাধার অন্তর্মূলে পূর্বরাগের বীজটি রোপিত হয়েছে নাম শ্রবণের মাধ্যমে। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা উভয়ের পূর্বরাগ বর্ণিত হলেও শ্রীরাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় লেখক যে অপরিসীম পারদর্শিতা দেখিয়াছেন—তা' শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায় নেই। অবশ্য তাই বলে পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের পুর্বরাগ কৃষ্ণকীর্তনের শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের মত কেবল একটা উৎকট স্থূল দেহভোগ-লিপ্সা-প্রধান নয়—এ পূর্বরাগও দৈহিক স্থূলতা ভেদ করে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় লোকে উন্নীত হয়েছে তবুও শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ বর্ণনায় যে অসীম আকুতি, যে ব্যাকুল হৃদয়াতি, কামহীন প্রেমের যে সুতীব্রবেগ অনুভূত হয় ঠিক সেই স্তরের হৃদয়ানুভূতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ-বর্ণনায় নেই।

হারানো ধবলীর সন্ধানে আভীরপল্লী হ'তে বৃষভানুপুরে এসে শ্রীকৃষ্ণ ধবলীর সন্ধান পেলেন বটে সেই সঙ্গে রাজ-অন্দর মহলের দিকে দৃষ্টিপাত হতেই দেখতে পেলেন :

মহল ছাড়িয়া আসি সঙ্গে সহচরী দাসী
কনক গাগরি লই কাঁখে।

এবং যাঁর স্বর্ণাঙ্গে গাগরির ঝলক তাঁর রূপ :

ধনীর রূপের ছটা কোটি চাঁদ জিনি ঘটা
কত সুধা বরখয়ে মুখে॥

ধবলীকে নিয়ে কৃষ্ণ ফিরে এলেন আভীর পল্লীর কানন-কুঞ্জে কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এলেন 'ধনীর সুধা বরখিত মুখে'র স্বপ্ন। এই সুধাবর্ষিত মুখ-চন্দ্রিমার রূপ-ঐশ্বর্যে অবশেষে তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হলো, নিদ্রাও দূর বনে পালিয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ পরাণ হারিয়েছেন, কারণ :

হাসির চাহনি দেখালে কামিনী
পরাণ হারানু তাই।

পূর্বরাগের এই সূত্রপাত। কিন্তু এ সূত্রপাত একান্ত স্থূল—'কামিনীর হাসির চাহনি' এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণের 'কামিনীর হাসির চাহনি'র প্রেমে শ্রীরাধার সেই ধ্যান-যোগিনী আবেশ-বিবশ মূর্তি কই ?

এর পর 'নাহিতে' এবং 'সিনিয়া উঠিতে' দুই চোখ ভরে শ্রীকৃষ্ণ রাধার অনন্ত রূপরাশি দেখেছেন এবং এই রূপ-সাগরে অবগাহন করে তাঁর প্রেম-আকুলতা ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছে। সখার কাছে তাঁর এই-তন্ময়তার কথা সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে :

সই, সে নব রমণী কে !
চকিতে হেরিয়া জ্বলত এ হিয়া
ধরিতে নারি এ দে॥
পুন না হেরিলে না রহে জীবন
তোমারে কহিনু দড়।…

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ ক্রমে গাঢ়তা প্রাপ্ত হ'চ্ছে। আর ফেনিল উচ্ছ্বাস নয়, উছল আনন্দও নয়—এখন সখার কাছে শ্রীকৃষ্ণের মর্মভেদী জিজ্ঞাসা :

সখা, রূপ কে চাহিতে পারে।
জুড়ায় কেবল নয়নযুগল চিনিতে নারিলুঁ কে॥

কিংবা

কাহার নন্দিনী কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে।
কোন্ পুণ্য-ফলে বল বল সখা
সে রামা পাইল সে॥

এখানেই শোনা গিয়েছে অতীন্দ্রিয়-প্রেম-রাগিনীর অপূর্ব সুর-মূর্চ্ছনা। এখানেই শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ দৈহিক আকর্ষণকে অতিক্রম করে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়লোকের দিক্-হারা দিগন্ত স্পর্শ করেছে।

এরপর শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতে এ পূর্বরাগের তুলনা নেই। এ যেন পূর্বরাগের পদ নয়—প্রেম-গীতার চির নতুন মন্ত্র। মানবের হৃদয়-মূলে কী নিবিড় তার সংযোগ, কী অমোঘ তার আকর্ষণ !

প্রেমাস্পদের নাম শ্রবণে শ্রীরাধিকার মর্মমূলে এই পূর্বরাগের উন্মেষ—কেবল উন্মেষ নয় একেবারে প্রেমোন্মাদিনী অবস্থা। এ নাম 'কানের ভিতর দিয়ে' সেই যে কোন চকিত মুহূর্তে একবার 'মরমে প্রবেশ' করেছে সেই হ'তে এই নাম জপই শ্রীরাধার ধ্যান-জ্ঞান :

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো

বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো

কেমনে পাইব সই তারে ॥

একেবারে পূর্বরাগের সুরুতেই এমন দুর্লভ-সুন্দর হীরকোজ্জ্বল পদ আর কোন কবির বাণী-বিন্যাসে সার্থক হয়ে ওঠেনি। রাত্রি-দিবসের মিলন-লীলায় ভোরের ছায়ালোকে নাম শ্রবনে যে অনুরাগের সৃষ্টি সেই অনুরাগ সুরের পর সুর পরিবর্তন করে প্রহরে প্রহরে বেড়ে চলেছে। রাধার গহন মনে গভীর জিজ্ঞাসা—নামে যার এত মধু না জানি তার অঙ্গের পরশ কী অসীম আনন্দের :

নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো

অঙ্গের পরশ কিবা হয়।

নাম শ্রবণের পর চির সুন্দর প্রেমময়ের মোহন মূর্তির দর্শন মেলে চিত্রপটে :

বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া

বিশাখা দেখাল আনি।

এই চিত্রপটে দর্শনের পর হ'তে অবশেষে 'যুবতী ধরম কাঁচ সমতুল' হয়ে ওঠে—সেই চিত্র অবলোকন করেই মর্মমূলে জাগে বেদনার করুণ হাহাকার। এরপর ভুবন ভোলান শ্রীনন্দনন্দনের নিটোল যৌবনের অপরূপ লাবণ্য-শ্রী শ্রীরাধা দর্শন করেন প্রেমের অমরাবতীর তীর-ভূমে দাঁড়িয়ে—যমুনার কূলে। সেই হ'তে শ্রীরাধার কণ্ঠে যে বাণী ধ্বনিত হয়েছে তা' প্রেম-মহাসাগরের সুগভীর তল-ভূমি হতে উত্থিত করুণ বেদনা-ম্লান আবেগ-আকুতি :

স্বজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে।

ব্রজকুল-নন্দন হরিল আমার মন

ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরু-মূলে ॥

সুবঙ্কিম ত্রিভঙ্গ-অবস্থায় মুরজ মুরলী হস্তে শ্যাম-দর্শনের পর অবশেষে এল বংশীধ্বনির চির মধুর প্রেমানুভূতির ব্যাকুল আহ্বান। এই আহ্বান-ধ্বনি শ্রবণের পর শ্রীরাধার অন্তরবেদনা এবং প্রেমবেগ দুর্নিবার হয়ে উঠেছে।

এ প্রেমাবেগের মর্ম্মমূলে এতটুকু কামগন্ধ নেই—স্বর্গের মলয় সমীরে প্রেমের এই স্বর্ণ-কমল বিকশিত হয়ে উঠেছে, স্বর্গের সুরভিতেই তা ভরপুর। অন্তরের ব্যাকুল আবেগে রাধা আর ঘরে থাক্‌তে পারেন না—প্রেমাস্পদ-সঙ্গমের তীব্র বেগ তাঁকে 'দণ্ডে শতবার' ঘরের বাইরে নিয়ে আসে :

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥

মন আপনার—আপনার পরম ধন অথচ কত পর! শ্যামের নাম মন হ'তে মুছে ফেলতে চান অথচ মন শত্রুতা করে। শ্যামের নাম ভোলে না—'পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।' রয়ে রয়ে বেদনার তীব্রতায় শ্রীরাধা চমকিত হয়ে ওঠেন। গুরু দুরু-জন কাকেও আর শ্রীরাধার ভয় নেই :

গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি বেদা পাইল॥

অবশেষে 'রাই'-এর নিকট শ্রীরাধার সেই অনন্ত-জিজ্ঞাসা : 'রাই কেন বা এমন হৈল।'

বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস এমন কি জ্ঞানদাসের শ্রীরাধার গহন-হৃদয় হ'তে এমন মর্মভেদী চিরন্তন জিজ্ঞাসা-বাণী উচ্চারিত হয় নি। বিদ্যাপতির পূর্বরাগে পেয়েছি শ্রীরাধার লীলা-চপল মূর্তি। সেখানে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আছে—কিন্তু এমন অন্তর্ভেদী হাহাকার নেই। চণ্ডীদাসের বাণীতে পাই এক অপরূপ ধ্যান-মূর্তি :

মা গো, রাধার কি হ'ল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥

বিদ্যাপতির রাধা বয়ঃসন্ধির চঞ্চল নায়িকা—কৈশোর-যৌবনের মিলন-ভূমির কল্পনাকুল রোমাঞ্চ-রঙীন দিনগুলি তাঁর কাছে স্পষ্ট কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার দেহে কিংবা মনে এই রঙীন কল্পনার এতটুকু লীলা-বিলাসের চিহ্ন নেই—এ রাধা প্রেম-মহাসাগরের তলভূমে নিমজ্জমান ধ্যান-গম্ভীর স্বর্ণ-প্রতিমা। যোগিনী সাজই এ রাধার অঙ্গভূষণ :

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে যেমতি যোগিনী পারা॥

এখানে ভাবা মহাযোগিনী মূর্তিতে রূপায়িত হ'য়ে আমাদের সম্মুখে কায়া ধরে দাঁড়ায়। পূর্বরাগের এই ধ্যান-গম্ভীর বর্ণ-সুষম চিত্র অন্য কোন কবির কাব্যে পাওয়া যায়নি। অন্য কোন কবির কাব্যে রাধার হৃদয়ার্তি এমন সুগভীর রেখাঙ্কনে স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। একমাত্র চণ্ডীদাসের রাধাই 'পুলকে আকুল দিক নেহারিতে সব শ্যামময়' দেখেন, একমাত্র মহাকবির রাধাই যৌবনের প্রথম প্রেম-ব্যাকুল দিবসে যোগিনী মূর্তিতে শাশ্বত-রসিক-চিত্তে বলভীর প্রৌঢ়-পারাবতীতে রূপান্তরিতা। এই ছবি, এই মূর্তি, এই স্বর্ণ-প্রতিমা পদাবলীর অন্যত্র বিরল-দৃষ্ট।

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে শ্রীরাধার এই সার্থক, এই সর্বজন হৃদয়-স্পর্শী চিত্রাংকনের অন্তরালে কবি-মানসের এক বিশেষ অনুভূতি বিরাজমান। আমাদের মনে হয় কবি স্বয়ং রাধা রূপে রূপান্তরিত হয়ে শ্রীরাধার অন্তর্বেদনা ও মর্মানুভূতির স্বরূপ হৃদয়-মূলে গ্রহণ করেছেন—তারপর সেই আপন অন্তরের গহনতম ব্যথা-বেদনাকে তুলির টানে টানে সার্বজনীন করে তুলেছেন। এখানে রাধার বেদনা কবির বেদনার সাথে মিলিত হয়েছে, রাধার হৃদয়াকুতি কবির অন্তর-বেদনার সাথে সম্মিলিত হয়েছে—এখানে স্বয়ং রাধাই কবি—কবিই রাধা। রাধা এবং চণ্ডীদাসের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। দুই দেহ কিন্তু এক প্রাণ—কৃষ্ণের মধুর মুরলী এই একই প্রাণে তুলেছে বিপুল বিরহের অনন্ত ক্রন্দন। রাধাভাবের এই তদাত্মতার জন্যেই চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদগুলি এমন সার্থক, এমন সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয়ে উঠেছে।

॥ চার ॥

॥ আক্ষেপানুরাগ : চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস :

(আপেক্ষানুরাগের পদে এই তদাত্মভাব অধিকতর সুস্পষ্ট। এই একাত্মতার জন্যেই আক্ষেপানুরাগের পদগুলিও পূর্বরাগের পদরাজীর মত অপূর্ব বর্ণ-রাগে বিকশিত। আক্ষেপানুরাগের আর একজন বিখ্যাত পদকর্তা জ্ঞানদাস।) আমরা এখানে জ্ঞানদাস এবং চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদগুলির একত্র আলোচনা করব। এই তুলনামূলক আলোচনায় চণ্ডীদাসের রাধা-ভাব-তন্ময়তার গভীরতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাস্বাদনে চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস একই ভাবরসের কবি।

সময়ে সময়ে উভয়ের ভাব, উভয়ের ভাষা, উভয়ের ছন্দ একই সমান্তরাল রেখায় দিগন্ত পরিভ্রমণ করেছে। এজন্যে জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয়।) তবুও চণ্ডীদাসের মধ্যে রাধা ভাবের যে সুগভীর ঐক্যানুভূতি লক্ষ্য করা যায় তা' জ্ঞানদাসের মধ্যে নেই। (উভয়ে একই ভাব-রসের কবি—তবুও স্তরে এক নন, সেখানে তর-তমের পার্থক্য দুরতিক্রমী হয়ে উঠেছে। রাধা-ভাব-তন্ময়তায় জ্ঞানদাস গভীরতর, চণ্ডীদাস গভীরতম।) এই অনুভূতির ক্ষেত্রে কেবল নয়—বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস কেহই চণ্ডীদাসের সমকক্ষ হ'য়ে উঠ্‌তে পারেন নি। রাধাকৃষ্ণ লীলামৃতের রচয়িতা হিসেবে 'চণ্ডীদাস গভীরতম প্রাণবেদনার গীতকার আর বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ঐ একই প্রাণবেদনার সার্থক চিত্রকর।'

এখানে আক্ষেপানুরাগ সম্পর্কে একটি কথা বলে নিতে চাই। (আক্ষেপানুরাগের পদে কোন অনুযোগ থাকা উচিত নয়। কোন প্রশ্ন নয়, কোন জিজ্ঞাসা নয়, কোন মান নয়, কোন ব্যক্তিত্বের বিকাশ নয়, কোন আমিত্বের প্রকাশ নয়—আক্ষেপানুরাগের পদে থাকে কেবল দুর্নিবার আক্ষেপ। কেবলমাত্র হৃদয়ভেদী আক্ষেপই আক্ষেপের পদরাজীকে সুন্দর করে তোলে।) নিম্নের পদালোচনায় আমরা দেখ্‌তে পাব চণ্ডীদাসের পদসমূহে কেবল এই মর্মভেদী আক্ষেপই প্রধান হ'য়ে উঠেছে। অন্যমহাজনের আক্ষেপানুরাগের পদাবলীতে দেখা যায় শ্রীমতী আমিত্বের বিকাশ, আত্মগৌরবের ঘোষণা—মাঝে মাঝে তিনি শ্যামের প্রতি শ্লেষবাক্যও প্রয়োগ করেছেন কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে শ্রীমতীর এই প্রাণোত্তাপ নেই। আমিত্বকে তিনি বিসর্জন দিয়েছেন। এই ব্যক্তিত্ব বিলুপ্তির জন্যেই আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাস সর্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানদাসের সাথে চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদের তুলনামূলক আলোচনায় একথা অধিকতর স্পষ্ট হ'বে।

চণ্ডীদাসের একটি সুবিখ্যাত আক্ষেপানুরাগের পদ এই :

সখা কি আর বলিব তোরে।
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এত দুখ দিল মোরে॥
পিরীতি আরতি কভু না করিব
শয়নে স্বপনে মনে।
পিরীতি নগরে বসতি ত্যজিয়া
রহিব গহন বনে॥

এখানে কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার কোন মান নয়, কোন অনুযোগ নয়—কেবল মরম মনের আক্ষেপই প্রকাশ পেয়েছে।

জ্ঞানদাসের পদে অনুরূপ একটি পদ পাই :

ওহে বন্ধু আর কি বলিব তোরে।
আপনা খাইয়া পিরীতি করিনু
রহিতে নারিনু ঘরে।

এই উভয় পদে লক্ষণীয় বিষয় এই—উভয় কবিই লৌকিকতার দিকে সদা জাগ্রত সচেতন দৃষ্টি রেখে চলেছেন। আক্ষেপানুরাগের পদে আমরা যে রাধার চিত্র পাই তিনি এক দিকে যেমন লৌকিক অন্যদিকে তেমনি সার্বজনীন, এক প্রান্তে তিনি নিভৃত পল্লীর সমাজ-শাসিতা কুলবধূ অন্যপ্রান্তে তিনি উদার বিশ্বের প্রেম-রাজ্যের যুগযুগান্তরের স্বর্ণপ্রতিমা। আক্ষেপানুরাগের পদে লৌকিক রাধার চিত্র এঁকেছেন চণ্ডীদাস :

শাশুড়ী ননদী গঞ্জে দিবারাতি তাহা বা সহিব কত।
পাড়ার পড়শী ইংগিত আকারে দুবচনে বলে যত॥
এযর করণ কুলের ধরম ভরম সরম গেল।
কলঙ্কিনী বলি জগৎ ভরিল নিশ্চয় মরণ ভেল॥

এখানে শ্রীরাধার অন্তরের নিদারুণ আক্ষেপই প্রধান সুরে বেজেছে কৃষ্ণের প্রতি কোন অনুযোগ নেই। কিন্তু জ্ঞানদাসের রাধা নিখিল বেদনাকে আপনার বক্ষে নিতে পারেন নি—তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে মৃদু অনুযোগ :

শাশুড়ী ননদী কথা সহিতে না পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরি মরি॥
চোরের রমণী যেন ফুফুরিতে নারে।
এমতি রহয়ে পাড়াপড়সীর ডরে॥

আর একটি পদে উভয় কবির দৃষ্টি ভংগীর পার্থক্য সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে। অন্য গোপীকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট হয়েছেন দেখে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা মরমে মরে যান—তবুও এই অসীম ব্যথা-বেদনাকে তিনি নীরবে সহ্য করেন, এই হলাহল তিনি নীরবেই আকণ্ঠ পান করেন—তবুও কৃষ্ণের বিরুদ্ধে এতটুকু বিদ্রোহোচ্চারণ নেই :

সই, কেমনে ধরিব হিয়া ?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এ মতি করিল কে ?
আমার পরাণ যেমন করিছে
তেমতি হউক সে।

(কিন্তু জ্ঞানদাসের রাধা দুখের দাহনে ঠিক এতখানি নীরব নন—অভিমানে, ক্ষোভে তিনি আপন মাথার বেণী ছেঁড়েন :

সই, কত রাখিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥
যেদিন দেখিব আপন নয়নে
আন জন সঙ্গে কথা।
কেশ ছিঁড়ি ফেলি বেশ দূর করি
ভাঙিব আপন মাথা ॥

এ পদে অনুরাগ আছে, আক্ষেপও আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আছে বিদ্রোহ-ভাষণ। এখানে শ্রীমতী খণ্ডিতা।) চণ্ডীদাসের আক্ষেপের পদে কোথাও শ্রীরাধার কণ্ঠ দিয়ে এমন বাণী নির্গত হয়নি। চণ্ডীদাসের পদে শ্রীরাধার বিন্দুমাত্র আত্মগৌরব অবশিষ্ট নেই—সকল কিছুই তিনি প্রেমাস্পদের চরণ-প্রান্তে উৎসর্গ করে প্রেমের হিসাব-নিকাশের নতুনখাতায় দেউলিয়া হয়েছেন :

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমাতে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান ॥

কিন্তু (জ্ঞানদাসের শ্রীরাধিকা ঠিক এমনভাবে প্রেমাস্পদের চরণযুগলে কুলশীল-জাতিমান উৎসর্গ করতে পারেন নি—'মায়ের সোহাগে সোহাগিনী বড় আমি' বলে আপন ব্যক্তিত্ব এবং আত্মগৌরবটুকু ঘোষণা করেন :)

শিশুকাল হইতে মায়ের সোহাগে সোহাগিনী বড় আমি।
সখীগণ গনে জীবন অধিক পরাণ বঁধুয়া তুমি ॥

সুদীর্ঘ বিরহের পর পুনর্মিলনের মহালগ্নে চণ্ডীদাসের আত্মবিস্মৃত রাধার কণ্ঠে শ্রবন করি বিপুল প্রশান্তির সায়াহ্ন-কোমল উচ্চারণ :

> বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে। দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
> এতেক সহিল অবলা বলে। ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
> দুখিনীর দিন দুখেতে গেল। মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল॥

অন্য কোন জিজ্ঞাসা নয়, কোন মান নয়, অভিমান নয়, সুদীর্ঘ বিরহের অভিমান-ক্ষুব্ধ প্রাণোত্তাপও নয়—কেবল এক করুণ জিজ্ঞাসা 'মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল।' এতো রাধার বাণী নয় এ যে স্বয়ং কবিরই হৃদয়োপলব্ধিজাত বেদনা-উদ্বেল মর্মভেদী জিজ্ঞাসা। এখানে শিল্প ও শিল্পীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই—মহামিলনের সঙ্গম-তীর্থে নিবিড় প্রাণাবেগে উভয়ে এক হয়ে মিশে গেছে।

॥ পাঁচ ॥

॥ বিভিন্ন রসপর্যায়ের পদ ॥

মিলনের পদ রচনায় চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব নেই। মিলনে যে বিপুল শান্তি, অসীম আনন্দ উদ্বেল হ'য়ে ওঠে, চণ্ডীদাসের পদে তা' নেই। অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি বলেছেন, 'দোঁহার নয়নে নয়ন মিলন হৃদয়ে হৃদয় ধরে' অথবা 'তুহুঁক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন উছলল প্রেম হিলোল' কিন্তু এমন অংশ চণ্ডীদাসের পদে নিতান্ত কম। মিলনের মাঝে বিচ্ছেদের সকরুণ বেশ এসে মিশেছে। 'দুঁহু কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' এই সুরই চণ্ডীদাসের কাব্যের মূল সুর।

আত্মনিবেদনের চণ্ডীদাস সার্থক। ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে, আমিত্বকে অবলুপ্ত করে নিজেকে অপরের কাছে নিবেদন করাই হ'ল চণ্ডীদাসের কবি-মানসের প্রবণতা এবং সেজন্যেই আত্মনিবেদনের পদে চণ্ডীদাস আশ্চর্য কৃতিত্বের অধিকারী। আত্মতন্ময় শ্রীমতী শ্যামের পায়ে নিজেকে নিবেদন করেন :

> বঁধু কি আর বলিব আমি।
> জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণবঁধু হইও তুমি॥
> তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসি।
> সব সমপিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥

একূলে ওকূলে ছকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও-দুটি কমল পায়॥

চণ্ডীদাসের আর একটি শ্রেষ্ঠ আত্মনিবেদনের পদ এই :

কি দিব কি দিব তোমা মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥

অভিসারের পদেও চণ্ডীদাসের বিশেষ কোন কৃতিত্ব নেই। এ পদে তিনি যেন নিছক গতানুগতিক। অভিসারের বিপদ-সঙ্কুল পথ-পরিক্রমার জন্যে যে দুর্জয় মনবল থাকা দরকার তা' চণ্ডীদাসের শ্রীমতীর নেই। অভিসারের পদে কল্পনা চলে না—চাই বাস্তবের সাথে সংগ্রাম। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধিকা সংগ্রামে নামেন না—মেঘ আঁধিয়ার রজনীতে আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে শ্যামের জন্যে চিন্তাকুল হ'য়ে ওঠেন :

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে অভিসারের পদেও চণ্ডীদাসের স্বভাবজ বিরহের সুর এসে সমগ্র পদটিকে যেন সকরুণ করে তুলেছে।

॥ ছয় ॥

॥ বিরহ ॥

আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বহুবার বলেছি চণ্ডীদাস বিরহের কবি। তাঁর বিভিন্ন রস পর্যায়ের পদে বিরহটাই বড় হয়ে উঠেছে। চণ্ডীদাস বেদনার কবি, বিরহের বাণীপূজক। বিরহটাই চণ্ডীদাসের কবি-মানসের স্বভাবজ। তবে চণ্ডীদাসের বিরহ কেবল দুঃখের নামান্তর নয়—এ বিরহের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এ বিরহ আনন্দের—ভগবানকে নিবিড়ভাবে পাওয়ার আনন্দ, তপস্যার নামান্তর। এই বিরহের পরম আনন্দের মধ্যদিয়েই শ্রীমতী পেয়েছেন শ্যামের সাহচর্য, অঙ্গের পরশ। অন্যকোন মহাজনের পদে বিরহটা কায়া বদল করে এ পর্যায়ে উঠ্‌তে পারেনি। বিরহের এ ভাবলোকে সুর বেঁধেছিলেন বলেই চণ্ডীদাস মিষ্টিক কবি হ'তে পেরেছেন, শ্রীমতীর পক্ষে অদ্বয় সত্য শ্যামকে পাওয়া সহজ হ'য়েছে। চণ্ডীদাসের বিরহের পদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এ বিরহে কোন জ্বালা নেই, বেদনা নেই। অন্যান্য মহাজনের রাধা বিরহে ক্রন্দনাকুল, ভূ-লুণ্ঠিত, শক্তিহারা—দুর্বল। চণ্ডীদাসের

রাধা বিরহের মাঝে আত্মশক্তি হারিয়ে বিহ্বল হননি—হ'য়েছেন দুর্জয়শক্তির আধার।

এবার বিরহের পদালোচনা। প্রতিটি পদ নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করতে গেলে মূল ভাবেরই পুনরাবৃত্তি হ'বে। তাই আমরা নিম্নে কয়েকটি বিরহের পদাংশ তুলে দিলাম:

"নিজ কায়াপর রাখিয়া কপোল মহা যোগিনীর পারা।
ও দু'টি নয়নে বহিছে সঘনে শ্রাবণ মেঘেরি ধারা॥"

"পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মনে কেন টানে গো॥"

"আসিবার আশে লিখিনু দিবসে খোঁয়াইনু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে দু আঁখি হইল অন্ধ॥"

"কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন ও দুটি নয়ন তারা।
হিয়ার মাঝারে পরাণ পুতুলি নিমিখে নিমিখ হারা।"

চণ্ডীদাস বেদনার কবি—তাঁর পদাবলীর ভিতর দিয়ে এই বেদনাই স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লাভ করেছে। মিলনের মাঝেও চণ্ডীদাসের রাধা-হৃদয় বিরহের ম্লান ছায়াপাতে কম্পমান, পূর্বরাগের সীমাহীন উচ্ছ্বাস ও আবেগের মধ্যে জেগে উঠেছে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের সকরুণ রেশ। চণ্ডীদাসের পদাবলীর সর্বত্রই এই বিরহ বেদনার ম্লান ছায়াপাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। দুখের দাহনে, বেদনার উত্তাপে, কামান্ধ প্রেমকে বিগলিত করে নতুন রূপে সঞ্জীবীত করাই চণ্ডীদাসের উদ্দেশ্য। ব্যথার গরল পান করে তিনি নীলকণ্ঠ। নদীর উপরিভাগের লীলা-চাঞ্চল্য তাঁর কাব্যে সেই সকল আবেগ, সকল উচ্ছ্বাস সংযত ও সংহত—দিগ-বিথার সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশের অতলস্পর্শ ধ্যানলীনতা তাঁর পদাবলীকে এক মহান বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বিশ্বকবির বাণী দিয়েই আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করবো। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনামূলক আলোচনায় চণ্ডীদাসের স্বরূপটি অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে: "বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন। চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি। চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয়—দুঃখের প্রতি অনুরাগ।"

॥ বিদ্যাপতি ॥

॥ এক ॥

॥ সাধারণ আলোচনা ॥

বিভিন্ন রসপর্যায়ের পদালোচনায় আমরা মহাকবি বিদ্যাপতি সম্পর্কে যে আলোচনা করব এখানে সংক্ষিপ্তাকারে সেগুলি বলে নিতে চাই। প্রথমতঃ পদাবলী বল্‌তে আমরা যে স্বর্গীয় প্রেমলীলাঙ্কনের কাব্য বুঝি বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদই (সমগ্র পদাবলী নয়) ঠিক সে পর্যায়ে পড়ে না। বিদ্যাপতি ছিলেন জীবনের চিত্রকর—জীবন-রসের চিত্রনই তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য। বয়ঃসন্ধি এবং পূর্বরাগের পদে বিদ্যাপতির এই জীবন-চিত্রণ-ধর্মিতা সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে। অপ্রাকৃত জীবনের নয়—প্রাকৃত জীবনের জয়গানই এখানে বিদ্যাপতির কণ্ঠের মুখ্য রাগিনী। চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদে যেখানে শ্রীমতী যোগিনী সেজে অপ্রাকৃত জগতের স্বর্ণ প্রতিমা হ'য়ে উঠেছেন—বসনে ধূলি মাথার চাপল্যে সেখানে বিদ্যাপতির রাধিকা হ'য়ে উঠেছেন মর্তেরই তন্বী কিশোরী, কবির মানস-প্রিয়া। এখানে রাধিকার 'দেহের ভাগ' অধিক।

চণ্ডীদাসের কাব্যে যে তদাত্মতাভাব দেখি বিদ্যাপতির পদাবলীতে তার অভাব লক্ষণীয়। চণ্ডীদাসের কাব্যে আছে আত্মবিভোরতা—বিদ্যাপতির কাব্যে আছে বস্তুবিভোরতা। তিনি বস্তুতে বিভোর হ'য়েছেন—কিন্তু আত্মা বিস্মৃত হননি। এই জন্যেই তাঁর কাব্যে 'কবি-ব্যক্তিত্ব' ফুটেছে সমধিক। তাই 'প্রাণ' অপেক্ষা 'ভংগীই' বিদ্যাপতির কাব্যে লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে। বর্ণিত বিষয়ের সাথে কবির আত্মার সর্বত্রই একটা ব্যবধান রয়ে গেছে। আত্মবিস্মৃতির জন্যে চণ্ডীদাসের কাব্য যেখানে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর—'কবি-ব্যক্তিত্বের' জন্যেই বিদ্যাপতির কাব্য সেখানে কলানিপুণ এবং অলংকার-সুষম।

বিদ্যাপতির কাব্য মণ্ডণকলা সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠার পিছনে আর একটি বড় কারণ রয়েছে। বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। কেবল রাজার নয় তাঁর পার্ষদগণের মনোরঞ্জন করাও ছিল বিদ্যাপতির লক্ষ্য। সরল অনাড়ম্বর

ভাবে কবির মনে ভাব 'যেমন ছিল তেমনি এসে' পল্লীর অশিক্ষিত জনগণের মনোরঞ্জন করতে পারে কিন্তু রাজা এবং রাজ-সভাসদগণের হৃদয়াকর্ষণ করার জন্যে চাই জৌলুষ, অলংকৃত বাক্-বিন্যাস। তাই বিদ্যাপতির কাব্যে 'আলোক' বেশী, হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানিতে তাঁর কাব্যের দিগন্ত বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত হ'য়ে গিয়েছে।

বিদ্যাপতির রাধিকার 'দেহের ভাগ অধিক' এবং তাঁর কাব্যে আলোক বেশী ইত্যাদি যে সাধারণ মন্তব্যগুলি করা হ'য়ে থাকে—এবং আমরাও তা করেছি—তা' সর্বাংশে সত্য নয়। বয়ঃসন্ধি এবং পূর্বরাগের পদে বিদ্যাপতির যে রাধিকার সাথে আমাদের পরিচয় হয় সে রাধিকার মধ্যে দৈহিক হিন্দোল এবং কটাক্ষের চাতুরালি প্রকাশ পেয়েছে সত্য কিন্তু অভিসারের বিপদ সংকুল বন্ধুর পথে পদাচারণা করে, বিরহের অন্তহীন উত্তাপে বিগলিত হ'য়ে এই রাধিকাই খাদ-শূন্য স্বর্ণপ্রতিমায় পরিণত হয়েছেন, দেহের ভাগের আধিক্য ঝরে যাওয়ায় ইনিই হ'য়ে উঠেছেন অপ্রাকৃত জগতের নায়িকা—পদাবলী সাহিত্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী। বিরহের পদগুলিতে শ্যাম-ব্যাকুল শ্রীমতীর কণ্ঠে যে সুর ধ্বনিত হ'য়েছে সে-সুরে কামনার এতটুকু গন্ধ নেই, দৈহিক চমকের আভাস নেই যে যেন পদাবলীর অন্ধকার রাজ্যের অস্পষ্ট কলতান।

বিদ্যাপতির রাধিকা সম্বন্ধে আর একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য। তাঁর রাধিকাকে বলা হ'য়েছে কমলিনী। চণ্ডীদাসের রাধিকার যৌবন সমাগমের দুর্লভ-বিরল মুহূর্তটুকু পাঠকের অগোচরেই সমাপ্ত হ'য়েছে। পাঠকের সাথে রাধিকার যখন পরিচয় হ'ল তখনই তিনি যোগিনী—কৈশোরের লীলা-চঞ্চল মনোরম ভংগীটুকু আর কারও দেখার সৌভাগ্য হল না। জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দ-দাসের রাধিকা সম্বন্ধে এ কথাই প্রযোজ্য। জ্ঞানদাসের রাধিকার কণ্ঠ তো প্রথম হ'তেই বিরহের ম্লান ছায়াপাতে কম্পমান। একমাত্র বিদ্যাপতিই রাধিকার অখণ্ড জীবন-প্রবাহকে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। বয়ঃসন্ধির চপল মুহূর্ত হ'তে তার সম্মিলন পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালটুকুতে বিদ্যাপতির রাধা ধীরে ধীরে কোরক হতে পূর্ণ যৌবন বিকশিত কমলিনীতে পরিণত হয়েছেন। কৈশোরের চপল-চাঞ্চল্যতা হতে বিরহের ধ্যান-গম্ভীর যোগিনী মূর্তি পর্যন্ত সকল পর্য্যায়ের স্থির চিত্র পাঠকের চিত্তপটে রেখাঙ্কিত হয়েছে। বিদ্যাপতির শ্রীমতী তাই সত্যই 'কমলিনী রাধা'।

আমরা প্রথমেই বলেছি বিদ্যাপতি 'জীবন-রসিক' কবি। তিনি জীবনেরই চিত্রকর। জীবন-চিত্রণে তিনি সার্থকাম শিল্পী। তাঁর রাধিকা তাঁরই মানস-প্রিয়া। তাঁর প্রিয়াই রাধিকারূপে কাব্যের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করে আছেন। এ রাধিকার মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, তাঁর অভাব-বেদনাগুলি আমূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি নিজেই যেন শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন —হয়ে শ্যামের অনুভূতি-আকুতিকে, বাসনা-ব্যঞ্জনাকে বাংময় করে তুলেছেন। এ জন্যেই শ্রীমতীর অন্তরের রহস্যঘন চিত্র অপেক্ষা শ্যামের মনোভংগীটুকু সার্থকতর গরিমায় বিকশিত। কিন্তু চণ্ডীদাস রাধা ভাবে ভাবিত হয়েছিলেন বলেই তার কাব্যে শ্রীরাধার মানসিক বিকাশটুকু অপূর্ব রূপাল্পনা-সমৃদ্ধ।

বিভিন্ন রসপর্যায়ে বিদ্যাপতি এত অধিকসংখ্যক সার্থক পদ রচনা করেছেন যে অন্য কোন বৈষ্ণব কবি তত সংখ্যক সুন্দর পদ রচনা করেছেন কিনা সন্দেহ। প্রায় সকল রস পর্যায়ের পদ বিদ্যাপতির প্রতিভা-স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তবুও সকল কিছু মিলিয়ে চণ্ডীদাসের পদাবলীই হয়ত আমাদের ভাল লাগে সমধিক—কেননা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বাঙালী মানস-প্রবণতাটুকু অপূর্ব ব্যঞ্জনালোকে বাক্-বদ্ধ হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলার সুকোমল পরিবেশের সাথে বিরহের একটি আত্মিক যোগ আছে। চণ্ডীদাসের পদ সেই বিরহেরই বাণী-বন্দনা।

এরপর বিদ্যাপতির পদাবলীয় বিভিন্ন রসপর্যায়গুলির আলোচনা।

॥ দুই ॥

॥ বয়ঃসন্ধির পদে বিদ্যাপতি ॥

অর্ধ-শৈবালাচ্ছন্ন শিলাখণ্ডের সাথে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ তাঁর বিখ্যাত নায়িকা লুসির রূপ-বর্ণনা দিয়ে উচ্চশ্রেণীর শিল্পমনেরই পরিচয় দিয়েছেন। মনোহরের স্বরূপই এই—অর্ধপ্রকাশ এবং অর্ধ গোপনেই তার চরম বিকাশ। পূর্ণ বিকাশ মনোহর নয় পূর্ণ গোপনও সৌন্দর্যের অমরাবতীতে অবগাহন করার স্পর্ধা রাখে না। আলো-আঁধারের মিলন-লীলায় সুন্দর মনোহর হয়ে ওঠে, মধুর মধুরতম হয়ে আমাদের চিত্তকে হরণ করে। বয়ঃসন্ধির দুর্লভ-বিরল সময়টুকু মানব-জীবনের এই মধুরতম সত্তা-উপলব্ধির চরম ক্ষণ। এই 'দুর্লভ সময়টুকুতে

কৈশোর যৌবনের আলোআঁধারির মাধুরিমায় জীবনের সকল কিছু মধুরতম-মনোহরের পটভূমিকায় বিকশিত হয়ে ওঠে। বয়ঃসন্ধির সময়টুকু মানব-জীবনের সর্বাপেক্ষা অস্পষ্ট এবং রহস্যময়-মুহূর্ত—একদিকে আছে রোমাঞ্চ-রঙীন অসীম পুলক-বন্যা অন্যদিকে আছে অজানিতের প্রতি ব্যাকুল-মোহ। কি যেন নতুন মোহ, অভিনব ভাবোল্লাস নিখিল প্রাণ-মূলে শিহরণ-আলোড়নে উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ছে অথচ দেহ-বল্লীর সবেমাত্র নব-ফাল্গুনের হিমেল হাওয়ায় কম্পমান। হৃদয়-কুসুমও এখানে মুকুলিত হয়ে ওঠেনি—বৃতির বন্দীশালায় এখনো সে যে আবদ্ধ। বয়ঃসন্ধির সময়টুকু তাই মানব জীবনের হাসিকান্নার লীলায় মধুর, আনন্দ-বেদনার আলোক-পাতে অভিনব। "কৈশোরের চাঞ্চল্য মথিয়া যৌবন আসিতেছে, দেহমনে কী তাহার উল্লাস, অথচ কতই বেদনা।"

নিজেকে নানাভাবে বিকশিত করে দেখার দুর্বার ইচ্ছাই বয়ঃসন্ধির অন্তরধর্ম। অথচ স্বভাবসুলভ লজ্জার শঙ্কিত-শাসন পদে পদে আবরণের সৃষ্টি করে। দিবসের অত্যুজ্জ্বল আলোকে দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দেখা সম্ভব হয় না—নিশীথের নির্জন কক্ষে ক্ষীণ দীপালোকের সম্মুখে মুকুরের মর্মরে চলে আপন-আত্মার শঙ্কাতুর অভিসার। এই শঙ্কাতুর অভিসার, এই আনন্দ-বেদনার কথা, এই হাসিকান্নার দুর্লভ মুহূর্তটুকু অভিনব আলোকে ব্যঞ্জনায়িত হয়ে উঠেছে বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি-মূলক পদরাজীতে।

বিদ্যাপতি ছিলেন জীবন-রসিক। প্রবহমানজীবনের রসকেই তিনি আকণ্ঠ পান করেছেন। এখানে তিনি সার্থকাম শিল্পী। অবশ্য বহির্জীবনের ব্যাকুলাবেগ এবং হৃদয়-ধর্মকে যে তিনি তাঁর কাব্যের মধ্যে আহ্বান করেননি সে মন্তব্য ঘোষণার দুঃসাহস আমাদের নেই। অসীমলোকের ব্যঞ্জনা তার কাব্যে নিবিড় হয়ে ধরা দিয়েছে, হৃদয়াবেগের সাধন-ধারায় বহির্জীবনের বিরল-সৌন্দর্য তাঁর কাব্যকে মনোহর করে তুলেছে—তথাপি বয়ঃসন্ধির পদে বিদ্যাপতি মনোধর্মী জীবন-রসিক কবি। এই অনন্ত জীবন-রস-পিপাসা তাঁকে রূপ-মুগ্ধতার কবি করে তুলেছে। বয়ঃসন্ধির পদে এই রূপ-বিভোরতাই শত ভাব ব্যঞ্জনাই আভাসিত। এই সমস্ত পদসমূহের মধ্যদিয়ে সাম্যময়ী সদাচঞ্চল যে রাধার সাথে আমরা সহসা মুখোমুখী হয়ে পড়ি সে রাধা বৃন্দাবনের নীরব কুঞ্জান্তরাল হ'তে আসেননি, শ্রীকৃষ্ণের নিবিড় বাহু-পাশেও

তাঁকে দেখা যায় না—তিনি বিদ্যাপতির মানস-প্রিয়া। একেবারে মানবীর রূপ ধরেই তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। মানবিকতার অকুণ্ঠ বিজয়-ঘোষণা এই রাধিকার মধ্য দিয়েই বিদ্যাপতি আপন কাব্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। একজন সাধারণ নারীর মধ্যে নবযৌবনোদ্গমের মধুর মুহূর্তে দেহে এবং মনে যে লক্ষণসমূহ অনিবার্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে এই মানবী-রাধার মধ্যে সেই বাস্তব অবস্থার একটি লক্ষণও বাদ পড়েনি। বয়ঃসন্ধির রাধা তাই বিদ্যাপতির সৌন্দর্য-সাধনার মানসী-প্রতিমা।

বিদ্যাপতির রাধা নবীনা বালিকা, নবস্ফুটা কিশোরী। তাঁর কপালে এখনো 'কাঁচপোকা টিপ', 'রাগ অভিমান কাঁদাকাটা হাসি' এখনো সারাবেলা তাঁর অঙ্গভূষণ। তবুও এই কিশোরী রাধিকার দেহবল্লরী ঘিরে অরূপ-যৌবনের ঝড় উঠেছে, দেখা দিয়েছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে নবযৌবনোদ্গমের প্রবল বেগ :

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন॥
আবে মদন বঢ়ায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকী দেল পীঠ॥

নবযৌবনের চকিত স্পর্শে শৈশব-দেহের সব কিছুই চমকিত হ'য়ে উঠে। শৈশব স্থির হয়ে থাক্‌তে চায়—দীপ্ত-তেজ-যৌবন তাকে পরাজিত করতে বদ্ধকরিকর। এক দিকে শৈশব-স্রোতস্বিনীর কুলকুল ধ্বনি—অন্যদিকে যৌবন-মহাসমুদ্রের দূরাগত কল্লোল। ফলে কিশোরী রাধিকার দেহে শৈশব এবং যৌবনের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে :

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দলবলে দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসুর মন্তব্য বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য : "শৈশবের মন আর যৌবনের মন, শৈশবের দেহ আর যৌবনের দেহে দ্বন্দ্ব পড়িয়া গিয়াছে। এ চঞ্চল দেহের সহিত চঞ্চল মনের বিরোধ কী অল্প? কোথাও দেহ যৌবনের দুয়ারে আঘাত করিয়াছে, মনের তন্দ্রা ঘুচে নাই। আবার কোথাও দেহ অবিকচ কমলকোরকের মতই সৌরভ সুপ্ত অথচ তাহাকে ঘিরিয়া যৌবন-মধুকর গুন্‌গুন্ করিয়া ফিরিতেছে। কবি এ সকলই দেখিয়াছেন, দেখিয়া বিভোর হইয়াছেন। সে বিভোরতা আত্মবিভোরতা

নয়, বস্তুবিভোরতা, তাহা একান্তই তন্ময় রসদৃষ্টি। তাই শ্রীরাধিকার সৌন্দর্য-সন্ধির মধ্যে পথ হারাইয়াও কবি কোথাও মন হারান নাই।"

এই মন না-হারানোর কথা, রূপদক্ষ শিল্পীর এই রূপমুগ্ধতার কথা আর একটি পদে সুন্দর হয়ে ফুটেছে। সচেতন মনের কল্পনা-ঐশ্বর্যে এবং রেখাঙ্কনের বর্ণগরিমায় কবিতাটি বিরল-মনোহর। কৈশোর-যৌবনের স্বপ্ন-মন্থর রঙীন দিনগুলির আবেশ-বিহ্বল-মুহূর্ত কবিতাটির মর্মমূলে জীয়নকাঠির স্পর্শ বুলিয়েছে :

খনে খনে নয়ন কোণ অনুসরঙ্গ।
খনে খনে বসন-ধূলি তনু ভরঙ্গ॥
খনে খান দশন-ছটা ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥...
হিরদয়-মুকুল হেরি হেরি থোর।
খনে আঁচর দএ খনে হোয় ভোর॥

দেহে এখন শৈশব-যৌবনের সমান অধিকার। "সরল আঁখির কোণে কটাক্ষের চতুরতা অথচ বসনে ধূলি মাখিবার চাপল্য। প্রাণের সহজ আবেগে হাসির ঝলক উঠিতেছে কিন্তু তাহাকে সংবরণ করার কতনা প্রচেষ্টা এতো। নিঃসন্দেহে যৌবন-সমাগমের প্রাতঃকৃত্য।"

বয়ঃসন্ধির নবীন আলোকপাতে হৃদয়ে যে ভাবোল্লাস জেগেছে, মনের উপলে যে চপল চিন্তার নৃত্য চলেছে বিদ্যাপতি চিত্রের পর চিত্র দিয়ে তা' অতি স্পষ্টরূপে আমাদের সাম্‌নে তুলে ধরেছেন। রাধার দৈহিক পরিবর্তনের ন্যায় দ্রুত মানসিক পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। মুগ্ধা রাধিকার সকল সংকেত এখন রাধিকার মধ্যে সুস্পষ্ট। খেল্‌তে খেল্‌তে যে রাধার খেলা বন্ধ হয় :

খেলত ন খেলতদ লোক দেখি লাজ।
হেরত ন হেরত সহচরী মাঝ॥

সেই রাধাই এখন প্রেম-বাণী শ্রবনের জন্যে সখীপরিবৃতা, গুরুজনবেষ্টিতা হয়েও সচকিত হরিণীর মত উৎকর্ণ হ'য়ে ওঠেন :

শুনইতে রসকথা থাপয় চিত।
জইসে কুরঙ্গিনী শুনয়ে সংগীত॥

নির্জন বনান্তরালের পথে দ্রুত-ধাবমান হরিণী হঠাৎ থেমে গেছে। দূর নেপথ্যলোক হ'তে সুমধুর সংগীত-মূর্চ্ছনা ভেসে আস্‌ছে সদা-চঞ্চল-হরিণী সবুজ পত্র-পল্লবের অন্তরালে দাঁড়িয়ে চকিত চাহনি মেলে সমগ্র অন্তঃসত্তাকে

সেইদিকেই উৎকর্ণ করে দিয়েছে। চঞ্চলতার মধ্যে হঠাৎ-থামা হরিণীর এই মনোরম দুর্লভ ভংগীটুকু রসালাপ শ্রবনেচ্ছু কিশোরী রাধার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাকে কী মধুর ভাবেই না উপস্থাপিত করেছে। এখানে হরিণীর সুবঙ্কিম ভংগী এবং রাধার হৃদয়াবেগ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বয়ঃসন্ধি রাধার মানসিক পরিবর্তন-স্বরূপের এই তো মহিমাময় উজ্জ্বল স্বর্ণালেখ্য।

শৈশবের সুকোমল দেহ ঘিরে নবযৌবনের প্রণয়োল্লাস ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠ্‌ছে—এই ক্রমবর্ধমান লাবণ্য-শ্রী ও অঙ্গ-সুষমার কাছে অবশেষে শৈশবের পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠ্‌লো। যে উদ্দাম গতিবেগ নিয়ে যৌবন-জোয়ার এগিয়ে আস্‌ছে সে দুকূল-প্লাবী দুরন্ত বন্যার সম্মুখে দাঁড়াবার শক্তি শৈশবের কই? অবশেষে শৈশব গেল—এল যৌবন:

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন লেল॥

কৈশোরের প্রান্তিক-সীমা রেখায় দাঁড়িয়ে একদিন যৌবন-আহ্বানের যে নকীবী-কণ্ঠ সরব হয়ে উঠেছিল আজ তা' সফল হ'লো। বয়স এখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধি-পর্ব অতিক্রম করে যৌবনের বিপুল সাম্রাজ্যে করেছে পদ-সঞ্চার।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বয়ঃসন্ধিমূলক পদে বিদ্যাপতি শ্রীরাধার যে চিত্র রূপোজ্জ্বল রেখাঙ্কনে বিধৃত করেছেন তা' ধুলি-মাটি-মাখা মর্তেরই এক মানবীর মূর্তি। শ্রীরাধার নামোচ্চারণে আমাদের অন্তরপ্রদেশে যে সুনির্মল যূথিকা-শুভ্র ধ্যানসমাহিত মূর্তি ভেসে ওঠে এ রাধা সে রাধা নয়। এ রাধা কমলিনীর মত সবেমাত্র বিকাশোন্মুখ। জীবন-রসিক-শিল্পীর রূপ-মুগ্ধতায় এ রাধা মানবীয় দেহ-মনের সার্থক রূপায়ণ। এই রাধার সারা অঙ্গে মানবীয় বুদ্ধি-দীপ্তি ঝলকিত হয়ে উঠেছে। বয়ঃসন্ধির রাধিকা-অঙ্কনে রাজসভার কবি বিদ্যাপতির নিকট এই বাস্তব-বোধ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিই ছিল প্রধান সম্বল। এবং এই পর্যায়ের কবিতা-রচনাতে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই যে তিনি এই বাস্তব-বোধ এবং বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিতে আপন প্রতিভাবলে মণ্ডণ-কলানিপুণতায় অপরিসীম রসলোকে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন—বুদ্ধির পীড়নে শাসিত হয়ে তা' বাস্তবতার দিগন্তে গুম্‌রে মরেনি।

॥ তিন ॥

॥ কলাকুশলী বিদ্যাপতি ॥

সাহিত্যের কতকগুলি আপেক্ষিক গুরুত্ব-সমৃদ্ধ অমীমাংসিত প্রশ্নের মত কাব্য কী এই প্রশ্নটিও সাহিত্য-রসপিপাসু সুধীজনের এক চিরন্তন জিজ্ঞাসা। স্মরণাতীত অতীতকাল হ'তে এই প্রশ্নটিকে নিয়ে স্বদেশ-বিদেশে কালে কালে যুগ-যুগান্তে নিখিলবিশ্বের পণ্ডিত-মহলে বিরামহীন গতিতে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বয়েই চলেছে—কিন্তু আজ পর্যন্ত মীমাংসার বাণী শোনা যায়নি। যাবে কীনা সন্দেহ। কিন্তু মীমাংসার সারবত্তা না পেলেও আমরা বিবাদমান উভয়দলের মতামত নিয়ে বল্‌তে পারি কাব্য হ'লো ভাবময় বাণীর ছন্দোবদ্ধ রস-রূপায়ণ। কাব্যের প্রাথমিক উপাদান দুটি—শব্দ ও অর্থ। এই দু'টি উপাদানকে নিয়ে কবি যখন আপন প্রতিভাবলে শ্রীক্ষেত্রের মহাসম্মিলনে মিলিত করেন তখনই শিথিল প্রযুক্ত শব্দ ও অর্থ কাব্যের অপূর্ব লাবণ্য-শ্রী ধারণ করে। সুতরাং কাব্য হলো 'কবি-বাঙ্‌-নির্মিত' কাব্যরূপের প্রাসাদ। এই প্রাসাদ নির্মাণের ক্ষুদ্রতম অনু হ'লো 'বাক্'। সাধারণ 'বাক্' বা 'শব্দ' যখন রূপের মধ্যে সাধারণ অর্থ যখন রসের মহলে অবাধ প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পায় তখনই ছন্দবদ্ধ ভাবের মধ্যে আসে অশ্রুত রাগিনী। এই অশ্রুতরাগিনীই কবিতার প্রাণসম্পদ। সাধারণ শব্দ যখন অলংকারে সজ্জিত হয়, সাধারণ অর্থকে যখন কবিকুল রম্যার্থ করে তোলেন তখনই এই শব্দ ও অর্থের মধ্যে আসে রূপ-রসের অশ্রুত ঝংকার। তাই কাব্যের প্রসঙ্গ নির্ণয়ে অনিবার্যরূপে দিতে হয় অলংকারের গৌরব, বুদ্ধির সম্মান এবং অর্থের শিরোপা। বিদ্যাপতির কাব্যে এই সবক'টির সন্ধান মেলে। বিদ্যাপতির কাব্যে 'শব্দ ও অর্থের বিদ্যুৎ-চমক' আমাদের নয়নযুগলকে ঝলসিত করে। তিনি শিল্প-চাতুর্য এবং শব্দ-সংগীত মূর্চ্ছনা সৃষ্টিতে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের যথাযথ প্রয়োগে তাঁর কাব্য দুষ্প্রাপ্য-মনোহর হয়ে উঠেছে। 'রম্যবোধ এবং রম্যার্থের পথে' তিনি অনন্যদুর্লভ কবি-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

কাব্যে মণ্ডণকলানিপুণতা দেখাবার কয়েকটি স্বাভাবিক এই অধিকার ছিল মিথিলার কবি বিদ্যাপতির। তিনি ছিলেন তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিবান বংশের উত্তরাধিকার, নিজেও শিক্ষিত এবং সুপণ্ডিত,

অলংকার-সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, সর্বোপরি তিনি ছিলেন রাজসভার কবি। স্বভাবজ মানস-ভংগী এবং পরিবেশ-শাসিত এই রুচি-নিষ্ঠা—এই উভয়ের প্রভাবেই তাঁর কাব্য নিয়তির মত অনিবার্য কারণে কলা-মণ্ডণ-সমৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। আধুনিক সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয়ের বাণীতে বিদ্যাপতির কাব্যে এই অলংকরণের কারণটি সুন্দররূপে বিধৃত হয়েছে।

চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি এই উভয় কবির কাব্যপরিবেশ-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "একজন বাশুলী মন্দিরের পূজারী। বনচ্ছায়ামণ্ডিত নির্জন গ্রাম্য মন্দিরের চূড়া বাহিয়া শেষ দিনলেখাটুকু নামিয়া গেল। সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিল; প্রদীপের ক্ষীণ সলিতাটুকু উস্‌কাইয়া এক গ্রাম্য কবি গান বাঁধিতেছেন। আপন মনেই গাহিতেছেন—তিনিই চণ্ডীদাস। সন্ধ্যা নামিয়াছে আর এক দিগন্তে; তাহা গ্রাম নয়, নগর। রাজসভার কলমুখরিত প্রাঙ্গণে ঝাড়-লণ্ঠন একের পর এক জ্বলিয়া উঠিয়া রোশনাই ফেলিয়া দিয়াছে। রাজকবি আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কি ঐ গ্রাম্য পুরোহিতের মত কেবল আপন অন্তরের দিকে তাকাইয়া গান ধরিবেন, তাঁহার কাব্যে কি কেবল প্রদীপটুকু স্নিগ্ধ হইয়া মৃদু আলোর শান্তিটুকু বিকিরণ করিবে, না তাহাতে হাজার তারার বাতি, আলোর উল্লাস। চণ্ডীদাসের কাব্যে আঁধার বেশী, বিদ্যাপতির কাব্যে আলোক।"

এরপর আর অধিক বক্তব্যের প্রয়োজন নেই। এখন বিদ্যাপতির কয়েকটি অর্থ-অলংকার গৌরব-ভূয়িষ্ঠ পদের আলোচনা করে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের একটি পদে উপমা-উৎপ্রেক্ষার অভিনব প্রকাশ ঘটেছে। পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আকস্মিকভাবে শ্রীরাধার দর্শন লাভ করেছেন। এমন আকস্মিক যে প্রস্তুতির সময় ছিল না—এমন কী আত্মরক্ষারও অবসর মেলেনি। হঠাৎ শ্রীরাধার আবির্ভাব। সে রূপ 'ভাল করি পেখন ন ভেল'—তবুও তাই বজ্র-শেলের মত নিক্ষেপিত হয়ে হৃদয়কে বিধ্বস্ত করে গেল:

> মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু
> হৃদয়ে শেল দেই গেল।

মেঘমালা ও তড়িতের মাধ্যমে শ্রীরাধার রূপ কী অপরিসীম দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

পিপীলিকার পাখাগজান এবং অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ার সেই সর্ব পুরাতন কথাটি বিদ্যাপতির কবিতায় একেবারে সর্বআধুনিক হয়ে উঠেছে :

পিপড়ী কা জাএো পাঁখি জনমএ
অনল করএ ঝপান।
ছোটা পানী চহ চহ কর পোঠী
কে নহি জান॥

রাধার নব-যৌবন-সম্ভরা পূর্ণাঙ্গ রূপকান্তির বর্ণনায় অলংকারের অপূর্ব-দীপ্তি শত ভাব ব্যঞ্জনায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। কবির কথায় :

পীন পয়োধর দুবরি গতা।
মেরু উপজল কনক লতা॥

'তন্বী দেহের আকৃতি, পয়োধর পীন, যেন পর্বতে স্বর্ণলতা উৎপন্ন হলো।' এ কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব-সত্যকে ব্যাখ্যা করে বোঝান যাবে না—এই বাক্যের অন্তরালবর্তী রূপৈশর্য একান্তভাবে অনুভব সাপেক্ষ।

'কুলবতী ধরম কাঁচ সমতূল' কিংবা 'যে পতিপালক সে ভেল পাবক' ইত্যাদি অতিক্ষুদ্র পদের মধ্যেও বিদ্যাপতির অলংকার-প্রয়োগ নিপুণতা অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

আর একটি ছোট উদ্ধৃতি এই :

চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।

অথচ এর ধ্বনিময়তাকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে আমরা আর একটীমাত্র উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে গমন করবো। গোধূলির আলো-আঁধারীর স্বপ্ন-রঙীন মুহূর্তে রাধা মন্দির হতে বেরিয়ে পথে নেমেছেন—এই অনন্যসুন্দর মুহূর্তটি কবির কল্পনায় কী অপরূপভাবেই না বিধৃত হয়েছে :

জব গোধূলি সময় বেলী
ধনি মন্দির বাহর ভেলী
নব জলধর বিজুরি রেহা
দন্দ পশারিয় গেলি।

গোধূলির ধূসর আবীর-রাঙানো পথে মন্দির হ'তে নিষ্ক্রান্ত শ্রীরাধার পদসঞ্চার যেন নবজলধরে বিজুলী-রেখার মত চকিতে নিখিল-ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো। শ্রীরাধার মনোহর রূপের এই যে ব্যঞ্জনগর্ভ প্রকাশ—অন্য কোন্ উপমার আশ্রয়ে

ঠিক এমনভাবে বিকশিত হবে? এইখানে বিদ্যাপতির সাথে সংস্কৃত সাহিত্য-সম্রাট কালিদাসের কথা আমাদের মনে পড়ে। এ কবিতার ভাস্কর্য-সুঠাম অলংকার-দীপ্তিতে কবি যেন অনাদি রূপ-স্রোতের আদিম উৎস-মূলটির দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন। সামান্য দুটি কথা—'নব জলধর' এবং 'বিজুরি রেহা' অথচ কী দুর্বার তার শক্তি, কী অমোঘ তার আকর্ষণ! শব্দৈশ্বর্যের গৌরবে, অলংকারের ব্যঞ্জনায় এ কবিতা নিখিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

॥ চার ॥

॥ পূর্বরাগ ॥

বয়ঃসন্ধির পদে বিদ্যাপতি দ্বিতীয়রহিত। কিন্তু বয়ঃসন্ধির পদে তিনি যে অপরিসীম কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, পূর্বরাগের পদে সে পরিচয় নেই। তবুও পূর্বরাগের পদে বিদ্যাপতির যে কবি-ব্যক্তিত্বের চিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে তা'র মাধুর্যটুকু কোনক্রমেই উপেক্ষনীয় নয়। বয়ঃসন্ধি-পদের লীলা-চাপল্যের মত পূর্বরাগের পদেও নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে প্রথম প্রণয়ের অজানিত আনন্দ-উচ্ছ্বাস অপরিসীম পুলক-শিহরণ। গহন মনে রয়ে রয়ে যে অজানিত সুদুর্লভ প্রণয়াবেগ জেগে উঠ্‌ছে রূপদক্ষ কবির বর্ণবহুল তুলির বহু-বিচিত্র রেখাঙ্কনে তা' সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে বিদ্যাপতির পূর্বরাগ-পদ সম্পর্কে একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণীয় এই যে কবি শ্রীরাধার পূর্বরাগ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগটি অঙ্কিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ-পদ সম্পর্কে একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণীয় এহ যে কবি শ্রীরাধার পূবরাগ অঙ্কনের প্রতি কবির অনুরাগ বেশী। কবি যেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয়ে নব-যৌবন-সম্ভাবা শ্রীরাধার রূপ-সুন্দর দেহ-কান্তি অবালাকন করেছেন, করে মুগ্ধ হয়েছেন—সেই মুগ্ধ চিত্তের ভাবটি অভিনব রূপে রূপায়িত হ'য়েছে তাঁর পদাবলীতে। 'জব গোধূলি সময় বেল, ধনি মন্দির বাহর ভেলী'···ইত্যাদি সুবিখ্যাত পদটি শ্রীরাধার অনন্য সুন্দর রূপ-লাবণ্য দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের মুগ্ধচিত্তের ব্যাকুল আর্তিরই প্রকাশ। কিংবা 'মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল' পদটিও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগেরই অন্তর-বেদনায় রঙীন। শ্রীরাধার চলার ভংগীটিও কৃষ্ণের মনে গভীর রেখাপাত করেছে:

গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পলটি নেহারি।...
চরণে যাবক হৃদয় পাবক
দহই অঙ্গ মোর॥

যে অর্থে বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদ সুন্দর সেই অর্থে পূর্বরাগের পদ সুন্দর। এ দুই ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকা 'উভয়েরই দেহের ভাগ অধিক।' বয়ঃসন্ধির পদে আমরা দেখেছি কবির রূপবিভোরতা আছে কিন্তু আত্মবিস্মৃত ভাব নেই। পূর্বরাগেও ঠিক তাই। এখানেই কবি শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি দিয়ে শ্রীরাধার রূপ দর্শন করেছেন কিন্তু রূপদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের মত আত্মবিস্মৃত হয়ে যাননি। চণ্ডীদাস যখন শ্রীরাধার পূর্বরাগের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন "জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো" তখন মনে হয় চণ্ডীদাস স্বয়ং শ্রীরাধায় পরিণত হয়ে গেছেন। শ্যামের মধুময় নাম যপ করতে করতে স্বয়ং চণ্ডীদাসের দেহমন অবশ হয়ে গেছে। কিন্তু বিদ্যাপতির পূর্বরাগের মধ্যে এই একাত্মতা ভাব নেই। বর্ণনীয় বিষয়ের সাথে কবিমনের যেন শঙ্কিত ব্যবধান বিরাজমান। এই পর্যায়ের পদে চণ্ডীদাস দিয়েছেন হৃদয়ের প্রাধান্য, কিন্তু বিদ্যাপতি হৃদয়ের প্রাধান্য না দিয়ে, ভাবগভীরতার অসীম সমুদ্রে অবগাহন না করে কলা-মণ্ডণতাকেই (art form) প্রধান করে তুলেছেন। তাই চণ্ডীদাসের পদ যখন শ্যাম-নাম শ্রবনের মত আমাদের হৃদয়লোক স্পর্শ করে তাকে অবশ করে দেয় তখন বিদ্যাপতির পদ তাকে স্পর্শ করলেও কোন আলোড়ন তুল্‌তে পারে না। এই পর্যায়ের কবিতার হৃদয়াবেগ প্রধান না হওয়ায় নানা ঘটনার মধ্যদিয়ে কবির চিত্র-ধর্মীতার অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। শ্রীরাধা এবং কৃষ্ণের রূপ-বিকাশ লক্ষণের দুর্লভ অবসরও তাই তিনি পেয়েছেন।

॥ পাঁচ ॥

॥ বিদ্যাপতির কাব্যে সুর-পরিবর্তন ও অভিসার ॥

কিন্তু পূর্বরাগের পর অভিসারের পদ হতেই বিদ্যাপতির কণ্ঠে লেগেছে নতুন সুরের দোলা। এই সর্বপ্রথম বিদ্যাপতির রাধার অন্তরে নব বরষার সজল মেঘমালার মত অসীম আনন্দ-বেদনার নীরব পদসঞ্চার ঘটেছে। কবি এতদিন রূপের অন্দর মহলে আবদ্ধ ছিলেন এবার অসীম রসলোকের দ্বার তাঁর সম্মুখে উন্মুক্ত হলো। অসীম আকাশের ব্যাকুল মাতামাতিকে তিনি

এবার হৃদয়ের গবাক্ষ পথ দিয়ে অন্তরলোকে আহ্বান করলেন। যে চিরন্তন ব্যথা-বেদনার পূরবীর সুরে চণ্ডীদাসের কাব্য বিরল-সৌন্দর্যের প্রতীক—সেই সুর-ই নেমে এলো বিদ্যাপতির কাব্যে। এতদিন যে রাধার মধ্যে 'দেহের ভাগ অধিক' ছিল অভিসারের দুর্জয় আত্মবিশ্বাস, অপরিসীম কৃচ্ছ্র সাধন এবং অনুরাগ-রঙীন-শঙ্কাতুর পদক্ষেপে সেই রাধাই প্রাকৃত দেহের অন্তরালে অধ্যাত্মব্যঞ্জনাময় স্বর্ণনায়িকা রূপে রূপায়িত :

বরিস পয়োধর ধরণী বারি ভর
রয়ণী মহাভয় ভীমা।
তইও চললি ধনী তুঅ গুণ মনে গুণি
তসু সাহস নাহি সীম॥

কিংবা :

গুরুজন নয়ন অন্ধ করি আওল
বাঁধব তিমির বিসেখ।
তুঅ উর ফুরত বাম কুচ লোচন
বাহু মঙ্গল করি লেখ॥

গহন সত্তাব্যাপী অনুরাগের তীব্রতার সাথে সাথে রাধার আশঙ্কা, লোকভয়, কুলবতীর লজ্জা ক্রমান্বয়ে তিরোহিত হতে লাগলো, অভিসারের পদে তাই শুনি শঙ্কাহীন রাধার শপথ বাণী :

কুলবতী ধরম করম ভয় অব সব
গুরু-মন্দির চলু রাখি।

শঙ্কাহীন চিত্তের অনুরূপ ঘোষণা পাই আর একটি পদে :

সখি হে আজ জাএব মোহী।
ঘর গুরুজন ডর ন মানব
বচন চুকব নহি॥
চাঁদনে আনি আনি অঙ্গ লেপব
ভূষণ কএ গজমোতি।
অঞ্জন বিহুন লোচন জুগল
ধরত ধবল জোতী॥
ধবল বসনে তনু ঝপাওব
গমন করব মন্দা।
জইও সগর গগনে উগত
সহসে সহসে চন্দা॥

অভিসারের ক্রমপর্যায়গুলি বিদ্যাপতির কবিতায় অভিনব হয়ে উঠেছে। 'অচিন পথে প্রিয়-সঙ্গম-যাত্রায় প্রথমে আশঙ্কা, তার পর সাহস, মিলনের জন্যে তীব্র-ব্যাকুলাকাঙ্খা বিদ্যুৎ-ক্ষরা শ্রাবণ নিশীথে দুর্যোগ-ভেদ করে সঙ্কেতস্থানে গমন এবং সর্বশেষে নির্ভয়ে শঙ্কাহীনচিত্তে জ্যোৎস্না-অভিসার।' অবশ্য অভিসারের পদে এই বহুবিচিত্র বর্ণনা থাক্‌লেও তা' যে গোবিন্দদাসের অবিস্মরণীয় অভিসার-পদের সাথে তুলনীয় হবার যোগ্যতা রাখে এমন কথা বলার দুঃসাহস আমাদের নেই।

॥ ছয় ॥

॥ বিরহ ॥

অভিসারের পদের পর বিরহের পদ। এই পদসমূহে অভিনব কলাকৃতির সাথে অসীম অন্তরাবেগ এক হয়ে মিশেছে। বিদ্যাপতির কমলিনী রাধিকা সেই সুদূর অতীতের বয়ঃসন্ধি হ'তে অল্পে অল্পে মুকুলিত হ'তে হ'তে এখন অপরিসীম বর্ণগরিমায় পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছেন। দেহের ভারে আর তিনি উচ্ছল নন, লীলা-চাপল্য তাঁর ঘুচে গেছে—এখন হ'তে সুরু হয়েছে বিরামহীন ক্রন্দনের সুর-ঝংকার। শ্যামের সাথে মাত্র কয়েকদিনের মিলন—কিন্তু সেই মিলন-মহিমায় চিরসুন্দর দিনগুলি পলকে কোথা হতে অন্তর্হিত হয়ে গেছে—অতৃপ্ত হৃদয়-মনে কেবল তাদের স্মৃতি-চিহ্নই পড়ে আছে। বিরহের অপরিসীম পাথারে শ্রীরাধার অন্তর্বেদনা যেন স্বর্ণকমলের মত ফুটে উঠেছে। আজ মাধবের কথা অনুখন স্মরণ করতে করতে সুন্দরী নিজেই মাধবে রূপান্তরিত হয়েছেন :

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলী মাধাঈ।

নবযৌবন বিরহের বেদনায় ম্লান—পিপাসায় কণ্ঠ-কাতর, সিন্ধু নিকটেই অথচ তৃপ্তির পথ কই ?

ঈ নব-যৌবন বিরহে গমায়ব
কি করব সো পিয়া-লেহে॥
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা॥
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥

মর্ম বিদীর্ণ এই যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস, হৃদয়ভেদী এই যে বেদনাতুর হাহাকার— এর মাঝে 'দেহের ভাগ অধিক' বল্‌তে আমরা কোন মতেই রাজী নই। এযে মধ্যাহ্নের বিরল-নিস্তব্ধতায় পত্র-পল্লবে 'আছাড় খাওয়া বিরহী-সমীরণের মর্মরিত দীর্ঘ শ্বাস!

শ্রাবণের আকাশ ঘিরে সজল মেঘলার নীরব পদসঞ্চারে নিখিল বিশ্ব স্তব্ধ হ'য়ে উঠেছে। তার উপর গভীর নিশীথের নিকষ ঘন অন্ধকারের প্রলেপ। অবিরাম বাদলের ধারা ঝরছে—বন-বনান্তরালে সেই অবিশ্রান্তধারা সংগীত মূর্চ্ছনায় বেজে উঠ্‌ছে। তিমির দিগ্‌ভরা ঘোর যামিনীর গভীর বাদল মেঘমালার উপর বিজলী রেখা :

তিমির দিগ্‌ ভরি ঘোর যামিনী
অথরি বিজুরিক পাঁতিয়া।

এর পরে দূর বিলের জলা-ভূমি হ'তে ডাহুকীর ডাক, জলাশয়ে মত্ত দাদুরী সর্বোপরি বনান্তরালে ময়ূরের উন্মত্ত নর্তন সকলে মিলে বিরহী রাধার চিত্তে বজ্র-শেল নিক্ষেপ করছে। চারদিকে মিলনের সমারোহ, চারদিকেই প্রেমের গুঞ্জরণ, প্রিয়-প্রিয়ার আবেশ-বিহ্বল মধুরক্ষণ :

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া ॥
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥

এমন নীরব নিশীথে, 'এমন ঘনঘেরা বরিষায়' রাধার মন প্রিয়-সঙ্গমের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, এ মহা ভাদর প্রিয় প্রিয়া-মিলনের শ্রীক্ষেত্র রচনা করেছে কিন্তু ত্রিভঙ্গী মুরলীধর শ্যাম কোথায় :

ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

মন্দিরশূন্য—রাধা-চিত্তের ব্যাকুল ক্রন্দন এই মাত্র একটি কথার ভিতর দিয়ে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। এই শূন্য মন্দির মাঝে এই বাদল-নিশীথ 'কৈসে গমায়ব' কেমন করে যাপন করবেন তা' রাধার চিন্তার বাইরে। এই বুকফাটা ক্রন্দন, এই মর্মভেদী হাহাকার নিয়ে অবশেষে সখীর কাছে শ্রীরাধার সেই চিরন্তন আক্ষেপ :

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।

সমস্ত পদাবলী সাহিত্যে এই পদের সমাকক্ষ পদ বিরল-দৃষ্ট। এর পরেও বিরহ-মলিন শ্যাম-প্রিয়ার মুখ হতে যখন আমরা শুনি :

এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখে গোঙায়লুঁ
ছোড়লুঁ জীবনক আশা॥

তখন এই প্রেমকে কামজ প্রেম বলার সাহস থাকে কই? এ প্রেম কামজ নয়—এ প্রেম স্বভাবজ, এ বিরহ-উচ্চারণ-বাণী মুখের নয়—হৃদয়ের। এ যে নিখিল মনপ্রাণের বেদন-মহোৎসবের বাণী-বন্দনা।

বিদ্যাপতির পদাবলী কেবলই 'আলোক', কেবল বাক্-বৈদগ্ধ এবং অলংকার নৈপুণ্যে প্রজ্জ্বোল এমন কথা যাঁরা বলেন এই পদসমূহে তাঁদের সে মতবাদ খণ্ডিত হবে। 'আলোক' তাঁর কাব্যে ছিল এও যেমন সত্য—অন্ধকার তাঁর কাব্যে প্রাণাবেগ সঞ্চার করছে এ কথাও তেমনি সত্য। আলো-আঁধারের মিলন লীলায়, গোধূলির রহস্যঘন ধূসরতায় বিদ্যাপতির কাব্য সুন্দর হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যে একদিকে ধৃত হয়েছে মানব-জীবনের গভীর রহস্য অন্যদিকে ধৃত হয়েছে ট্রাজেডীর করুণ বিলাপ। একদিকে আছে আলোকোজ্জ্বল কলানিপুণতা অন্যদিকে অন্ধকারের রহস্যাবরণ। বিরহের আর একটি অভিনব পদই আমাদের প্রসঙ্গের শেষ উদ্ধৃতি :

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোহ পিরীত অনু- রাগ বাখানি এ
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনব অবধি হাম রূপ নেহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।…
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥…

…."ইহাই তো মানব জীবনের পরম রহস্য; সর্বজীবনের দুর্ভেদ্য সমস্যা। চিরন্তন নারী সেই যে একবার মিলনের মন্দির মুহূর্তে চিরন্তন পুরুষে অনাদি রূপরহস্য, অনন্ত প্রাণ-বিস্ময়টুকু নয়ন গোচর, হৃদয় গোচর করিয়াছিল, তাহার পর সেই যে রতির দাহ হইতে আরতির দীপশিখা জ্বালাইয়া সে অনন্ত অনন্তকাল হৃদয় দেবতার অর্চ্চনা করিয়া চলিয়াছে, তাহার শেষ নাই, শেষ হইবে না। নিখিল প্রাণ-রাধিকা—প্রাণ-আরাধিকা—প্রাণপতি কৃষ্ণের দিকে

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া থাকিবেই, তাহাতে রূপের কামনা, রসের বাসনা, তৃপ্তির নিবিড়তা, তৃষ্ণার বিধুরতা। এই একটি পদ বিদ্যাপতির কবি-শক্তির সীমা নির্দেশক হইয়া আছে।" এবং এই লাখ লাখ যুগের কল্পনাই হলো অসীম ব্যাপ্ত সৃষ্টি-রহস্য-ভেদকারী মহান কল্পনা—Cosmic Imagination। এই যে রাধাকৃষ্ণ—এঁরা মর্তে এসেছেন দু'দিনের জন্য এবং এই হাসি-কান্না সমাপ্ত হলেই যে লীন হয়ে যাবেন তা' নয়—মর্তেই এঁদের মিলন সাধিত হয়নি—এ হৃদয়-বন্ধন যে বহু পূর্বের। এঁরা এসেছেন যুগল প্রেমের স্রোতে ভেসে অনাদি কালের উৎস হতে—থাকবেনও কোটি প্রেমিকের মাঝে অনন্তকাল ধরে। ঠিক অনুরূপ কল্পনা, অনুরূপ আলোকে-আঁধারে বহুযুগ পরে বিশ্ব কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে :

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে,
মিলন মধুর লাজে।

॥ সাত ॥

॥ ভাবসম্মিলন ও প্রার্থনা ॥

বিরহের পর ভাবসম্মিলন। এবং এই ভাবসম্মিলনের পদে বিদ্যাপতির একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পদে তিনি দ্বিতীয়রহিত।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়ে আর ব্রজধামে প্রত্যাবর্তন করেননি—কিন্তু তবুও সমগ্র বৈষ্ণবপদাবলীতে বিরহের পরও রাধাকৃষ্ণের মিলন-চিত্র অঙ্কিত হ'য়েছে। এই মিলন পুনর্মিলন নয়—দৈহিক কোন অংশ এই মিলনে অংশ গ্রহণ করেনি। বিরহের তীব্রতা হেতু রাধা ক্ষণে ক্ষণে মনে করছেন যে শ্যাম আবার ব্রজধামে ফিরে এসেছেন—এবং শ্যাম-প্রিয়া তাঁর সাথে গভীর মিলন-আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছেন। কল্পনায় এই যে মিলন—বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে এটাই ভাবসম্মিলন নামে খ্যাত হয়েছে।

রাধা কল্পনা করছেন শ্রীকৃষ্ণ আস্‌বেন। তিনি এলে কেমন ভাবে আপন অঙ্গ-সজ্জা করবেন তাঁর বর্ণনায় বিদ্যাপতি মুখর :

হরি যব আওব গোকুলপুর। ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তুর ॥
আলিপন দেয়ব মোতিম হার। মঙ্গল কলস করব কুচ ভার ॥
সহকার পল্লব চুম্বন দেব। মাধব সেবি মনোরথ লেব ॥

কিংবা :

পিয়া যব আওব ই মুঝ গেহে। মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥
কনয়া কুম্ভ করি কুচযুগ রাখি। দরপন ধরব কাজর দেই আঁখি ॥

ভাব-সম্মিলনের আর একটি মনোহর পদ এই :

সপনে আএল সখি মুঝ পিয়া পাসে। তখনুক কি কহব হৃদয় হুলাসে ॥
ন দেখিঅ ধনুগুন ন দেখি সন্ধানে। চৌদিশ পরএ কুসুমশর বানে ॥
বঙ্ক বিলোকন বিকসিত থোরা। চাঁদ উগল জনি সমুদ্র হিলোরা ॥
উঠলি চেহাই আলিঙ্গন বেরী। রহলি লজাএ সুনি সেজ হেরী ॥

এ পদের অন্তর্নিহিত ভাবধারা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না, নিজেই নিজের ব্যাখ্যা : 'সখি, স্বপ্নে প্রিয় আমার নিকট এল, সে সময়কার হৃদয়ের উল্লাসের কথা বলি কী করে? মদনের ধনুক ও গুন অথবা সন্ধান কিছুই দেখিনি, অথচ চারদিকে তার বান নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বঙ্কিম নয়ন ঈষৎ বিকশিত, যেন সমুদ্রতরঙ্গে চন্দ্র উদয় হলো। আলিঙ্গনের সময় চমকি উঠে দেখি প্রিয় নেই— শূন্যশয্যা লজ্জায় আমাকে গ্রাস করলো।'

অধিক উদ্ধৃতিতে প্রবন্ধকে অযথা ভারাক্রান্ত করেও সহৃদয় পাঠকের অনুভূতি ছাড়া ভাব-সম্মিলনের পদান্তর্নিহিত ভাবসত্যকে বুঝান সম্ভব নয়। এ পদ একান্তভাবে অনুভূতি সাপেক্ষ—হৃদয়ে এর জন্ম, হৃদয়ে এর পালন, হৃদয়ের কোমল-কোরকে এর সুরভি-নির্যাস।

ভাব-সম্মিলনের মত প্রার্থনার পদেও বিদ্যাপতি দ্বিতীয়রহিত। এখানেও তাঁর হৃদয়ার্তি এবং অন্তর্বেদনা অভিনব রূপে বিকশিত।

সর্বশেষে বিদ্যাপতির কবি-বৈশিষ্ট্যের সার-নিষ্কাষণ করে বলা যেতে পারে : বিদ্যাপতি ছিলেন কলাকুশলী। তাঁর পদাবলীতে আত্মবিভোরতা আছে কিন্তু আত্মবিস্মৃতি নেই। শিল্প ও শিল্পীর মাঝের পার্থক্যটি সুস্পষ্ট। রাধিকা সম্বন্ধে বলা যায়—প্রথম দিকে তাঁর মধ্যে দেহের ভাব অধিক হলেও শেষের দিকে তিনি অতীন্দ্রিয়লোকে উঠে গেছেন। সমাপ্তিতে আমরা যে রাধিকাকে পাই তিনি লীলা-চাপল্যে চঞ্চল নয়—প্রৌঢ় বলভীর পরাবতী, পদাবলীর যথার্থ নায়িকা। শ্রীরাধার জন্ম অনেক কবি দিয়েছেন কিন্তু আদর-স্নেহ, মান-অভিমান ইত্যাদির পর্যায়গুলি অতিক্রম করে তাঁকে যথার্থ লালন করে

যৌবন-স্বর্গে তুলেছেন একমাত্র বিদ্যাপতি। সেই সর্বপ্রথমের বয়ঃসন্ধি পদ হ'তে ভাব-সম্মিলন এই সুদীর্ঘ সময়ের কত মান, কত অভিমান, কত আশা, কত নিরাশা, কত অভিসার, কত বেদনাই না শ্রীরাধার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। বিদ্যাপতির রাধা তাই সত্যই কমলিনীর মত বিকশিত। এই অভিনব শিল্প-নৈপুণ্যে, এই অসাধারণ কৃতিত্বে বিদ্যাপতি অনন্য সাধারণ এবং একক।

॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

॥ এক ॥

॥ গোবিন্দদাস কবিরাজের কবি-মানস ॥

চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের পরিচয় দিতে গিয়ে আর এক বৈষ্ণব কবি বল্লভদাস উল্লাস-ব্যাকুল কণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন :

> ব্রজের মধুর লীলা যা' শুনি দরবে শিলা
> গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
> তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
> গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥

এই আত্মহারা দীপ্ত-ঘোষণার মধ্যেও হয় তো গোবিন্দদাসের সব পরিচয়টুকু ধরা পড়েনি। কবি হিসেবে বিদ্যাপতিকে নির্ভর করতে হয়েছিল আপন হৃদয়াবেগের ওপর, ব্যক্তিগত অনুভূতির ভাব-নিরর্ভতার ওপর। কিন্তু আপন হৃদয়-সঞ্জাত অসীম চিন্তা-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা ছাড়াও সুরধনী-তীরে যে 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিততনু'র আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁর আজীবন-আচারিত দিব্যোন্মাদনার প্রত্যক্ষ প্রভাব গোবিন্দদাসের কবি-কল্পনা ও পদাবলীকে সঞ্জীবনী সুধার পরশ-দানে মহান করে তুলেছে। মগুণকলানিপুণতা, অলংকার-সুষমা প্রভৃতির মনিকাঞ্চন যোগে বিদ্যাপতির কবিতা 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র মত দীপ্ত হয়ে উঠেছে। গোবিন্দদাসের কবিতাও এই 'হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি'তে ভাস্বর। অলংকার নিপুনতা ছাড়াও গোবিন্দদাসের কবিতায় আর একটি গুণ বর্তমান। কিন্তু এই কলানিপুনতায় এবং তীক্ষ্ণাগ্র বাণী-বিন্যাসে বিদ্যাপতির কবিতা যেখানে কেবলমাত্র মনন প্রধান হয়ে উঠেছে সেখানে এই কলানিপুণ বাক-বিন্যাস ছাড়াও গোবিন্দদাসের কবিতায় লেগেছে আর এক ভাবের রং। এই ভাবের রং-এ রঙীন হ'য়ে গোবিন্দদাসের কবিতা এক বিশেষ মর্যাদা-দীপ্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গোবিন্দদাসের কবিমানসের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গোবিন্দদাস কখনো ভাবের আকুলতায় অকূলে ভেসে যাননি। কূল-হারা ব্যাকুল-কল্পনা যখনই তাঁকে গ্রাস করতে উদ্যত—

তখনই তিনি কল্পনা-পক্ষীরাজের লাগাম টেনে তাকে সংযত এবং সংহত করেছেন—ফলে তাঁর কাব্যে বাষ্পময় ফেনিল অংশের বিশেষ প্রাধান্যলাভ ঘটেনি। রচনার সর্বত্র একটি শিল্প-সুষম সংযত মনের স্পর্শ আমাদিগকে মুগ্ধ করে।) বহুযুগের ব্যাপক অনুশীলনে আমাদের দেশে যে কাব্য শাস্ত্র গড়ে উঠেছে গোবিন্দদাস সেই কাব্যশাস্ত্রের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখেই আপন কাব্য রচনা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর তাঁর ছিল অবাধ অধিকার এই অধিকারের অপূর্ব ব্যঞ্জনা পাই তাঁর অলংকার-সমৃদ্ধ পদরাজীর মধ্যে। সুতরাং 'গোবিন্দদাস হাটে মাঠের কবি নন'—তাঁর কাব্য অনভিজাত নয়—আভিজাত্যের বিজয়-তিলকে তাঁর কাব্য আপন স্বাতন্ত্র ঘোষণা করেছে।) আভিজাত্য-গর্বী গোবিন্দদাসের কবিতা সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শঙ্করীপ্রসাদ বসু একটি বিশেষ স্মরণযোগ্য মন্তব্য ঘোষণা করেছেন : ("সংযম বুদ্ধির ফলে গোবিন্দদাসের কাব্যে যে বিশেষ বস্তুটির আবির্ভাব ঘটেছে, তাকে কাব্যের স্থাপত্যবিদ্যা বলা চলে। তাঁর অধিকাংশ পদ যেন কুঁদে তৈরী—'কুন্দে যেন নিরমান'। প্রতিভার আলোড়নক্ষণে অর্দ্ধবাহ্যদশায় আত্ম-সংবিতের বিলয়-মুহূর্তে প্রেরণার হাত ধরে কবি তাঁর কাব্য সৃষ্টি করেননি। তাঁর কবিভাবনা কাব্যের সব কটি প্রয়োজনীয় বস্তুর সমাবেশ করে অপরিসীম রসবোধ ও তীক্ষ্ণ শিল্পদৃষ্টির সহায়ে একটির পর একটি পদ রচনা করে গিয়েছে। ফলে……কাব্যের রূপ-সম্পূর্ণতা যাকে বলে, সেই finish-এর অসৌকর্য কোথাও ঘটেনি।"

(গোবিন্দদাস সৌন্দর্যরসিক রূপ-দক্ষ কবি। এই রূপাল্পায়ণ তাঁর কাব্যের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর আজীবনব্যাপী সৌন্দর্য-সাধনার স্বরূপটি আপন-দীপ্তিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্ট রাধার মধ্যে। তিনি আপন মনের মাধুরী দিয়ে, আপন হৃদয়ের আবেগ দিয়ে, গহন মনের সমুদয় সৌন্দর্য দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন তিলোত্তমা রাধাকে। কিন্তু এই রাধা কোন মানবী রূপে আবির্ভূতা নন—ইনি বিশ্ব-সৌন্দর্যের প্রাণ-প্রতিমা, অলৌকিকতার বাণী-বহ। বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস এমনকি চণ্ডীদাসের রাধার মধ্যেও হয়তো সামান্য মানবিকতার অবকাশ রয়েছে কিন্তু গোবিন্দদাসের রাধা একেবারে অলৌকিক—ধূলি মাটির ঊর্দ্ধে তাঁর স্থান। একমাত্র অভিসারের আবেশঘন সুদুর্লভ মুহূর্তে তিনি অনেকখানি মানবিক-পর্যায়ে নেমে এসেছেন। তার কারণ "অভিসারে চলিষ্ণুতা প্রবল। পথ চলিলে পথের সৌরভ ও জীবনাবেগ অঙ্গে লাগিবেই।"

গোবিন্দদাস সম্পর্কে আর একটি ভ্রান্ত ধারণার অপসারণ করতে গিয়ে অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু যে যুক্তি দেখিয়েছেন সেটি এ ভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে। (অনেকে মনে করেন গোবিন্দদাস খাঁটি লিরিক কবি এবং এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তিনি বিদ্যাপতির নিকট ঋণী। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেননা গোবিন্দদাস খাঁটি অর্থে লিরিক কবি নন। কিন্তু তাঁর সকল পদে যে একটি গীত-মূর্চ্ছনার মহান আবেশ মিশে রয়েছে তা' কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। তাঁর কাব্যের এই সংগীত-অঙ্গ, এই সুর-চেতনা তাঁকে লিরিক কবি-পর্যায়ে উন্নয়নের পিছনে তীব্র বেগ সঞ্চার করেছে। কিন্তু সুরাধিক্য থাক্‌লেই যে কবিতা লিরিক হয় না তা' সহজেই অনুমেয়। গোবিন্দদাসের কবিতায় সুরাবেশ এবং সুর-মূর্চ্ছনা থাক্‌লেও আসলে গঠন-বৈচিত্র্য ক্লাসিক্যাল রীতি-আশ্রয়ী। ক্লাসিক্যাল গঠন-রীতি আশ্রয় করেই তাঁর কবিতা দুর্লভ অঙ্গ-বৈচিত্র্যের অধিকারী হয়েছে। বস্তুতঃ লিরিকের লহরীতে নয়—ক্ল্যাসিক এবং মিউজিকের অনবদ্য সংযোজনায় তাঁর কাব্য দুষ্প্রাপ্য-মনোহর হয়ে উঠেছে।)

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য হলেও তিনি যে সম্পূর্ণ রূপে বিদ্যাপতির নিকট ঋণী নন সে সম্পর্কে আধুনিক সচেতন-সমালোচকের সরব কণ্ঠই যথেষ্ট: "অনেকের ধারণা, বিদ্যাপতির নিকট গোবিন্দদাস এই সঙ্গীত-প্রাণতার জন্য ঋণী। বস্তুতঃ তা' সত্য নয়। বিদ্যাপতির নিকট গোবিন্দদাসের ঋণ ছন্দের জন্য, সুরের জন্য নয়। বিদ্যাপতির অনেক পদ বাহ্যরূপে অপেক্ষাকৃত ছন্দ-পরুষ —অথচ তাহাদের ভাবগৌরবের তুলনা নাই। সেখানে গোবিন্দদাস অনেক পিছনে। তথাপি গোবিন্দদাসের চূড়ান্ত প্রতিভা—অর্থাৎ সুর প্রতিভার প্রশ্নে বিদ্যাপতির স্থান নিম্নেই।"

গোবিন্দদাস যে চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গোবিন্দদাসের কবিতার একদিকে আছে ভক্তি-প্রবাহের দুর্বার প্রবণতা অন্যদিকে আছে আত্মসংযমের দুর্ভেদ্য আবরণ; একদিকে আছে চিত্রধর্মিতার অনবদ্য প্রয়াস অন্যদিকে আছে শিল্পকর্ম হ'তে শিল্পী-মানস দূরত্বের-অবিচল নিষ্ঠা; এবং সর্বোপরি কাব্যের এক প্রান্তে আছে নাটকীয়তার অমোঘ আকর্ষণ অন্যপ্রান্তে আছে আলংকারিকতার স্বর্ণোজ্জ্বল-দীপ্তি। আভিজাত্য-গর্ব এবং ঐশ্বর্য-বোধ, ক্লাসিক্যাল-ধ্বনি এবং মিউজিক্যাল-তান—তাঁর কাব্যকে সর্বকালের সর্বজন-সমক্ষে দুর্মূল্য সামগ্রী করে তুলেছে।

॥ দুই ॥

॥ গৌরচন্দ্রিকা ॥

গোবিন্দদাস ব্রজবুলি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই আপন ভাবৈশ্বর্য এবং কল্পনা-গরিমা পদাবলীর কোমল বক্ষে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস-ভনিতাযুক্ত বাংলা ভাষায় রচিত সমুদয় পদ গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা নয়—অনেকগুলির রচয়িতা হলেন গোবিন্দদাস চক্রবর্তী। যা' হোক গোবিন্দদাস বিভিন্ন পর্যায়ে কবিতা রচনা করলেও সকল পর্যায়ের পদ-রচনায় সমান সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। গৌরচন্দ্রিকা, রূপানুরাগ, অভিসার এবং মহারাসের পদসমূহে গোবিন্দদাসের অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাই কিন্তু মান, বিরহ ইত্যাদি পদে একেবারে ব্যর্থ না হলেও অনেকাংশে বিফল হয়েছেন। নিম্নে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ের পদগুলি নিয়ে আলোচনা করছি।

॥ গৌরাঙ্গলীলাবিষয়ক পদ ॥

গৌরাঙ্গলীলাবিষয়ক পদে মহাকবি গোবিন্দাসের একক প্রতিনিধিত্ব সাফল্যের সর্বোচ্চ-গ্রাম (climax) স্পর্শ করেছে। বস্তুতঃ গৌরচন্দ্রিকার পদে গোবিন্দ-দাসের সর্বশ্রেষ্ঠত্বের উপর সংশয় আরোপ করার মত কোন দ্বিতীয় পদকর্তা নেই। 'গৌরচন্দ্রকে অগণিত মানুষ ভজনা করেছে কিন্তু চন্দ্রিকাটুকু একমাত্র প্রতিফলিত করতে পেরেছেন পরম ভক্ত কবিরাজ গোবিন্দদাস।' চৈতন্য-লীলাকে প্রত্যক্ষীভূত করার সুযোগ গোবিন্দদাসের ভাগ্যে ঘটেনি। এবং এই লীলাস্বাদানের অপূর্ব অবকাশ-ক্ষেত্র হতে বঞ্চিত হ'য়ে গোবিন্দদাস বার বার ক্ষোভ-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন: 'গোবিন্দদাস রহুঁ দূর।' কিন্তু লীলাস্বাদান হ'তে বঞ্চিত হলেও আপন অসামান্য কবিত্ব-প্রতিভাবলে চৈতন্য-জীবন-ধারা-ঐতিহ্যটিকে স্বীকৃত (assimilate) করে ছন্দের আন্দোলনে আবদ্ধ করেছেন। এবং এই ছন্দ-আল্পনায় কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদ শ্রীগৌরাঙ্গের যে ব্যাকুল চিত্রের অভিনব উদ্ঘাটন হয়েছে প্রত্যক্ষ লীলা-দর্শী কবিদের গৌরচন্দ্রিকাতে তার সামান্যতম অংশও আভাসিত হয় নি। গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকা পদগুলি যেন স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বলতম দর্পন—এ দর্পনের প্রতিবিম্বে বিধৃত হয়েছে 'রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিততনু'। চৈতন্যচরিতামৃতে যে গৌরচন্দ্রিকা পাই তা' অনেকাংশে সজীব হলেও গোবিন্দদাসের পদরাজীর মত প্রাণস্পর্শী নয়। কবিরাজ

গোস্বামীর পদে ভাব অপেক্ষা রস গৌণ, তত্ত্বের চাপে দুর্বার কবিত্ব শক্তিও যেন পঙ্গু হ'য়ে পড়েছে। দার্শনিক গাম্ভীর্যের অন্তরালে রসলোকের সুর-রহস্য চাপা পড়েছে। কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে তত্ত্ব ও রসের এই বিরোধ নেই—রূপ রস সমান্তরাল প্রবাহে বয়ে গেছে, চিত্রধর্মিতা ও নাটকীয়তা আপন বর্ণরাগে বিকশিত হয়ে উঠেছে :

নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর-কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর॥

'সুরধুনী-তীরে উজোর' এই 'অভিনব হেমকল্পতরু' 'নটবর গৌর-কিশোর'-কে যেন আমরা এই কবিতার মর্মান্তরাল হ'তে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করি। চিত্রগরিমায় এ গৌরচন্দ্রিকা সজীব এবং হৃদয়স্পর্শী। আর একটি পদ :

বিপুল পুলককুল- আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদগদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গায়ত কত কত ভকতহি মেলি।...

নয়নে মন্দাকিনীর প্রবাহ এবং 'নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত' এই বাণী-বন্ধনের অন্তরাল হ'তে কী দিব্যোন্মাদ মহাপ্রভুর গৌরোজ্জ্বল কান্তিটি সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে না?

পতিত হেরিয়া কান্দে থির নাহি বান্ধে
করুণ নয়ানে চায়।

এই বাণীবন্ধনের ভিতর দিয়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আজীবন-আচরিত প্রেমানুভূতির কী বিশ্ব-বিসারী প্রকাশ ঘটেছে! এর পরও যখন আমরা শ্রবণ করি :

পুলক বলিত অতি ললিত হেম-তনু
অনুখন নটন বিভোর।
কত অনুভাব অবধি না পাইয়ে
প্রেমসিন্ধু-বহ নয়নহি লোর ॥

তখন আমাদেরও আবেগ-সঞ্জাত নয়নাশ্রু কবিতান্তরালবর্তী প্রেমোন্মাদ মহাপ্রভুর চরণ-প্রান্তে পতিত হয়। এ সব কবিতা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, চিত্রোদ্‌ঘাটনেরও প্রয়োজন নেই—নির্মল আলোক-বন্যায় আপনাতে আপনি বিকশিত। তত্ত্ব এবং কবিতা, চিত্রধর্মিতা এবং রসপ্রবাহ আপন আবেগে স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে। ভাব-দ্যুতি এবং সংগীত-লাবণ্য পার্বতী-পরমেশ্বরের মত মহাসম্মিলনের শ্রীক্ষেত্রে সম্মিলিত হয়েছে বলেই গৌরচন্দ্রিকার পদে গোবিন্দদাসের প্রতিষ্ঠা চির-অম্লান।

॥ তিন ॥

॥ রূপানুরাগের পদ ॥

রূপানুরাগের পদেও গোবিন্দদাসের পদক্ষেপ বিশেষরূপে স্মরণীয় হয়ে আছে। কেবল স্মরণীয় নয় রূপানুরাগের পদে গোবিন্দদাসের যে শিল্প-চাতুর্য এবং ভক্তির ঐকান্তিকতা চিহ্নিত হ'য়েছে তা' বৈষ্ণবপদ-সাহিত্যে বিরল-দৃষ্ট। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি গোবিন্দদাস হলেন স্বভাবজ রূপ-পাগল কবি—তাঁর পদাবলী রূপাল্পনারই বাঙ্ময় প্রকাশ। রূপানুরাগের পদে গোবিন্দদাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই তিনি প্রথমে রূপকে অবলোকন করেছেন, অনুভব করেছেন, কবিত্ব-শক্তির জারক রসে জরিয়েছেন, তারপর ধীর শান্ত কলানিপুণ বাণীবন্দনায় ছন্দবদ্ধ করেছেন। চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাস রূপ দেখেছেন এবং দেখেই আত্মবিস্মৃত হয়েছেন। ফলে তাঁদের মন 'যৌবনের বনে' হারিয়ে গেছে। কিন্তু গোবিন্দদাসের মন হারিয়ে যায় নি—তিনি রূপ-লাবণ্যদীপ্তিতে আত্মবিস্মৃত না হ'য়ে আত্মস্থ হয়েছেন। "রাধাকৃষ্ণের রূপ দেখে 'সে রূপ কবার নয়' বলে" তিনি হাল ছেড়ে দেননি। বরং এই রূপকেই তিনি পরম ভক্তিভরে শ্যাম-শ্রীমতার লাবণ্যোজ্জ্বল চিত্রাঙ্কনে ব্যয়িত করেছেন। ভক্তি-স্পন্দন এবং আত্মলীন শৈল্পিক প্রকাশে গোবিন্দদাসের রূপানুরাগের পদগুলি অনন্যসুন্দর হয়ে উঠেছে। এই পদরচনায় একদিকে যেমন আছে কবিমানসের আত্মনিয়ন্ত্রণতা

অন্য দিকে তেমনি আছে আত্মলীনতা। বন্ধন এবং মুক্তির লীলাতেই রূপানুরাগের পদগুলি হীরকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক:

নবঘন পুঞ্জ পুঞ্জ জিতি সুন্দর
অনুপম শ্যামর শোভা।
পীত বসন জনু বিজুরী বিরাজিত
তাহে চাতক মনোলোভা॥
পেখলুঁ সুন্দর নন্দকিশোর।...
মণিময় হার বিরাজিত উরপর
ভালে এক সিন্দূর-বিন্দু।
নীল গগনে জনু নখত বিরাজিত
তাহে উজোরল ইন্দু॥
ভুজযুগ কালভুজগ জনু দোলত।...
পদপঙ্কজ পর মণিময় নূপুর
চলত নাচন ঘন বাজে।...

এখানে রাধা-প্রেম-বিভোর শ্রীকৃষ্ণের যে চিত্র অঙ্কিত হ'য়েছে তা' কোন আত্মহারা বা আত্মবিস্মৃত শিল্পীর নয়—শিল্পীর সচেতনতা সর্বত্র সুস্পষ্ট অথচ বর্ণগরিমায় চিত্রটি কী অপূর্ব এবং অভিনব। আর একটি পদ:

অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জীর
আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন-বঞ্চন বসন-মনোরঞ্জন
অলিকুল-মিলিত ললিত বনমাল॥
ভালে বনি আওয়ে মদন মোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া॥

এই পদে রূপস্ফুটনের সাথে সাথে লিপি-চাতুর্য, ছন্দ-বৈচিত্র্য, শব্দৈশ্বর্য ইত্যাদি উৎকর্ষতার প্রান্ত-সীমা স্পর্শ করেছে। শব্দ-অলংকার-উপমা-ঐশ্বর্য-দীপ্ত রূপানুরাগের এমনি বহু পদ আছে গোবিন্দদাসের পদাবলীতে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন রূপানুরাগের পদে গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠ হলেও স্বরূপানুরাগের পদে—অর্থাৎ যে রূপ বর্ণনার পদে শিল্প এবং শিল্পীর মধ্যে কোন ব্যবধান নেই, আত্মবিস্মৃত শিল্পীর ধ্যান-স্বপ্নই যেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে—সেখানে চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাসের পদের ব্যঞ্জনা অসীম-বিথারী। স্বরূপানুরাগের পদে চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের আসন অনেক উচ্চে।

॥ চার ॥

॥ রাসের পদ ॥

রাসের পদেও গোবিন্দদাসের সমকক্ষ রূপ-শিল্পী বৈষ্ণবপদ-সাহিত্যে বিরল-দৃষ্ট। এখানেও গোবিন্দদাসের একক প্রাধান্য সূচিত হয়েছে। রাসের পদে কোন আনন্দ নয়, ব্যথা নয়, বেদনা নয়, সুখ নয়, সম্ভোগ নয়—কেবল উল্লাস আর উদ্দামের বিপুল বেগই চিত্রিত হয়। ব্যথা-বেদনার রাগিনীতেই পদের অন্তরাত্মা সুন্দর হয়ে ওঠে, আনন্দ-বেদনার দোলাতেই কবিতার অন্তর-বীণা অতীন্দ্রিয়লোকের সুর-রহস্যে বেজে ওঠে কিন্তু রাসের পদে তেমন কোন স্পর্শ না থাকা সত্ত্বেও পদগুলি অভিনব। কেন? 'রাসে বিরহবোধ নাই সত্য কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির উদার পটভূমিকা আছে। সেই প্রকৃতি কবিচিত্তকে আপন বিশাল বিস্তারের ভিতর ছুটাইয়া নাচাইয়া ফিরাইয়াছে।' মহারাসের পদসমূহে এই জন্যই বিশ্বপ্রকৃতির ছায়াপাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কত বর্ণে, কত গন্ধে, কত রাগেই না নিখিল বিশ্বের উন্মুক্ত প্রকৃতি রাসের পদসমূহের অন্তর্লোকে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতির বিপুল বিস্তার ছাড়াও রাসের পদগুলিকে অভিনব করে তুলেছে মহারাসের তীব্র গতিবেগ। একটি উদাহরণেই আমাদের মন্তব্যটি পরিষ্কার হবে ঃ

> শব্দ-চন্দ পবন মন্দ
> বিপিনে ভবল কুসুম-গন্ধ
> ফুল্ল মল্লী মালতী যুথা
> মত্ত মধুপ ভোরণী।

এপর্যন্ত বিশ্বপ্রকৃতির অভিনব চিত্রন ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু এর পরই চলিষ্ণুতার কথা প্রধান হয়ে উঠেছে—কৃষ্ণ-মুরলী-ধ্বনি সেই গতিবেগের আহ্বানেই বেজে উঠ্‌ছে ঃ

> হেরত রাতি ঐছন ভাতি
> শ্যাম মোহন মদনে মাতি
> মুরলী-গান পঞ্চম তান
> কুলবতী চিত চোরণী॥

এই পদের পর অংশটি চিত্র এবং প্রকাশ বৈচিত্র্যে অভিনব হলেও মূল বক্তব্যটি পরিস্ফুটনের জন্যে আর উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। শঙ্করীবাবু এ পদসম্পর্কে

মন্তব্য করেছেন, রাসের পদ প্রধানত মিলনাত্মক। এখানে বিরহ কিংবা বিরোধ নেই—মিলনের সম্ভোগ চিত্রও নেই তবুও পরিবেশ এবং বর্ণনা সকল কিছুই মিলনের দিকে ইংগিত করে। গোবিন্দদাস এই মিলনাত্মক রাসের পদে যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন খাঁটি মিলনের পদে তা দেখাতে পারেন নি।

॥ পাঁচ ॥

॥ অভিসারের পদ ॥

এরপর অভিসারের পদ। গোবিন্দদাসের কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার। বাস্তবিক অভিসারের পদে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা—কোন বৈষ্ণব পদকর্তা তাঁর নিকটে পর্যন্ত যেতে পারেন নি। অভিসারের পদে গোবিন্দদাস মহাসম্রাট—তুলনারহিত।

অভিসারের সাথে আমাদের মানব-জীবনের একটি গভীর যোগ বর্তমান। বিশ্ব নিখিলের মানব-কুলও রাত্রিদিন অনির্দেশ্যের আকাঙ্ক্ষায় অভিসারের পথেই ছুটে চলেছে। সুদূরকে নিকটে পাওয়ার ব্যাকুল প্রচেষ্টা কিংবা অসীম রহস্য-লোকের সাথে নিজেকে বিলীন করার তীব্র গতিবেগ সে তো অভিসার ছাড়া আর কিছুই নয়। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তাই তো ধ্বনিত হয়েছে :

> ……"তাবি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
> চলেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে
> ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে"……

ঝড়-বাদল উপেক্ষা করে এই যে যাত্রা, বন্ধুর পথের কণ্টক দলে এই যে দুর্গম প্রস্থান এই তো অভিসার। এই পথ-পরিক্রমা অনির্দেশ্য রহস্য-উদ্‌ঘাটনের জন্যেও হ'তে পারে, ধর্মের জন্যেও হ'তে পারে আবার প্রেম-ব্যাকুল প্রিয়-প্রিয়ার মহা-মিলন সাধনার জন্যেও হ'তে পারে। মোটকথা এই যাত্রা, এই চলিষ্ণুতা, এই অভিসারে হয় অপূর্ণের পরিপূর্ণ রূপায়ণ—এই চলার পথ বেয়েই আসে মানব-জীবনের চরম সার্থকতা।

অলঙ্কার-শাস্ত্রে অষ্ট প্রকার অভিসারের কথা উল্লেখ হয়েছে :

> সেই অভিসার হয় পুন অষ্ট প্রকার।
> জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষা, দিবা অভিসার॥
> কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা, সঞ্চরা।…

বলাবাহুল্য আমরা গোবিন্দদাসের পদে উক্ত অষ্ট প্রকারের অভিসারের বর্ণনাই

পেয়েছি। কিন্তু অভিসারের এই বিচিত্র পথে পদচারণার জন্যেই গোবিন্দদাসের প্রসিদ্ধি লাভ ঘটেনি পদগুলির আভ্যন্তরিণ সৌন্দর্য, মৌলিকতা, চিত্র ধর্মিতা, আন্তরিকতা এবং সর্বোপরি নাটকীয়তাই অভিসারের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা রূপে গোবিন্দদাসের বিজয়-গাথা রচনা করেছে।

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি গোবিন্দ দাসের রাধা অলৌকিক, লৌকিকতার সাথে তাঁর কোন যোগসূত্র নেই। কিন্তু অভিসারিকার পদে এই রাধা অনেকখানি লৌকিক পর্যায়ে নেমে এসেছেন। কেননা অভিসারের যে সাধনা—তা' একান্ত ভাবেই বাস্তবের; বাস্তবেরই বেড়াজাল অতিক্রম করে, বাস্তবের বিপদ-ঝঞ্ঝা উত্তীর্ণ হয়ে, পার্থিব দুর্গম বিপদ-সঙ্কুলতা কাটিয়ে করতে হয় অভিসারের অভিনব পথে পদচারণা। সুতরাং অলৌকিক কোন চরিত্রের পক্ষে তা' সম্ভব নয়। তাই অভিসারের পদে নিতান্ত কাব্যের প্রয়োজনেই গোদিন্দদাসের রাধিকাকে লৌকিকতার পর্যায়ে নেমে আস্‌তে হয়েছে।

অভিসারের বন্ধুর পথ কণ্টকাকীর্ণ এবং পিচ্ছিল। গৃহেই সেই দুর্গম পথ-পরিক্রমার দুর্নিবার শক্তি সঞ্চয়ের কৃচ্ছ্র সাধনা শুরু হয়েছে শ্রীরাধিকার ঃ

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥…
গুরুজন-বচন বধির-সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস-পরমান॥

অন্যান্য অসংখ্য বৈষ্ণব কবিতার মত এ কবিতারও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের কণ্ঠ নীরবই হয়ে আসে। অভিসারের বিপদ-বহুল পথে পদচারণার যে তুলনাহীন কৃচ্ছ্র সাধনার মর্মবেদনা এ পদের অন্তরাল হ'তে ধ্বনিত হয়েছে অনুভব ছাড়া অন্য কোন পথে তার স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়।

অভিসারের যে শিক্ষা গৃহের গহন কোণে শুরু হয়েছিল এবার তার প্রসার দেখি

বিপুল বিশ্বের দুর্বার দুর্যোগের মাঝে। আর কল্পনা নয়—অভিসারের দুর্গম পথে শ্রীরাধিকা নেমে এসেছেন। বর্ষার অবিরল বারি বর্ষণ, 'ঘন ঘন ঝন ঝন' বজ্র-পাত প্রভৃতি সকলের সম্মিলিত আক্রমণে এই পথ ভয়াল-ভীষণ। প্রকৃতির এই দুর্যোগের উপরেও আছে সমাজ এবং আত্মীয় স্বজনের সুকঠিন বন্ধন :

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥
ঘনঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবনে মরম জরি যাত॥
দশদিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥

শব্দে, ঝংকারে, অলংকারে, উপমায় এ কবিতার মধ্যে বাদল-ঘেরা বর্ষণ-মুখর মহা-ভাদর নিশীথের এক দুর্যোগ-মহিমাময় অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সুদূর আকাশের কোন দূরতম দিগন্তে যেন বন্যার ডাক সুরু হয়েছে—সেই বন্যার ধারায় ধরা সঘন দোলায় উতরোল—'তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।' এক দিকে আছে সমাজ-বন্ধন অন্যদিকে আছে অভিসারের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, এক প্রান্তে আছে নব বর্ষার প্রলয় বিভীষিকা অন্য প্রান্তে দেখি নব যৌবনোন্মাদ বলভীর পারাবতী শ্রীরাধার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সকলের সম্মিলিত তানে কবিতাটি এক বিরল-শ্রুত সুর-মূর্ছনায় দুষ্প্রাপ্য-মনোহর।

এই দুর্যোগ এবং বজ্রপাত উপেক্ষা করেও শঙ্কিত কম্পমান হৃদয়ে পথে নেমেও শ্যাম-মিলনের আশা সুদূর পরাহত। কেননা : 'হরি রহ মানস সুরধুনী পার।' আশা-নিরাশা, নৈরাশ্য ও হতাশায় কবিতাটির অন্তর-বাণী বার বার দোলায়িত হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতির এই প্রলয়োঙ্কার দুর্যোগ, নির্মম নির্যাতনও শ্রীরাধিকার প্রেমাবেগের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। প্রিয়-মিলনাকাঙ্ক্ষার দুর্বার উন্মাদনায় শ্রীরাধার বক্ষ-পিঞ্জরে যে প্রবল তুফানের সৃষ্টি হয়েছে বাইরের এ দুর্যোগ তার ভগ্নাংশ

মাত্র। সমুদয় দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে শ্রীরাধিকার বিজয়-গৌরবমণ্ডিত শির উর্ধোত্থিত :

কুলবতী কঠিন কপাট উদ্ঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠক বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু-সঞে পঙারলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা॥

শ্রীরাধিকা পথে বার হয়েছেন পরম দিগ্বিজয়ীর মত। পথের প্রান্তিক সীমানায় যে ত্রিভঙ্গ মুরলীধর মধুর হাসিতে উচ্ছল—সেই হাসিই রাধার সমুদয় শক্তির উৎস-মূল। সেই নির্মল হাসিই শ্রীরাধার অন্তরে দিয়েছে বিপদ্-জয়ের দুর্বার আনবিক শক্তি Atomic force। রুদ্ধ কপাট খুলে সন্তর্পণে বার হয়ে আসা কম বিপদ নয়—কিন্তু তার উপরেও বিপদ রয়েছে পথের বুকে :

মাধব কি কহব দৈব-বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব চারি পদ আয়লুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির-দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদ যুগে বেড়ল ভুজঙ্গ॥

মন্দির থেকে বার হয়ে আসা যথেষ্ট নয়, অন্ধকার যথেষ্ট নয়, ভুজঙ্গও যথেষ্ট নয়—এবার নামল বাদল-ধারার প্রলয়-পাত, সাথে বজ্র। এই বিপদ কাটাবার সামর্থ কি শ্রীরাধার আছে? তিনি কী দয়িত-মিলনাকাঙ্ক্ষা হ'তে নিবৃত্ত হবেন? "না, তিনি রাধিকা—চির-আরাধিকা। কৃষ্ণকে তিনি পান না, অর্জন করেন।" মুরলীর মধুর নাদ যেদিন হ'তে তাঁর কর্ণে প্রবিষ্ট হ'য়েছে সেদিন হ'তেই তিনি এই বেদন-মথিত স্বর্ণপদ্ম অর্জনের দুর্বার শক্তিতে হয়েছেন আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। পথের বেদনা, যাত্রার বিভীষিকা, বাদলের প্রলয়-পাত সেদিন হ'তেই তো তাঁর কাছে তৃণ সমান :

তোহারি মুরলী যব শ্রবনে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ সুখ আশ।
পন্থক-দুখ তৃণহুঁ করি না গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস।

॥ ছয় ॥

॥ গোবিন্দদাসের কাব্যে প্রেমের চারুত্ব ॥

বিভিন্ন রস পর্যায়ের পদ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে গোবিন্দদাস প্রেমের বিচিত্র গতি পথের যে সূক্ষ্ম রেখা-বিন্যাস করেছেন এবং নায়ক-নায়িকার প্রেম-বিহ্বল চিত্তের উত্থান-পতনের যে অভিনব চিত্র অঙ্কিত করেছেন—প্রেমের সেই সূক্ষ্ম স্বরূপ-বিশ্লেষণ অন্য কোন মহাজন কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রেম-অমরাবতীর গভীরতম তলদেশে নিমজ্জমান হ'য়ে প্রেম-ব্যাকুল শ্রীমতীর অস্থির চিত্তের যে রহস্য-রূপটি তিনি তুলে ধরেছেন সেখানে গোবিন্দদাস একক। বিভাব-অনুভাবে নায়ক-নায়িকার চিত্ত যেভাবে ক্ষণে ক্ষণে আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন ভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে—সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় রেখার আল্পনায় গোবিন্দদাস তা চিত্রার্পিত করেছেন।

আত্মহারা মুগ্ধা রাধার ব্যাকুল-তন্ময়তা সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে নিম্নের পদটিতে:

> গুরুজন বচনে বধির সম মানই
> আন শুনই কহ আন।
> পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
> গোবিন্দদাস পরমান।

কৃষ্ণদর্শনের পর হ'তে কিশোরী রাধা আনমনা হ'য়ে পড়েছেন। সেই ভাব লক্ষ্য করে গুরুজনেরা বার বার কারণ জিজ্ঞাসা করে' কিন্তু বধির হওয়ার ছলনা করে—বধির সম মানই—শ্রীরাধা গুরুজনদের বাক্য শুনেও শোনেন না, এক শুনে আর এক উত্তর দেন—গুরুজনদের ফাঁকি দেওয়ার এ এক সহজ পন্থা। অথচ গুরুজনেরা কথার গভীরে প্রবেশ করে নতুন কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন না, নতুন ভাবে অগ্রসর হ'তে পারেন না। কিন্তু সখীজন—তাদের কাছে তো এমন ভাবে ফাঁকি দেওয়া যায় না। হাজারো প্রশ্নের বাণে গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায়—শ্রীরাধা ধরা পড়েন। ধরা যখন পড়েছেন তখন এড়িয়ে যাওয়ার আর কোন পথ নেই। তখন সখীজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরাধা 'মুগধি সম হাসই'। উত্তর দিয়ে পলায়নের পথ রুদ্ধ সুতরাং 'মুগধি সম হাসই'। প্রথম প্রেমের পরশে লজ্জাবতী কিশোরীর মুগ্ধ চিত্তটি এখানে কি সুন্দর ভাবেই না বিকাশমান।

কৃষ্ণকে দেখে এসে আনন্দে আত্মহারা হ'য়েছেন শ্রীরাধা। অথচ চার পাশে

সখীগণ। তাঁদের কাছে তিনি সে কথা গোপন করেন কিন্তু হৃদয়ের পুলক-বন্যাকে তো গোপন করা যায় না—সে রোমাঞ্চের প্রকাশ এই :

খেণে তবু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক-মুকুলে ভরু অঙ্গ॥

এ সকল পদগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় প্রেম-বিহ্বল নায়িকার চিত্তের প্রেম-তরঙ্গের উত্থান-পতনের এতটুকু ভংগীও তিনি বাদ দেন নি। সবটুকু রস-তন্ময়চিত্তে অনুভব করেছেন, পরে কাব্যের মধ্য দিয়ে পাঠক চিত্তেও আভাসিত করে দিতে সমর্থ হ'য়েছেন।

পূর্বরাগের বেদনার্ত আনন্দ-চপল মুহূর্তে বহুদিনের ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর অবশেষে মিলন হল শ্যাম-শ্রীমতীর সঙ্গে। দীর্ঘ সময় একত্রে যাপন করে রাই ঘরে ফিরে এলেন কিন্তু অঙ্গে তার নব মিলনের সকল চিহ্ন বর্তমান। আবার সেই রহস্যালাপেচ্ছু সখীদের প্রশ্নবান। কিন্তু রাধিকা স্বীকার করেন না। মূলকথা গোপন করেন। অন্য কথা দিয়ে কথা ঢাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু সখীরা নাছোড়বান্দা—তাঁরা বলেন, 'কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ'—তোমার কথার ধরন আজ বাঁকা বাঁকা, এ রঙ্গ তুমি কোথায় শিখেছ। গাঁটিতে হেম রাখ্‌লে কি হ'বে তার দীপ্তিতে যে তোমার অঙ্গ ঝলমল :

গাঁঠিক হেম বদনমাহা ঝলকই
এতদিনে পেখলুঁ আঁখি।

প্রেমের সূক্ষ্মত্ব এবং চারুত্ব এখানে সুন্দর রূপে ফুটে উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আমরা পূর্বেই বলেছি প্রেমের সূক্ষ্ম গতিপথ চিহ্নিত করার জন্যেই স্বভাবজ কবি গোবিন্দদাস বহু নতুন পথে পদচারণা করেছেন। বাঁধা ধরা পথ পরিত্যাগ করে তিনি এমন পথে গিয়েছেন যে পথে প্রেমের দীপ্তি আপন আভায় আপনি ঝলকিত হয়ে উঠেছে। এখানে এমনি এক নতুন গতিভংগীর উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীমতী মান করে আর শ্যাম-মিলনে যান না। শ্যাম শ্রীমতীর মান-ভঞ্জনের উপায় খোঁজেন। অবশেষে তিনি যোগী সেজে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। ভিক্ষার জন্যে বৃষভানুপুরে এসে 'শিঙ্গা ধ্বনি' করেন। ভিক্ষা নিয়ে বার হ'য়ে আসেন বিরহ-কাতরা করুণাময়ী রাধা। ভিক্ষা দেন যোগীকে কিন্তু যোগী ভিক্ষা নেন না—বলেন :

যোগী কহত হাম ভিখ নাহি লেয়ব
তুয়া মুখ বচন এক চাই
নন্দনন্দন পর যো অভিমানসি
তেজি দেহত ঘর যাই ॥

ভিক্ষা চাই না—চাই তুয়া মুখ বচন। নন্দনন্দন পরে যে অভিমান করেছ তা' ত্যাগ করলে আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে আমি ঘরে যাবো। আশ্চর্য কৌশলে কবি এখানে প্রেমের সূক্ষ্ম গতি-পথ চিহ্নিত করেছেন!

॥ সাত ॥

॥ বিরহের পদ : পরিসমাপ্তি ॥

অভিসারের পদে গোবিন্দদাস যে অসীম শক্তির বিকাশ দেখিয়েছেন বিরহে পদে তাঁর সেই কবিত্ব-বিকাশের এতটুকু স্পর্শও রেখে যেতে পারেননি। বিরহের পদে গোবিন্দদাস নির্জীব। 'আসলে গোবিন্দদাস বেদনার কবি নহেন, আরাধনার কবি। যেখানে আরাধনা মুখ্য, সেখানে গোবিন্দদাস অনতিক্রম্য।' কিন্তু বিরহের মধ্যে আরাধনা নেই সেজন্যে গোবিন্দদাসের বৈশিষ্ট্যও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। তিনি বোধহয় রাধার অন্তরবেদনাকে ঠিক অনুভব করতে পারেননি—তাই বিরহের পদ বর্ণনায় গোবিন্দদাসের স্বভাবজ চিত্রধর্মিতা প্রবল হয়ে উঠেছে, শ্রীরাধার অন্তর বেদনা নয়—বৃন্দাবনের ছবিই প্রধান হয়ে ধরা পড়েছে আর অভিনব রূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে গোবিন্দদাসের অলংকার-প্রিয়তা। মোটকথা ভাবের গভীরতা না থাকলে কাব্যের মধ্যে যে বিষয়গুলি মুখ্য হয়ে উঠে—গোবিন্দদাসের বিরহের পদগুলি সেই সকলের আগমনে অযথা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

বিরহের পদে অসার্থক হলেও গোবিন্দদাসের নাম বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। রূপানুরাগ, রাস এবং অভিসারের পদে তিনি যে অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন তা' চিরদিনই স্মরণ-যোগ্য। এ বিষয়ে কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারেননি—ভবিষ্যতে কারো পক্ষে অতিক্রম করারও সম্ভাবনা নেই। কেননা আধুনিক বাংলা কাব্য রাধা ও কৃষ্ণ, শ্যাম ও শ্রীমতীর হাসি-আনন্দ, বেদন-ব্যথার, মান-অভিমানের পথ হ'তে বহু দূরে সরে এসেছে। 'সম্মুখে যে কষ্টের সংসার' তাই আধুনিক কবিতার উৎস-ভূমি। সুতরাং উল্লিখিত রস-পর্যায়ের পদে গেবিন্দদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ হ'বেন না। গোবিন্দদাস অমর ॥

॥ জ্ঞানদাস ॥

॥ এক ॥

॥ জ্ঞানদাসের কবি-বৈশিষ্ট্য ॥

চৈতন্যোত্তর যুগের বহুতর পদকর্তার মত জ্ঞানদাসেরও ভাবাবেগের উৎস-ভূমি ছিল 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু' শ্রীচৈতন্যদেব। এই মহামানবের প্রেমমূর্তি-খানি আশ্রয় করেই জ্ঞানদাস শ্রীরাধার রূপ-মূর্তি গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু এই মূর্তির মধ্যে রূপ বেশী না রেখা বেশী তা' নিঃসন্দেহে বলা মুস্কিল। চণ্ডীদাসের আত্মহারা ব্যাকুলতাও যেমন জ্ঞানদাসের মধ্যে লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে তেমনি গোবিন্দদাসের ছন্দ-ঐশ্বর্য এবং শব্দ-ঝংকারও তাঁর পদাবলীর মধ্যে বিরল নয়। কেবল ভাব নয় আবার কেবল ভাষা নয়—এ দু'য়ের সমন্বয় ঘটেছে জ্ঞানদাসের মধ্যে। তাঁর কবি প্রতিভার মধ্যে যেমন ছিল প্রখর অনুভূতি তেমনি ছিল ভাবপ্রকাশের অনাড়ম্বর সারল্য। তাই রূপ ও রসের, প্রাণ ও ভংগির সার্থক সংমিশ্রণে তাঁর কাব্য অনবদ্য এবং সুন্দর।

(জ্ঞানদাস ছিলেন লিরিক-প্রতিভার সার্থক উত্তরাধিকারী। তাঁর কবিতা লিরিক-ধর্মী। অন্তরের গভীর অনুভূতি তাঁর কাব্যে সুন্দর হয়ে উঠেছে। কিন্তু আধুনিক কালে লিরিক কবিতার সংগা অনুযায়ী বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের কবিতাকে যে কতখানি লিরিক বলে অবিহিত করা যায় তা' তর্কসাপেক্ষ।) আধুনিক লিরিকে যে মন্ময়তার (Subjectivity) কথা বলা হয় বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে তার যথেষ্ট অভাব। তা' ছাড়াও পদাবলী ধর্মীয় আবেদন সংযুক্ত—এর প্রকাশ রীতিও আধুনিক লিরিক কবিতার মত বহু বিচিত্র নয়। আধুনিক লিরিক কবিতার বিষয়-বস্তু গণ্ডীবদ্ধ নয়—(যে কোন বিষয়ের ওপর লিরিকের সুমধুর গঞ্জন উঠতে পারে কিন্তু পদাবলীতে বিষয় বস্তু বাঁধা)—রাধা ও কৃষ্ণ, শ্যাম ও শ্রীমতিকে ছেড়ে বহির্বিশ্বে পদচারণার শক্তি পদাবলীর কবিদের নেই। (এদিক দিয়ে বিচার করলে জ্ঞানদাসের কবিতাকে লিরিক ধর্মী বলা যায় না বটে কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব জ্ঞানদাসের রাধা ধূলি-মলিন

মর্তেরই এক মানবীয় প্রতিমূর্তি। মান-অভিমানে, প্রেমে-বিরহে জ্ঞানদাসের রাধা যে কথা বলেছেন অনুরূপ অবস্থায় তা' উচ্চারণ করা যে কোন নারীর পক্ষেও সম্ভব। সুতরাং এখানে জ্ঞানদাস রাধার মাধ্যমে সাধারণ নরনারীর হৃদয়বেদনা ও অন্তরার্তিকেই প্রকাশ করেছেন। জ্ঞানদাসের কাব্যের আবেদন এখানেই হ'য়ে উঠেছে সর্বজনীন।) কিন্তু চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধার যে রূপ পাই তা' প্রেম-বিহ্বল সাধারণ নরনারীর রূপ নয়। 'বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে যেমতি যোগিনী পারা'-র মত চিত্র বাস্তব-বিশ্বে পাওয়া যায় না। তাই চণ্ডীদাসের মধ্যে মন্ময়তা থাকলেও তা' সর্বসাধারণের হয়নি এবং এই জন্যেই চণ্ডীদাস খাঁটি অর্থে লিরিক কবি নন। তাঁর কাব্যে প্রেমের গভীরতা আছে কিন্তু রূপসৃষ্টির ক্ষমতাতে তিনি দৈন্য। এদিক দিয়ে জ্ঞানদাস অনেকখানি সার্থক। গভীর অনুভূতির রূপময় প্রকাশে তাঁর কবিতা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। (জ্ঞানদাস ছিলেন রোম্যাণ্টিক কবি—এই রোম্যাণ্টিক আবেগই তাঁর কবিতাকে করে তুলেছে লিরিকধর্মী। সূক্ষ্মঅর্থে, চুলচেরা বিচারে কোন বৈষ্ণব পদকর্তাকে খাঁটি লিরিক কবি বলে অভিহিত করা যায় না তবুও কোন বৈষ্ণব কবিকে যদি লিরিক-ধর্মী বলে আখ্যা দিতে হয় জ্ঞানদাসই সে আখ্যায় ভূষিত হওয়ার উপযুক্ত।) বিদ্যাপতি কিংবা গোবিন্দদাস এই গৌরব পাওয়ার উপযুক্ত নন—কেননা এঁরা উভয়ই প্রতীকধর্মী। (কিন্তু চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস উভয়েই হৃৎ-ধর্মী। তবে "চণ্ডীদাসের রসহিল্লোল জ্ঞানদাসে নাই, গোবিন্দদাসের হীরক-কাঠিন্যও তাঁহাতে পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু লাবণ্যকে অনায়াসবন্ধনে বাঁধিয়া অতি চমৎকার মুক্তহার রচনার গৌরব তাঁহার প্রাপ্য।" (জ্ঞানদাসের রাধা চণ্ডীদাসের রাধার মত যৌবনে যোগিনী নন—'রাঙবাস' অপেক্ষা নীল শাড়ীর দিকে তাঁর পক্ষপাত বেশী। অবশ্য মাঝে মাঝে তাঁর বসনে গেরুয়া রং ধরেছে। তাঁর কণ্ঠেও শোনা গিয়েছে দূরাগত অসীমলোকের ব্যঞ্জনা। ভাবের উচ্চগ্রামে সুর বেঁধে চণ্ডীদাসের রাধা যেখানে সুখদুঃখাতীত হ'য়ে উঠেছেন, চলমান বিশ্বের ধূলিমালিন্যের মাঝে ঘর বেঁধে জ্ঞানদাসের রাধা হ'য়ে উঠেছেন প্রাকৃতধর্মী—লৌকিক।)

বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের পদের মত জ্ঞানদাসের পদ 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র প্রতীক নয়। (এ পদরাজীর মধ্যে রসের যে ফল্গুধারা নিরন্তর প্রবহমান তা' ধীরে ধীরে পাঠকের সমগ্র চিত্তকে রস-সিক্ত করে দেয়।) বিদ্যাপতি-গোবিন্দ-

দাসের পদসমূহে শিল্প এবং শিল্পীর মাঝে যে ব্যবধান রচিত হ'য়েছে জ্ঞানদাসের পদে সে ব্যবধান-চিহ্ন অবলুপ্ত-প্রায়। অবশ্য জ্ঞানদাসের পদাবলী চণ্ডীদাসের পদাবলীর মত অলংকার শূন্য নয়—শব্দালংকার, অর্থালংকার, স্বভাবোক্তি অলংকার ইত্যাদির প্রয়োগ প্রায় সকল পদেই দৃষ্ট হয়—তথাপি সুনিপুণ শিল্প-কৌশলীর মত জ্ঞানদাস এমনভাবে সেগুলিকে মিলিয়ে দিয়েছেন যে অলংকার প্রয়োগের অপপ্রচেষ্টার সকল লক্ষণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আপন স্বভাবে স্বতঃ উৎসারিত বর্ণগরিমায় আপনি বিকশিত হ'য়ে উঠেছে।

লিরিক-ধর্মী জ্ঞানদাসের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাই পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও নিবেদনের পদে। এ ছাড়াও বংশী-শিক্ষা জ্ঞানদাসের অভিনব রচনা। বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যে এ পদ সম্পূর্ণ নতুন।

দুই ॥

॥ পূর্বরাগ ॥

(পূর্বরাগের পদ রচনায় জ্ঞানদাসের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য) এ প্রসঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের আর একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদাবলীর সাথে জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের পদরাজীর আলোচনা করা যেতে পারে। পূর্বরাগের সময় নায়ক-নায়িকার চিত্তের হয় 'চুপি চুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা'। এ জানাশোনার একদিকে আছে অনাস্বাদিত পুলক-বন্যা অন্যদিকে আছে অজানা বেদনার (বিরহের নয়) রোমাঞ্চ। পূর্বরাগের সময় নায়ক-নায়িকার চিত্ত পাওয়া-না-পাওয়ার মাঝে, আনন্দ-বেদনার মাঝে দোলায়িত। কিন্তু চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদে এই আনন্দ এবং উল্লাসের কোন চিহ্ন নেই। সেই যে একদিন কোন শুভ প্রত্যূষে শ্যাম-নাম শ্রবন করেছিলেন সেই হ'তে শান্ত সমাহিত যোগিনী মূর্তিতে নাম যপ করাই হ'য়েছে শ্রীমতীর একমাত্র সাধনা। পূর্বরাগের আনন্দঘন মুহূর্তেও যেন আচম্বিতে বিরহ এসে সবটুকু গ্রাস করে ফেলেছে। (জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের পদরাজীই যেন অধিকতর সার্থক। এখানে আনন্দের সাথে বেদনার অপূর্ব সংমিশ্রন ঘটেছে।)

(জ্ঞানদাসের পদরাজীতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ সম্পন্ন হ'য়েছে দর্শনে। 'সরস সিনান সমাপয়ি' 'হরিণ নয়নী রাই' যখন সহচরী পরিবৃতা হ'য়ে হাস্য-কলতানে

বৃষভানু পুরীতে আসছিলেন তখন কৃষ্ণ দূর হ'তে সেই হাস্থ-বিভোলা গৌর-তনু লক্ষ্য করেছিলেন—এই হল পূর্বরাগের সূচনা। কিন্তু শ্রীরাধার অন্তরে পূর্বরাগের বীজটি রোপিত হ'য়েছে স্বপ্ন-দর্শনে—'স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামলবরণ দে তাহা বিনু আর কারো নই।' তারপর একদিক স্নান সমাপন করে ফেরার পথে শ্রীকৃষ্ণকে চাক্ষুষ অবলোকন করলেন এবং সেই হ'তে স্বপনে-শয়নে, নিদ্রায়-জাগরণে শ্যাম-চিন্তাই তাঁর প্রধান চিন্তা হ'ল।

যমুনার কূলেই যত অঘটন—কদমতলে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁকে দেখেই রাধা যৌবনের বনে মন হারিয়েছেন। যমুনা কূলে শ্যামের আকস্মিক দর্শনে রাধার প্রাণে যে সুগভীর উল্লাস জেগেছে—নিম্নের পদটিতে সেই উল্লাস অপূর্ব গরিমায় বিকশিত :

আলো মুঞি কেন গেলু কালিন্দীর কূলে।
চিত মোর হরিয়া নিল ছলিয়া নাগর ছলে॥

তারপরেই শ্রীরাধিকার কণ্ঠে শুনি :

আলো মুঞি জানো না সই জানো না
জানো না গো জানো না।

ওগো সই আমি যে জানি না—কৃষ্ণ যে ওখানে আছে তা' আমার জানা ছিল না। আমি জানি না সই জানি না—'জানো না গো জানো না'। কী গভীর উল্লাস, কী অসীম ব্যাকুলতা! কৃষ্ণ ওখানে আছে তা' আমি জানতুম না বলেই গিয়েছি—নইলে......নইলে কি তা' একমাত্র রাধাই জানেন। পৃথিবীর আর কোন কবি 'না'-কে দিয়ে যে এভাবে 'হাঁ'-র কাজ করিয়ে নিয়েছেন তা' আমাদের জানা নেই।

প্রথম মিলনের পুলক শিহরণ এবং পূর্বরাগের অঙ্কুর বিকাশের চকিত মুহূর্তটি ধরা পড়েছে এই পদে :

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

রোম্যান্টিক সুর এখানে ভাবের উচ্চ-গ্রাম স্পর্শ করেছে। প্রথম দর্শন—তবুও 'রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল'। এখানেই শেষ নয় রূপ দেখেই অবশেষে রূপ-পাগল তন্বীর মন 'যৌবনের বনে হারাইয়া গেল'। যৌবনের বনে যেদিন হ'তে মন হারিয়ে গেল সেদিন হ'তেই যমুনার ঘাট সম্বল হলো—ঘরে যাওয়ার

পথ তো আর ফুরায় না। আশৈশব এই পথেই শ্রীরাধার প্রতিদিনের পদচিহ্ন পড়েছে। কতটুকুই বা পথ—তবুও সেই পথ আজ অফুরাণ হ'য়ে উঠেছে :

ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ
অন্তরে বিদরে হিয়া না জানি কি করে প্রাণ॥

রোম্যান্টিক রহস্য-ঘন এই বাণী বহু শতাব্দীর পর একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেই পুনরায় শোনা গিয়েছে।

পূর্বেই বলেছি জ্ঞানদান রোম্যান্টিক কবি। রোম্যান্টিকতাই জ্ঞানদাসের কবি-চেতনার মূল সুর। পূর্বরাগের পদ সমূহে এ রোম্যান্টিক আবেশ অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে পরিব্যাপ্ত। পূর্বরাগের তীব্র আকুলতা এবং হৃদয়-ভেদী আকুতি নিম্নের পদটিতে কি সুন্দর ভাবেই প্রকাশিত হ'য়েছে :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

দয়িতের প্রতি অঙ্গ লাগি দয়িতার প্রতি অঙ্গের এই যে গভীর ক্রন্দন, হিয়ার পরশের জন্য হিয়ার এই যে অসীম আকুলতা—Eternal Yearning—এখানে পূর্বরাগের আবেশ-বিহ্বল ব্যাকুল চিত্তের অপরূপ উদ্ঘাটন হ'য়েছে। এবং এই তীব্র আকর্ষণের পরই তিনি আপন গৌর-তনুকে শ্যাম-পদতলে লুণ্ঠিত করে দিয়েছেন :

অযশ ঘোষণা যাক্ দেশে দেশে সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম রাঙ্গাপায় এ তনু সঁপেছি তিল তুলসীদল দিয়া॥

॥ তিন ॥

॥ মিলন এবং আক্ষেপানুরাগ ॥

(মিলনের পদে জ্ঞানদাস যেন অপূর্ব অমৃত-সৌধ রচনা করেছেন। চণ্ডীদাসের মিলনের পদে কোন আনন্দ নেই—এ মিলন বিরহেরই নামান্তর। চণ্ডীদাসের একতারা হ'তে যেন একই সুরে সায়াহ্ন-সমীরণের দীর্ঘশ্বাস বেজে উঠেছে, একে অপরের কোলে অথচ বিচ্ছেদের কথা ভেবে উভয়েই বিরহ-কাতর। জ্ঞানদাসের মিলনের পদরাজী হ'তে বিরহের ম্লান ধ্বনি উত্থিত হ'লেও তা' কোথাও চণ্ডীদাসের পদের মত সকরুণ হ'য়ে ওঠেনি।) এ প্রসঙ্গে

বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের মিলনের পদের আলোচনাও করা যেতে পারে। মিলনের পদে বিদ্যাপতিতে আছে দেহ-ব্যাকুলতা, উল্লাস আর চিত্র-ধর্মিতা আর গোবিন্দদাসে আছে ছন্দ ও শব্দ ঝংকারের অপূর্ব বিন্যাস। কিন্তু জ্ঞানদাসের পদে ওসব নেই—তিনি যেন মিলনের পদের রসমাধুর্যের অতলে তলিয়ে গেছেন। আনন্দ এবং আকুলতা, বেদনা এবং ব্যাকুলতা সকলের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে জ্ঞানদাসের মিলনের পদরাজীতে।

মিলনের পদে জ্ঞানদাসের রাধা শ্যাম ও শ্রীমতীর দুই ভিন্ন দেহ সুনিবিড় একান্তিক মিলনে এক করতে চান। অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ'তে জন্ম গ্রহণ করে তীব্র মিলনাকাঙ্খায় ছুটে এসেছেন যুগযুগান্তের পথ বেয়ে অথচ দেহ ভিন্ন—এ শ্রীমতীর কাছে অসহ্য :

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিত পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গড়ল ভিন ভিন করি দেহা॥

দেহের এ ভিন্ন-ব্যবধান দূর করে দিয়ে নিবিড় মিলনে তিনি এক হতে চান। দেহে চন্দন-চর্চা করলে শ্যামের অঙ্গের সাথে নিজ অঙ্গের পূর্ণ মিলন সম্ভব নয় তাই তিনি চন্দন-চর্চা ছেড়ে দেন :

হিয়ায় হিয়ায় লাগিব বলিয়া চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বাইয়ের দোসর সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥

মিলনের এমন অপূর্ব আকুলতা আর কোন কবির পদে নেই। শ্যাম বুকের উপর অথচ মনে হয়—দূর—দূ-র—কত দূ-র। তাই তিনি নিবিড়ভাবে পেতে চান শ্যামকে, চান দুই দেহ অদ্বৈত সম্পর্কে একীভূত হ'তে।

মিলনের এই তীব্র আকাঙ্খা অন্তরে জেগেছিল বলেই মিলনোচ্ছ্বাসের পদের জ্ঞানদাসের রাধা নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পেরেছেন :

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ওদুটি চরণ সদা লৈয়া রাখি বুকে॥

অন্যত্র :

কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥

এর পর আক্ষেপানুরাগের পদ। চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদের সাথে আমরা জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদের তুলনা মূলক আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

আত্মনিবেদনের পদে জ্ঞানদাসের আকৃতিটুকু এ প্রসঙ্গে তুলে ধরতে চাই। একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব আত্মনিবেদনের পদে হৃদয়-আর্তি এবং চিত্ত-আকুলতায় জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসকে পিছনে ফেলেছেন। জ্ঞানদাসের একটি সুবিখ্যাত আত্মনিবেদনের পদ এই :

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগণ হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলক ছাড়িলাম॥
তুয়া অনুবাগে হাম কাননেতে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চবাই॥

এবং অবশেষে :

তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।

অনুরূপ বলিষ্ঠ পদ গোবিন্দদাসে কোথায়। একমাত্র বিদ্যাপতির পদেই এর সমতুল্য একটি পদের সন্ধান মেলে : 'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই।'

॥ চার ॥

॥ বংশীধ্বনি ॥

পূর্বেই উল্লেখ করেছি বংশী বিষয়ক পদরচনায় জ্ঞানদাস মৌলিক সৃষ্টির অধিকারী এবং এ পদে জ্ঞানদাস দ্বিতীয়রহিত। এখানে বংশী বা মুরলীর অন্তরালে যে তত্ত্বকথা আছে সে প্রসঙ্গের অবতারণার বিশেষ প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন "তত্ত্বের দিক হইতে বৈষ্ণব-কবি-কুলের এই মুরলী বা বংশী তাঁহাদের বর্ণিত প্রকৃতির ন্যায় রূপকের ছায়ায় পরিকল্পিত। এই মুরলীরবের তাৎপর্য ভগবানের ভক্তকে নিকটে আহ্বান করিবার আমন্ত্রণীধ্বনী। সেই সুললিত স্বর লহরী, সেই প্রণব-নাদিনী বংশী ভক্তের সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ ঘুচাইয়া তাঁহাকে মহা আকর্ষণে কৃষ্ণ-সন্নিকটে লইয়া যায়। এই বেণুরবের দ্বারা ভগবানের আকর্ষণী Symbolised হইয়াছে। ...চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের মুরলী যেন সদাই সজীব। ইহার প্রতিরন্ধ্রের সুর যেন বিশ্বপ্রকৃতির মর্মের এক একটি ধর্মের ধ্বনিরূপ। ইহার প্রতাপ ও ক্ষমতা অপরিসীম।"
যে বাঁশীর গান শুনে রাধা বনবাসিনী হ'য়েছেন, কুল-শীল-জাতি-মান বিসর্জন দিয়ে পাগলিনী হ'য়েছেন সে বাঁশী কেমন ভাবে বাজে তা' জানবার দুর্বার আগ্রহ শ্রীরাধার :

কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান।
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান ॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত।
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরিল হে চিত ॥

অবশেষে রাধা বংশী-শিক্ষার ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ করেন :

ঘর হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবারে।
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন বাঁশী শিক্ষার জন্যে রমণী বেশ পরিত্যাগ করে পুরুষ বেশ ধরতে হ'বে এবং গৌর অঙ্গ-শ্রী ত্যাগ করে কৃষ্ণ বর্ণ হ'তে হ'বে। রাধা বলেন : 'সোনার বরণ বন্ধু কালী হতে পারি। তোমা হেন নিলাজী হইতে নাহি পারি।' কালি মেখে গৌর বর্ণকে কাল করা সহজ কিন্তু শ্যামের মত শ্যাম রূপ (নিলাজী) ধরা যে অসম্ভব। অবশেষে কৃষ্ণের সহায়তায় রাধার বাঁশী-শিক্ষালাভ :

এক রন্ধ্রে ফুঁক তবে দেয় রাধা কানু।
রাধা শ্যাম দুটি নাম বাজে ভিন্নু ভিন্নু ॥

॥ পাঁচ ॥

॥ বিরহ ॥

বিরহের পদে জ্ঞানদাস যে পর-চৈতন্য যুগের শ্রেষ্ঠ কবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পূর্বে আমরা জ্ঞানদাসকে রোম্যান্টিক ভাবধারার কবি বলেছি। রোম্যান্টিক মনোভাবের সাধারণ গতি বিষণ্ণতার দিকে। এই বিষণ্ণতাই অনবদ্য লাবণ্য-শ্রীতে মনোহর হয়ে উঠেছে জ্ঞানদাসের পদাবলীতে। হৃদয়ের ব্যাকুল বেদনা, গভীর বিরহ-মূর্চ্ছনা জ্ঞানদাসের পদাবলীর সাধারণ অলঙ্ভূষণ। মিলনের মহান-মুহূর্তেও বেদনার ছায়াপাত হয়েছে অসংখ্য পদরাজীতে :

তিলে কত বেরি মুখ নেহারয়ে
আচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে
তেঞি সদা লয়ে নাম ॥

অন্যত্র :

হিয়ার উপর হৈতে শোনে না ছোঁয়ায়। বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
নিদের অলসে যদি পাশ মোড় দিয়ে। কি ভেল কি ভেল বলি চম্কি উঠিয়ে ॥

বিরহের সাথে বাদল-ধারার বুঝি এক নিবিড় যোগ আছে। সকল বৈষ্ণব কবিই শ্রাবণ অথবা মহা ভাদরের পটভূমিতে শ্যাম-প্রিয়ার বেদনার্ত হৃদয়ের করুণ হাহা-কারের বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানদাসও এর ব্যতিক্রম নন। অবিরল ধারায় শ্রাবণের বাদল নেমেছে। রজনী গভীর, বজ্রের ডাকে চারদিক গম্ভীর-প্রকম্পিত —এমন নিশাথেই তো প্রিয়জন আঁখির পাতায়, গহন মনে নিবিড় হয়ে ধরা দেয়। রহস্যময় বর্ষার আবেষ্টনীতে, অপরূপ শব্দ-ঝংকারে এবং অপূর্ব চিত্র-গরিমায় জ্ঞানদাসও প্রিয়ের আগমন-বার্তা জানিয়েছেন :

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝি ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেনকালে॥

এই অপূর্ব পদটি রবীন্দ্রনাথকেও বিমুগ্ধ করেছিল। তিনি লিখেছেন : "অন্ধকার বাদলা রাতে মনে পড়ছে ঐ পদটা, রজনী শাঙনঘন ঘনদেয়া গরজন··· । সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে কোন একটি মেয়ে ছিল। ভাল-বাসার কুঁড়ি-ধরা তার মন, মুখচোরা সেই মেয়ে, চোখে কাজল পরা। ঘাট থেকে নীল সাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা। সে মেয়ে আজ নেই। আছে শাঙন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন, আজো সমানই।"

জ্ঞানদাস মাধুর্যরসের কবি। কেবল উল্লাস, বা কেবল আনন্দে তিনি মত্ত নন। তাই রাধিকার বিরহ-দশা বর্ণনায় কোথাও তীব্র আবেগ নেই, উত্তেজনা নেই —সর্বত্রই একটি শান্ত-মাধুর্য আপন-আবেগে প্রকাশিত হয়েছে। এই মাধুর্য কথা সে বিরহের উত্তাপে ঈষৎম্লান কখনো অভিমানের রঙে রঙীন। চিত্তের তীব্র-দাহ বিরহ-বেদনা ক্ষোভের মাধ্যমে মাধুর্যরসাশ্রয়ী :

সোনার বরণ দেহ। পাণ্ডর ভৈগেল সেহ॥
গলয়ে সঘনে লোর। মুরছে সখীক কোর॥
দারুণ বিরহ জ্বরে। সো[ধনী গেয়ান হরে।
জীবনে নাহিক আশ। কহএ এ জ্ঞানদাস॥

কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরটি আর একটি পদে সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে :

পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধারল
দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল
বরিখে বরিখে কত ভেল॥

এবং অবশেষে সর্বশেষ অভিযোগ :

মাধব কৈছন বচন তোহার।

এখানে একটি বিরহ-কাতর কণ্ঠ ধীরে ধীরে সরব হয়ে উঠেছে কিন্তু এই সরব কণ্ঠের কোথাও তীব্রতা নেই। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে এই অভিযোগও উত্তাপহীন—মাধুর্যরসে সিক্ত। জ্ঞানদাসের নিম্নোধৃত চির বিখ্যাত পদটিরও আভ্যন্তরীন সুর-মাধুর্য লক্ষণীয়। কেবল আত্মক্ষোভই এই পদের একান্ত সম্বল—কোথাও এতটুকু বিদ্রোহ-বাণী নেই, এতটুকু উত্তেজনা নেই, একটি বর্ণও উত্তপ্ত নয়। সর্বত্রই বেদনা-সিক্ত ঐকান্তিক আক্ষেপের ম্লান ছায়া ধীরে ধীরে নেমে এসেছে :

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিলুঁ
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

মাধুর্য রসের ভিতর দিয়ে মানব-হৃদয়ের একটি চিরন্তন আক্ষেপ অপরিসীম ভাব-সুষমায় মণ্ডিত হয়েছে। চাঞ্চল্য-বৈচিত্র্যের তলদেশ হ'তে প্রেমের এই বেদ-বাণী উচ্চারিত—মহাকবির মহাদৃষ্টির সুমহান সম্ভার।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি জ্ঞানদাসের রাধিকা বিরহের অনন্ত পারাবারে নিমজ্জমান হ'য়েছেন—তাঁর কণ্ঠ এখানে শান্ত, উত্তাপহীন। কিন্তু বিরহের সর্বত্রই জ্ঞানদাসের রাধিকাকে এমন শান্ত অবস্থায় দেখা যায়নি—মাঝে মাঝে তাঁর কণ্ঠ হ'তে শ্যামের প্রতি অভিযোগ এমন কি শ্লেষবাক্যও ধ্বনিত হ'য়েছে। নিম্নের উদ্ধৃত পদগুলির দিকে লক্ষ্য রাখলেই এ কথা বোঝা যাবে :

যখন আমাকে সদয় আছিলা পিরিতি করিলা বড়।
এখন কি লাগি হইলে বিরাগী নিদয় হইলে দড়॥

অন্যত্র :

তোমার পিরিতি দেখিতে শুনিতে যে দুঃখ উঠিছে চিতে।
সে নারী মরুক যে করে ভরসা তোমার পিরিতি রীতে॥

কিন্তু এমন অংশ জ্ঞানদাসের বিরহের পদে খুব বেশী নেই। আমরা পূর্বেই বলেছি জ্ঞানদাসের রাধিকা চণ্ডীদাসের রাধিকার মত বিরহে যোগিনী না হ'লেও তাঁর বসনে গেরুয়া রং লেগেছে :

মুড়াব মাথার কেশ ধরিব যোগিনী বেশ যদি সই পিয়া না আইল।
এ হেন যৌবন পরশ রতন কাচের সমান ভেল॥
গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব শঙ্খের কুণ্ডল পবি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেখানে নিঠুর হবি॥

বিরহের দিনগুলিতে রাধিকা অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হন—তাঁর 'অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরে হিয়া।' এভাবে বিদগ্ধ হওয়ায় দিনে দিনে তাঁর তনু ক্ষীণ হ'য়ে আসে। সখীগণ এসে সমবেদনা জানায়। শ্রীমতী বলেন দেহের লাবণ্যশ্রী নষ্ট হওয়ায় তাঁর দুঃখ নেই—দিনের পর দিন তনু ক্ষয় হ'তে হ'তে বড় জোর মৃত্যু এসে গ্রাস করবে কিন্তু সব থেকে বড় দুঃখ :

পুনঃ নাহি হেরব সো চান্দ বয়ান।

পুনরায় সে চাঁদ মুখ দেখব না—এটাই বড় দুঃখ। এ প্রেম একান্তভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়। কামনার এতটুকু গন্ধ এতে নেই। এই কামনাশূন্য প্রেমের বিরহের পদ-রূপায়ণে চণ্ডীদাস অদ্বিতীয় আর জ্ঞানদাস অতৃতীয়।

জ্ঞানদাস বাংলা, ব্রজবুলি এমন কি বাংলা-ব্রজবুলি মিশ্রিত ভাষাতেও পদ রচনা করেছেন। তবে যে পদগুলি জ্ঞানদাসের উচ্চতর কবি-মানসকে জনসমক্ষে প্রকাশিত করেছে (Represent) সেগুলি প্রায় বাংলায় রচিত। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদসমষ্টি কেবলমাত্র জ্ঞানদাসের পদসংখ্যাই বাড়িয়েছে—এর মাঝে কোন উৎকর্ষ নেই।

॥ মহাজন চতুষ্টয় ॥

॥ এক ॥

॥ মহাজন চতুষ্টয়ের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা ॥

পদাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা মহাজন চতুষ্টয়ের মনোভংগী এবং পদের শিল্প-বিন্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছি এখানে তার সার সংকলন করব। প্রথমেই ভাবগভীরতা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ভাবগভীরতা ঃ ভাবগভীরতার দিক দিয়ে চণ্ডীদাসের সমকক্ষ শিল্পী সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে বিরল। চণ্ডীদাসে আমরা যা পেয়েছি অন্য কোন মহাজন কবির পদে তা' পাইনি। আত্মতন্ময়তার জন্যে ভাবের উচ্চ-গ্রামে সুর বেঁধে চণ্ডীদাস যে রহস্যময় অতীন্দ্রিয়লোকে উন্নীত হ'য়েছেন অন্য কোন পদকর্তার পক্ষে সেখানে পৌছান সম্ভব হয় নি। জ্ঞানদাস মাঝে মাঝে সেই অতীন্দ্রিয়-ভূমির প্রান্ত-সীমা স্পর্শ করেছেন মাত্র। ভাবের ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস অদ্বিতীয় আর জ্ঞানদাস হ'লেন অতৃতীয়। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে বিদ্যাপতিকে ভাবগভীরতার কবি বলা চলে না কিন্তু বিরহের পদে তিনি অনেকখানি ভাব-তন্ময়তা প্রাপ্ত হ'য়েছেন। বিরহের পদ রচনায় বিদ্যাপতির স্বভাব বাক্-চাতুর্য, চিত্রধর্মিতা এবং চটুলতা ঝরে গেছে—এ পদে তিনি যেন অনেকখানি আত্মতন্ময়তা প্রাপ্ত হ'য়েছেন। সুগভীর আত্মতন্ময়তার জন্যে চণ্ডীদাসের কাব্যে 'কবি-ব্যক্তিত্ব' নেই—আপন ব্যক্তিত্বকে তিনি স্বতোৎসারিত পদাবলীর মধ্যে লীন করে দিয়েছেন। তাঁর পদাবলী যেন জ্যোৎস্না-স্বচ্ছ জলধারার মত স্বতঃস্ফূর্ত। জ্ঞানদাসের পদাবলীতে মাঝে মাঝে আত্মবিভোরতার ভাব ফুটেছে, মাঝে মাঝে তাঁর পদরাজীতে 'কবি-ব্যক্তিত্ব' নেই বলে মনে হয় কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাঁর অধিকাংশ পদে চণ্ডীদাসের আত্মহারা ভাব-ব্যাকুলতার সাথে মিশেছে 'আপন মনের মাধুরী', আত্মতন্ময় হয়েও যেন তিনি আপন ব্যক্তিত্বটুকুকে নিঃশেষে ঝরিয়ে দিতে পারেন নি। যৌবনের বনে মন হারানোর পরও ভাবের সাথে কাব্যরীতির একটা স্পষ্ট ব্যবধান গড়ে উঠেছে।

এবং সেজন্যেই জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয়ত ঠিক নয়, হয়তো জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের কাব্যের দ্বারা কিছু প্রভাবিত হয়েছিলেন কিন্তু চণ্ডীদাস সমগ্র পদসাহিত্যের মধ্যে স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক, উচ্চতম ভাব-শীর্ষের প্রতীক। বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসে তো 'কবি ব্যক্তিত্ব' ফুটেছে সমধিক। এঁদের কাব্যে ভাব এবং রীতির মধ্যে ব্যবধান দুরতিক্রমী হয়ে উঠেছে। উভয় কবিই বস্তুতে বিভোর হয়েছেন কিন্তু আত্মবিস্মৃত হননি, উভয় কবির কাব্যেই বস্তুবিভোরতা ফুটেছে কিন্তু আত্মতন্ময়তা ফুটেনি ফলে এঁদের কাব্যের সর্বত্রই ভাবের সাথে রূপের, শিল্পের সাথে শিল্পীর, মনের সাথে মননের একটি শঙ্কাতুর ব্যবধান রয়ে গেছে। ভাবগভীরতার জন্যেই চণ্ডীদাসের কাব্য রোম্যান্টিকতার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্তর অতিক্রম করে মিস্টিসিজ্‌মের প্রশান্তির মধ্যে পরিব্যাপ্ত। কবি-ব্যক্তিত্বকে ঝরিয়ে দিয়ে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে তিনি ভাবের এমন উন্নত সৌন্দর্য-সৌধে উপনীত হয়েছেন যে স্তরে তিনি লাভ করেছেন সুরধনী-তীরের পরম অদ্বয় সত্যকে, এ স্তরে চিত্তের কোন ব্যাকুলতা নেই, না-পাওয়ার কোন তীব্র বেদনা নেই। এখানেই চণ্ডীদাস মিস্টিক। কিন্তু জ্ঞানদাস মিস্টিসিজ্‌ম্-এর এ উন্নত স্তরে উপনীত হতে পারেন নি—তাঁর চিত্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে দোলায়িত, পাওয়া-না-পাওয়ার বেদনায় বিক্ষুব্ধ সুতরাং জ্ঞানদাস একান্ত ভাবেই রোম্যান্টিক। অবশ্য মাঝে মাঝে তাঁর কাব্যে মিস্টিসিজমের রং লেগেছে। বিদ্যাপতিও রোম্যান্টিক কবি আর গোবিন্দদাসের কাব্যে ছদ্ম রোম্যান্টিকতার সাথে এসে মিশেছে ক্লাসিক্যাল বৈভব।

শিল্পময় প্রকাশ: ভাবগভীরতার পর গঠন-রীতির আলোচনা। রূপ এবং ভংগীর আলোচনায় আমাদের বিশেষ রূপে লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'বে ছন্দ, অলংকার, ধ্বনি-বৈচিত্র্য ইত্যাদির দিকে। পদাবলীর আলোচনায় আমরা বহুবার উল্লেখ করেছি প্রাণ এবং ভংগী নিয়েই গড়ে ওঠে আদর্শ কাব্য। এই প্রাণ এবং ভংগী, রস এবং রীতি আবার নির্ভর ক'রে কবির দ্বৈত-সত্তার ওপর। কবি একাধারে রূপ-দ্রষ্টা এবং রূপ-স্রষ্টা। রূপ-দ্রষ্টায় গড়ে ওঠে রস এবং রূপ-স্রষ্টায় গড়ে ওঠে রীতি। রূপ-দ্রষ্টায় কবি দর্শক এবং ভাবুক রূপ-স্রষ্টায় তিনি এই চিন্তা-ভাবনাকে রীতির মধ্য দিয়ে রসায়িত করে তোলেন। এই উভয়ের মণিকাঞ্চন যোগ পদাবলীর মহাজনদের কারো মধ্যে সংগঠিত,হয়নি। চণ্ডীদাস যত বড় রূপ-দ্রষ্টা তত বড় রূপ-স্রষ্টা নন। তাঁর হৃদয়ের দুর্নিবার ভাব-বন্যায় গঠন-

রীতি ভেঙে গিয়েছে ফলে শিল্পময় প্রকাশ ভংগীতে চণ্ডীদাস নিতান্ত দুর্বল। রূপ নয় রসের দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল বেশী। সরল সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় তিনি যা' প্রকাশ করেছেন তা'তে আর যাই প্রকাশ পা'ক্ শিল্প-রীতি নয়। বিদ্যাপতি এদিক দিয়ে বলিষ্ঠ। ভাবগভীরতায় তিনি চণ্ডীদাসের উপরে উঠতে পারেন নি কিন্তু রূপ-স্রষ্টায় তিনি প্রায় নির্দোষ। চণ্ডীদাসের উপরে তাঁর স্থান। ছন্দ-হিল্লোল, অলংকার নিক্কন, ধ্বনি-বৈচিত্র্য প্রভৃতি তাঁর পদাবলীকে এক অপূর্ব গঠন-গরিমা দান করেছে। এই গরিমার পূর্ণতম বিকাশ দেখি গোবিন্দদাসে। গোবিন্দদাস বটতলার কবি নন, বড়বাজারের ব্যবসায়ীও নন তিনি এ সবের উর্ধে এবং সম্ভ্রান্ত আভিজাত্যের প্রতীক। তাঁর কাব্যের ছন্দ-বিন্যাস যেমন নিখুঁত শব্দ-ঝংকারও তেমনি অদ্ভুত। একে অপরের পরি-পূরক হয়ে তাঁর সমগ্র পদাবলীকে এক অনন্য আভিজাত্য দান করেছে। গঠন-রীতির দিক দিয়ে বিদ্যাপতির সাথে গোবিন্দদাসের সব থেকে বড় পার্থক্য এই যে বিদ্যাপতির কাব্যে ছন্দ অলংকার ধ্বনি সকল কিছু থাকা সত্ত্বেও যেন রূপসম্পূর্ণতা—Finishing touch—নেই, কোথায় যেন তাল কাটা—কোন ফাঁকে যেন কি একটা খুঁত রয়ে গেছে। এই সকল অভাব অনটন দূর হয়েছে গোবিন্দদাসের কাব্যে। গোবিন্দদাসের কাব্যেই ঘটেছে সুরের সম্পূর্ণতা। বিদ্যাপতির কাব্য যেখানে বাক্য-জালের জটিলতায় জড়িয়ে নিরস, গোবিন্দদাসের কাব্য সেখানে রসস্ফূর্ত। তাঁর কাব্য-দেহ নিটোল। রূপসম্পূর্ণতা বা finishing touch এই নিটোলতায় দান করেছে অপূর্ব লাবণ্য-শ্রী। ফলে গঠন-রীতির দিক দিয়ে গোবিন্দদাসের কাব্যই সর্বোৎকৃষ্ট। জ্ঞানদাস যেন সাবধানী পথচারীর মত মাঝপথ অবলম্বন করেছেন। চণ্ডীদাসের কাব্যের আত্মহারা ব্যাকুলতাও নয় আবার বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের বিপুল বর্ণচ্ছটাও নয়—তিনি এ দু'য়ের মধ্যবর্তী। তাই জ্ঞানদাসের কাব্যের এক কোটিতে আছে ভাব-বিহ্বলতা অন্য কোটিতে আছে ছন্দ-মাধুর্য। বলাবাহুল্য এ দু'টির কোনটিই জ্ঞানদাসের কাব্যে একান্ত হয়ে ওঠেনি—হ'লে জ্ঞানদাসের পদাবলীই হয়তো সমগ্র পদ-সাহিত্যের মধ্যমণি হয়ে উঠ্‌তো।

গীতি-ধর্মিতা: এরপর মহাজন চতুষ্টয়ের পদাবলীর গীতিধর্মিতার আলোচনা। ,পদাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বহুবার বলেছি বৈষ্ণব-পদাবলীকে ,গীতি-কাব্যের এলাকায় প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র দেওয়ার পথে

বাধা অনেক। গীতি-কবিতা কবির মর্ম-নির্যাস। কবির নিভৃতমনের বাসনা-কামনার, ব্যথা-বেদনার আলোড়ন স্পন্দনই গীতি-কবিতার প্রাণ-সম্পদ। কোন উপাখ্যান রচনা নয়, কোন সুবিপুল ভাব-কল্পনা নয়,—একটিমাত্র ভাব গীতি কবিতার মধ্যে ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার উত্তাপে মুক্তা-নিটোল হ'য়ে লিরিকের সুকোমল সুরে প্রকাশ পায়। মানুষের গহনতম হৃদয়ের সুনিবিড় রসানুভূতিগুলি ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে অপূর্ব দীপ্তিতে ঝলকিত হয়ে ওঠে, সুতরাং গীতিকবিতা মানুষের মনের কথা, অন্তরের বাণী। ব্যক্তিস্বরূপ এখানে সুস্পষ্ট। কিন্তু পদাবলীতে এই ব্যক্তিস্বরূপ খণ্ডিত। কবির স্বতঃস্ফূর্ত আত্মার চিন্তা-ভাবনার বিকাশ এ'তে নেই। এখানে কবি-কল্পনার চারণ-ভূমি সীমিত। রাধা-কৃষ্ণ এবং শ্যাম-শ্রীমতী ছাড়া অন্য কোন কল্প-বস্তুর প্রবেশাধিকার নেই। এখানে কবির চিন্তা-ভাবনা 'আত্মেন্দ্রিয়' নয়—'কৃষ্ণেন্দ্রিয়'। পদাবলীকে গীতি-কবিতার পর্যায়ে ফেলার সব থেকে বড় বাধা এখানে। তবুও একান্তভাবে কোন মহাজনের পদাবলীকে যদি গীতিকাব্যের এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হয়—নিঃসন্দেহে তিনি হলেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাসের পদাবলী কৃষ্ণেন্দ্রিয় হ'য়েও অনেকখানি আত্মেন্দ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। তাঁর শ্যাম ও শ্রীমতীর মুখে যে বাণী ধ্বনিত হ'য়েছে তা' অনেকখানি মানবায়িত, সে যেন কবির হৃদয়োপলব্ধিজাত সত্যের বিনির্ঘোষণা। আনন্দে-উল্লাসে, বিরহে-বেদনায় জ্ঞানদাসের রাধা যে কথা বলেছেন অনুরূপ অবস্থায় যে কোন নারীর পক্ষেই তা' বলা সম্ভব। জ্ঞান-দাসের প্রিয়াই তাঁর পদাবলীতে রাধা রূপে রূপান্তরিতা। এই 'আত্মেন্দ্রিয়' ভাবের সাথে, ভাষার সারল্য এবং সুর-বৈচিত্র্য মিশে জ্ঞানদাসের পদাবলীকে একান্তভাবে লিরিক-ধর্মী করে তুলেছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষায় লিরিকের লাবণ্য-লহরী অনুভব করা যায় কিন্তু ভাবের দিক তিনি এমন উচ্চ গ্রামে সুর বেঁধেছেন যেখানে পৌছান রক্তমাংসের নরনারীর পক্ষে সম্ভব নয়, ভাবের দিক দিয়ে তিনি একান্তভাবেই কৃষ্ণেন্দ্রিয়, সীমিত এলাকার পথিক। এখানে ব্যক্তি-স্বরূপ খণ্ডিত, এভাবে ভাবিত হওয়া একমাত্র মহাভাবস্বরূপা রাধার পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং চণ্ডীদাস লিরিক কবি নন। তাঁর পদাবলী গীতি-ধর্মী হ'য়েও গীতি-সর্বস্ব হ'য়ে উঠ্‌তে পারেনি। গোবিন্দদাস এবং বিদ্যাপতির কাব্যেও জ্ঞানদাসের মত Lyrical toune নেই। এঁদের উভয়ের কাব্যের বিপুল বর্ণচ্ছটা এবং শব্দ-ঝংকারের অন্তরালে গীতিকাব্যের

সুকোমল সুরটি চাপা পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে কাব্যের মধ্যে ছন্দের বলিষ্ঠ বাঁধুনি এবং শব্দ-ঝংকারের ঝঞ্ঝনা এলেই লিরিকের লাবণী ক্ষুণ্ণ হ'তে বাধ্য। পূর্বেই বলেছি বিদ্যাপতি জীবন-রসিক কবি, তাঁর রাধাও তাই চণ্ডীচাসের রাধার মত অতীন্দ্রিয়লোকবাসিনী দেবী না হ'য়ে মর্তেরই মানবী হ'য়ে উঠেছেন, এঁর রাধার মধ্য দিয়ে কবির 'আত্মেন্দ্রিয়' স্বরূপটি অনুভব করা যায় তথাপি শব্দ-ছন্দ-বিন্যাসের দিকে অত্যধিক মনোযোগী হওয়ায় তাঁর পদাবলী লিরিক ধর্মী হয়ে উঠ্‌তে পারে নি। তা' ছাড়াও শব্দপ্রয়োগ এবং ছন্দ-বিন্যাসের দিকে অত্যধিক মনোযোগী হওয়ায় করিব কাব্য অধিকাংশ স্থলে নিরস হ'য়ে উঠেছে। গোবিন্দদাসের শব্দ-ঝংকার ও ছন্দ-বিন্যাসের মধ্যে বিদ্যাপতির এই নিরস কাঠিন্য নেই—সেখানে শব্দ-ঝংকারের সাথে সাথে একটি সুর-ঝংকারও স্পন্দিত হয়েছে তথাপি গোবিন্দদাস লিরিক-ধর্মী কবি নন। শব্দ-ঝংকারে যে সুরধ্বনি উত্থিত হ'য়েছে তা' গিটারের টুং টাং শব্দ—লিরিকের সায়াহ্নকোমল পূরবীর তান নয়। তা' ছাড়াও গোবিন্দদাসের চিন্তা-ভাবনা একান্ত ভাবেই কৃষ্ণেন্দ্রিয়, ব্যক্তি-বাসনার ক্ষীণ প্রবেশও সেখানে নেই। তাঁর রাধা তাই 'রাধা'ই—শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তির প্রতীক। সুতরাং ছন্দ-শব্দের বিন্যাস ছাড়া ভাবের দিক দিয়েও তিনি লিরিক-ধর্মী নন। গীতিকাব্যের সুর-বৈচিত্র্যের সাথে অনুভূতির গভীরতা, হৃদয়ধর্মের সাথে ব্যক্তিমানসের প্রকাশ, মননের সাথে মন্ময়তার সকল লক্ষণগুলি জ্ঞানদাসের মধ্যে সুন্দর রূপে প্রকাশিত। সুতরাং মহাজন কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাসই যথার্থ লিরিক-প্রতিভার উত্তরাধিকারী। পূর্বের উদ্ধৃতির সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে এ মন্তব্যের যাথার্থ প্রমাণিত হ'বে—এখানে উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

রাধা: এবার মহাজন চতুষ্টয়-স্রষ্ট রাধা-স্বরূপের কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই চণ্ডীদাসের রাধা। আমরা পূর্বের আলোচনায় বহুবার বলেছি চণ্ডীদাসের রাধা অতীন্দ্রিয়লোক অধিবাসী। তাঁর রাধার কণ্ঠ হ'তে যে বাণী ঝংকৃত হ'য়েছে তা' রক্তমাংসে গড়া তন্বী তরুণীর বাণী নয়—এ সুরে লেগেছে আর এক ভাবের রং। চণ্ডীদাসের রাধা সুখ দুঃখের অনেক উর্ধে। সুখের লীলা-চঞ্চলতার সময় এ-রাধার বাণীতে মিশেছে বিরহের ক্রন্দন। আবার এ বিরহের মধ্যে অনুতাপ নেই, আক্ষেপ নেই, বেদনা নেই, ব্যথা নেই —কস্তুরী-ধূপের মত জ্বলে জ্বলে নিজেকে বিলীন করে দেওয়াই যেন এ বিরহের

এক মাত্র উদ্দেশ্য। তাই চণ্ডীদাসের রাধা সুখেরও নন, দুঃখেরও নন—সুখ-দুঃখাতীত এক অপার্থিব সৌন্দর্যের প্রতীক। তিনি রাধিকা নন—চির-আরাধিকা, কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির বহির্বিকাশ। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাস সকলের রাধিকাই নীল শাড়ীর পক্ষপাতী, নীল শাড়ীতেই যেন তাঁদের ভাল মানায় কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধিকা 'রাঙ্গাবাস' অঙ্গে ধারণ করে যোগিণী সেজেছেন। এ সজ্জাই শান্ত অশ্রুমতী রাধার সমগ্র চিত্তকে আমাদের সম্মুখে বিকশিত করে তুলেছে। চণ্ডীদাসের রাধার মধ্যে তিলে তিলে নতুন হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নি—তিনি 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' ধ্যান-গম্ভীর যৌবনা মূর্তিতেই আবির্ভূতা হয়েছেন। এ রাধা যে কোনদিন বালিকা ছিল, কোন শান্ত গৃহাঙ্গণে বয়ঃসন্ধির দুর্লভ-বিরল রোমাঞ্চকর মুহূর্তে সমীরণের মর্মরে যে বাঞ্ছিতের আগমন-প্রতীক্ষায় হরিণীর মত চকিতে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠেছিল তা' যেন আমাদের বিশ্বাসই হয় না। কাব্য-তীর্থে প্রথম আবির্ভাবের সাথেই ইনি পূর্ণ শ্যামল যৌবনা—কৃষ্ণপ্রেমের আত্ম-হারা ব্যাকুলতায় ধ্যান-গম্ভীর। শ্যামের কথা স্মরণ করতে করতে তাঁর "চৈতন্য লুপ্ত কি প্রবুদ্ধ" তা' বোঝা দুষ্কর। এ রাধা সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা যৌবনে যোগিণী নন—প্রথম সাক্ষাতেই আমরা তাঁকে লীলা-চঞ্চল কিশোরী হিসেবে পেয়েছি। বয়ঃসন্ধির সদা-চঞ্চল মুহূর্ত হ'তে তিনি ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত কমলিনীর মত আমাদের সম্মুখে বিকশিত হ'য়ে উঠেছেন। এ রাধা তিলে তিলে নতুন হয়েছেন, ক্ষণে ক্ষণে স্বরূপ পাল্টেছেন—আহ্লাদে আত্মহারা আবার বেদনায় বিহ্বল। এ রাধার আত্মগৌরব আছে—সকল কিছুই কৃষ্ণপদে বিলীন করেন নি। এ রাধা প্রেমে যেমন আত্মহারা তেমনি আত্মাভিমানে মুখরাও। তবে প্রাক্-যৌবনের এই সদা চঞ্চল গতি এবং মুখরা বাক্-ভংগী উত্তর-যৌবনে শান্ত এবং সমাহিত। বিরহের পদে এ রাধা 'রাধা'ই, আপন অটল-বৈভবে স্ব-প্রতিষ্ঠিত। গোবিন্দদাসের রাধা সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। কেবল অভিসারের পদ ছাড়া এঁর রাধার মতের সাথে কোন যোগ আছে বলে মনেই হয় না। তবে এ রাধার মধ্যে প্রেমের যে সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি দেখছি তা অন্যকোন কবির রাধার মধ্যে নেই। এ রাধা বিরহেরও কাতর, এ-রাই বিরহে "শিশিরমথিতা পদ্মিণীর ন্যায় শ্লথবন্ধন হইয়া কাতর বিলাপ করেন" কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা বিলাপ করেন না—বলিষ্ঠ বেদনায় সে গরল-নির্যাস আকণ্ঠ

পান করেন। জ্ঞানদাসের রাধিকা লৌকিক—প্রাকৃত-ধর্মী। সংসারের আর পাঁচজন তরুণীর মত তিনি আনন্দে উল্লাস, অপমানে ক্ষোভ, বিরহে বেদনা অনুভব করেন। এ রাধাও মাঝে মাঝে যোগিনী সাজে প্রস্ফুটিত কমলের মত উর্ধমুখী হ'য়ে অসীমলোকের ব্যঞ্জনা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার মত যোগিণী সেজে অসীমলোক-সমাসীন হ'য়ে মাটীর যোগ হারাননি। তাই এ রাধার প্রিয়-প্রত্যাশায় যেমন 'পন্থ নেহারিতে নয়ন আন্ধাওল' হ'য়েছে তেমনি বিরহের ক্লান্ত-মুহূর্তে শ্লেষবাক্যও প্রয়োগ করতে পিছপা হননি 'চপল চরিত তুয়া চপল বচনে আর কতই করব বিশোয়াস'। এই সসীম-অসীম উভয়ের আন্দোলনেই জ্ঞানদাসের রাধিকা সম্পূর্ণা।

রসপর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদ্র: মহাজন চতুষ্টয়ের পদাবলীতে কোন্ রসপর্যায়ের পদ রচনায় কে সর্বশ্রেষ্ঠ কেবল কয়েকটি ক্ষেত্রছাড়া নিঃসংশয় হ'য়ে তা' বলা মুস্কিল। চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ এবং বিরহের সাথে জ্ঞানদাসের পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ এবং বিরহের পদগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ পদ সমূহে কা'কে যে শ্রেষ্ঠ বলা যায় তা' তর্কসাপেক্ষ। তবে এইটুকু বলা যায় বিরহের পদে চণ্ডীদাসের সমকক্ষ শিল্পী সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে দ্বিতীয় নেই। চণ্ডীদাসের কি পূর্বরাগ, কি আক্ষেপানুরাগ, কি বিরহ সকল পদের মধ্য হ'তেই অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত বিরহের বাণীমন্ত্র গুঞ্জিত হ'য়েছে। বিরহের শান্ত অশ্রুজলে সকল পদ সিক্ত। সুতরাং চণ্ডীদাস একান্তভাবে বিরহের কবি—এ রসপর্যায়ে তিনি দ্বিতীয়রহিত। পূর্বরাগের পদে চণ্ডীদাসকে হয়ত অদ্বিতীয় বলা চলে না—কেননা পূর্বরাগের পদে আনন্দের সাথে বেদনার (বিরহ নয়) যে সংমিশ্রণ ঘটে তা' চণ্ডীদাসে নেই—বিরহের সরব কণ্ঠ এ পদে ক্রমোচ্চ হ'য়ে উঠেছে। এদিক দিয়ে পূর্বরাগের পদে জ্ঞানদাসের কৃতিত্ব স্মরণীয়। তাঁর পূর্বরাগের পদে আনন্দ এবং বেদনার সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। আক্ষেপানুরাগের পদেই তাঁর কৃতিত্ব আমাদের মুগ্ধ করে। চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে কোন ক্ষোভ নেই কিন্তু জ্ঞানদাসের পদে হৃদয়ভেদী আক্ষেপের সাথে মিশেছে দুরন্ত ক্ষোভ। কিন্তু আক্ষেপানুরাগের পদে কোন ক্ষোভ না থাকাই স্বাভাবিক সুতরাং এ রসপর্যায়ের পদে চণ্ডীদাস সর্বশ্রেষ্ঠ। বংশীশিক্ষা জ্ঞানদাসের মৌলিক সৃষ্টি—এ পদে তিনি অদ্বিতীয়। এ ছাড়াও জ্ঞানদাসের বিরহের পদে চণ্ডীদাসের মত সুগভীর আত্মতন্ময় অভিব্যক্তি না থাকলেও এ পদে তিনি কৃতি-

শিল্পী। বিরহের পদে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠতম আর জ্ঞানদাস শ্রেষ্ঠতর। বয়ঃসন্ধি, ভাবসম্মিলন এবং প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতির দ্বিতীয় নেই—এ পদসমূহে তিনি এক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পূর্বরাগ, মান এবং বিশেষ রূপে বিরহের পদেও বিদ্যাপতির বাণী-বন্দনা কীর্তি-সমুজ্জ্বল। গৌরাঙ্গবিষয়কপদ, অভিসার, রূপানু-রাগের পদে গোবিন্দদাসের সাথে প্রতিযোগিতায় নামার দুঃসাহস কোন পদকর্তার নেই। এ রসপর্যায়ের পদ সমূহে গোবিন্দদাসের একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। অন্যান্য রসপর্যায়ের পদ রচনায় গোবিন্দদাস সর্বশ্রেষ্ঠ না হ'লেও তাঁর স্বভাবজ রূপ-মোহ ও চিত্রধর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে।

এবার সংক্ষিপ্তাকারে মহাজন চতুষ্টয়ের পদাবলীর এবং কবি-ধর্মের মূল সত্যকে লিপিবদ্ধ করা যেতে পা'রে। চণ্ডীদাস সুখ-দুখাতীত কবি, বিদ্যাপতি-গোবিন্দ-দাস সুখের কবি আর জ্ঞানদাস সুখ-দুখের কবি। চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস সাত্ত্বিক—এঁদের রচনা হৃদয়-ধর্মী, Subjective—আর বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস রাজসিক, এঁদের রচনা প্রতীক-ধর্মী Objective। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের মধ্যে চিত্র-ধর্মিতা প্রবল আর চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের মধ্যে রস-বন্যা। চণ্ডীদাস বিরহের কবি, বিদ্যাপতি সৌন্দর্যের কবি, গোবিন্দদাস রূপের কবি এবং জ্ঞানদাস মাধুর্যের কবি। গোবিন্দদাস সুরের কবি জ্ঞানদাস গীতিকবি। এত আলোচনার পরও হয়ত কবি-স্বরূপের সত্য-সার উদ্ঘাটিত হয়নি—বস্তুতঃ পক্ষে মহাজন চতুষ্টয় সম্পর্কে সব থেকে বড় কথা এঁরা প্রত্যেকই শ্রীরাধার এক একটি অঙ্গ, প্রত্যেকই শ্রীমতীর লীলা-সহচরী গোপী। শ্রীরাধার আনন্দে এঁরাও উল্লাস-ব্যাকুল, শ্রীমতীর বেদনায় এঁরাও বেদনা-বিহ্বল। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন শ্রীমতীর ছায়া সঙ্গিনী।

॥ মঙ্গল কাব্য ॥

॥ এক ॥

॥ সূচনা ও নামকরণ ॥

বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্যসমূহ এক পরমাশ্চর্য সংযোজনা। আদিম বাংলা কাব্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধুর গলি পথে মঙ্গল সাহিত্যের কাব্য-দ্যুতি প্রতিফলিত হ'য়ে গলির কালিমাকে বহুদূর পর্যন্ত ঝলকিত করে দিয়েছে। গলির গণ্ডীকে ভেঙে বাংলা কাব্যের অযুত সম্ভাবনাকে বিপুল বর্ণচ্ছটায় দিগন্ত বিথারী করে দিয়েছে, তার বুকেই শোনা গিয়েছে অবরুদ্ধ গর্জনোন্মুখ সমুদ্রের বিপুল জলকল্লোল।

মঙ্গলকাব্যের সাথে 'মঙ্গল' নামটি যুক্ত থাকায় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক এই নামকরণের পিছনে কোন প্রচ্ছন্ন ইংগিত আছে কিনা। মঙ্গল-কাব্যের ঐতিহাসিক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় রাগ-রাগিণীর দিক হ'তে আলোচনা করে মঙ্গলকাব্যের সাথে 'মঙ্গল' শব্দটির যে ঘনিষ্ট সংযোগ আছে তা' দেখিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য তাঁর ভাষাতেই বলি, "দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের রাগ-রাগিণীর মধ্যে 'মঙ্গল রাগ' অন্যতম।...... প্রাচীন ও মধ্যযুগের পদ্য-সাহিত্য মাত্রই গানের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, মঙ্গল সাহিত্যও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। এই জন্যই মনে হইতে পারে, আদ্যোপান্ত মঙ্গলরাগে কিংবা প্রধানতঃ মঙ্গলরাগে যাহা গীত হইত, তাহাই সাধারণভাবে মঙ্গলগান বলিয়া অভিহিত হইত।" একটু লক্ষ্য করলে আমরা দেখ্‌তে পাব মন্তব্যের মধ্যে নিশ্চিত রূপে, নিঃসংশয় হ'য়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় কিছু বলেন নি—'সম্ভাবতঃ'-এর রেশ রয়ে গেছে। স্থির-নিশ্চয় ভিত্তিভূমির উপর দণ্ডায়মান হ'য়ে এই মন্তব্য ঘোষণার পিছনে যে দুর্বলতা রয়েছে সে বিষয়ে শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় পূর্ণমাত্রায় অভিহিত ছিলেন। মঙ্গলকাব্য কেবল-মাত্র মঙ্গলসুরেই গীত হ'তো—এর মাঝে প্রচুর পরিমাণে পাঁচালীর সুরও মিশে থাক্‌তো। কিন্তু "ক্রমে পাঁচালীর উপর মঙ্গলরাগের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বশতঃই সম্ভবতঃ ইহা মঙ্গল নামে পরিচিত হইতে থাকে।"

'মঙ্গল' নামের উৎপত্তি সম্পর্কে মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আর একটি সুন্দর বিচারসহ মন্তব্য করেছেন—"কোনও অপ্রিয় বিষয় বা নামকে অনেক সময় সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই প্রবৃত্তিকে ইংরেজিতে euphemism বলে। মঙ্গলকাব্যের দেবতার চরিত্র মাত্রই অমঙ্গল-কারী (malignant)। অতএব ইহাদের অমঙ্গলকারিণী শক্তিকে প্রশমিত (pacify) করিবার কিংবা মনোমধ্যে ইহার বিষয় স্থান না দিবার প্রবৃত্তি হইতেও তাঁহাদিগকে মাহাত্ম্যসূচক গীতিতে মঙ্গলগান বলিয়া উল্লেখ করা হইতে পারে। বসন্ত রোগের নিদারুণ অন্তর্দাহের জ্বালার মধ্যেও মানসিক শান্তি লাভ করিবার জন্য এই রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এই কারণেই 'শীতলা' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কালক্রমে সকল শ্রেণীর দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তনই মঙ্গল নামে পরিচয় লাভ করে।"

মঙ্গলনামের উৎপত্তি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্যের বলিষ্ঠ মন্ত্যব্যের সাথে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতও বিশেষরূপে স্মরণ যোগ্য। 'চণ্ডী-মঙ্গল-বোধিনী' গ্রন্থে তিনি বলেছেন, 'যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়, যে গান মঙ্গল সুরে গাওয়া হয়, যে গান যাত্রা বা মেলায় গাওয়া হয় [হিন্দীতে মঙ্গল শব্দের অর্থ "মেলা, যাত্রা বা গমন"] তাকেই মঙ্গলকাব্য বলা হ'য়ে থাকে।' এই মন্তব্যের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক সমালোচক শ্রীযুক্ত ভূদেব চৌধুরী মহাশয় ঘোষণা করেছেন "মঙ্গল কাব্যসমূহের আভ্যন্তরিক প্রমাণ অনুসরণ করে বলা চলে, যে দেবতার আরাধনা, মাহাত্ম্য-কীর্তন এমন কি, শ্রবনেও মঙ্গল হয়, এবং বিপরীতটিতে অমঙ্গল হয়, যে কাব্য মঙ্গলাধার,—এমন কি, যে কাব্য ঘরে রাঁখলেও মঙ্গল হয়,—তাই মঙ্গল কাব্য।" অবশ্য এই অন্ধ বিশ্বাস প্রাচীন কালের ধর্মান্ধতার সুযোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যা' হোক এ পর্যন্ত যা' আলোচনা করা গেল তা'তে 'মঙ্গল' নামের উৎপত্তির উৎসভূমি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

॥ দুই ॥

॥ মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-যুগ ও উৎস-ভূমি ॥

কোন্ শুভলগ্নে মঙ্গল কাব্যের প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল তা' আজ নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়—তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে এই কাব্য একটি বিশেষ রূপ

পরিগ্রহ করে' গণমানসের হৃদয়ানন্দের উৎস-ভূমি হ'য়ে উঠেছিল সে বিষয়ে অনেকেই একমত। বহুপূর্ব হতে এই লৌকিক দেব-দেবীগণের মহিমা পাঁচালীর আকারে—অপূর্ণ কাব্যে এবং অপূর্ণ ভাষায়। লেখা হতো কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর 'যুগ-প্লাবী প্রয়োজন-প্রভাবে' এই অপূর্ণ পাঁচালী গাথাই সুসম্পূর্ণ মঙ্গল কাব্যের রূপ পরিগ্রহ ক'রে অনন্যসুন্দর দীপ্তিতে ভাস্বর হ'য়ে ওঠে। এই পাঁচালী হ'তে মঙ্গল কাব্যে রূপান্তরের পিছনে প্রধানত দু'টি কারণ তীব্র বেগ সঞ্চার করেছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ হ'লো রাজ-নৈতিক বিপর্যয়। দীর্ঘদিন ধরে অনায়াস-লভ্য সুখ-সম্ভোগে মত্ত থেকে আপামর বাঙালীর শক্তিমত্ততায় ঘুণ ধরেছিল, তারা হ'য়ে পড়েছিল পঙ্গু এবং ক্লীব। তা' ছাড়া অভিজাত এবং অনভিজাত বাঙালীর মধ্যে এক দুরতিক্রমী ধ্বংসোদ্দীপক ব্যবধান রচিত হওয়ায় বাঙালীর জমাট শক্তির ধ্বংস সাধনের পথ অধিকতর প্রসস্থ হ'য়েছিল। পলায়নী মনোবৃত্তিতে এবং নৈতিক ব্যাভিচারে ক্ষীয়মান বাঙালীর ধ্বংসমুখীনতার ওপর এল তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাত। দুর্বল বাঙালীর পক্ষে বীর্যবান তুর্কীদের এই সুতীব্র আক্রমণ রোধ করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং এই ধ্বংস-যজ্ঞকে নির্বীর্য বাঙালী মাথা পেতে গ্রহণ করলো। রাজনৈতিক জীবন হ'তে তার হ'লো নির্বাসন। আঘাতের পর আঘাতে বাঙালীর চলমান জীবন আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। আত্মরক্ষার সুস্পষ্ট প্রয়োজনবোধে পলায়নপর মনোবৃত্তিকে দূরে সরিয়ে শিথিল জাতীয়-চেতনাকে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করবার সচেতন প্রয়াস বাঙালীর মধ্যে এই প্রথম দেখা দিল। রাজনৈতিক জীবন হ'তে অপসারিত হ'য়ে ধর্মীয় জীবনের নব জাগৃতিতে সে তার সমুদয় চেষ্টাকে নিয়োজিত করলো। ফলে অপূর্ণ পাঁচালী গাথাগুলি সম্পূর্ণ কাব্যে রূপান্তরিত হ'লো। তা ছাড়া দুর্বলের সহায়ক হিসেবে একজন শক্তি-দেবতার প্রয়োজন এই সময় সুতীব্ররূপে অনুভূত হ'লো। বিভীষিকাগ্রস্ত হীনসর্বস্ব বাঙালীর চেতনা-দ্বারে মঙ্গল দেব-দেবীগণ তাঁদের সর্বপ্রকার প্রচণ্ড শক্তি-যজ্ঞের বিপুল আয়োজন নিয়ে দেখা দিল। ফলে এই লৌকিক দেবদেবীগণের কাহিনী যা পূর্বে পাঁচালী আকারে লিখিত হ'তো তাই পরম শ্রদ্ধায় বহুজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা মঙ্গল কাব্যের বিপুল সম্ভাবনায় আত্মপ্রকাশ করলো। দ্বিতীয় কারণ নিহিত রয়েছে তুর্কী আক্রমণের ধ্বংসস্তূপের ওপর উচ্চ-নীচ, অভিজাত অনভিজাতের মিলন-

সাধনের মধ্যে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিচালকগণ রাজশক্তির আনুকূল্যে অভিজাত-অনভিজাতের মধ্যে বিপুল ভেদরেখা বজায় রেখে এতদিন ব্রাহ্মণ্যধর্মকে পরিচালনা করতেন কিন্তু আক্রমণোত্তর যুগে রাজশক্তির আনুকূল্য হারিয়ে তাঁরা বিশেষভাবে অনুভব করলেন যে এবারে গণশক্তির সহযোগিতা না পেলে এই ধর্মকে বহাল তবিয়তে বাঁচিয়ে রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই তাঁরা গণ-জীবনের লৌকিক সংস্কার, তাদের ধর্মবিশ্বাস এমন কী তাদের দেবদেবীগণকেও আপন আভিজাত্যের অন্তর্ভূক্ত করতে সম্মত হ'লেন। এই যে ভেদরেখা এতদিন অভিজাত অনভিজাতের মধ্যে শত যোজন ব্যবধান রচনা করেছিল তা ভেঙে গেল। এই প্রথম আর্য-অনার্য উভয় সম্প্রদায় মিলন-ভূমির শ্রীক্ষেত্রে সম্মিলিত হ'লো। আর্যীকরণের মধ্যে যে সব লৌকিক দেবদেবীগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে মনসা, চণ্ডী এবং ধর্ম ঠাকুর প্রধান। এইবার হীনবীর্য দুর্বলগণ সম্মিলিত সম্প্রদায়গত ভাবে যে যার শক্তি দেবতার কাছে জানাল তাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা ঃ "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।" এরপর একএক দেবদেবীকে নিয়ে একএক সম্প্রদায় প্রচণ্ড-শক্তি উদ্দীপক কাহিনী রচনায় উন্মাদ হ'য়ে উঠ্‌লো—মঙ্গলকাব্য সমূহ দেখা দিল প্রদীপ্ত মহিমায়।

॥ তিন ॥

॥ মঙ্গল কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ॥

মঙ্গলকাব্যের কাহিনী-বিন্যাস পূর্ব সংস্কারাগত (conventional)। পূর্বে যে রূপায়ণ পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল পরবর্তী সকল কবিগণই সেই বাঁধাধরা পথে আপন কাহিনীকে বিন্যস্ত করেছে—কোন দ্বিতীয় পথে পদচারণা করেন নি। পূর্বসংস্কারগত এই রূপায়ণ-পদ্ধতি অনুযায়ী সকল মঙ্গল কাব্যকে প্রধান চারভাগে বিভক্ত করা চলে ঃ বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড এবং নরখণ্ড।

'বন্দনা' খণ্ডে কেবল বিশেষ কোন শক্তিদেবতারই বন্দনা-গান করা হয়নি উপরন্তু সকল দেবদেবীর মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলি যদিও সাম্প্রদায়িক উৎস হতে জন্মলাভ করেছে তথাপি এই বন্দনা অংশে এক অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাব বর্তমান।

'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' খণ্ডে সকল মঙ্গল কবিগণই বিশেষ দেবতা বা দেবীর স্বপ্নাদেশকেই বিশেষ মঙ্গল-গ্রন্থ রচনার হেতুনির্দেশ করেছেন। গ্রন্থরচনার

অন্তরালে দেবদেবীর স্বপ্নাদেশের অবতারণা দেব-নির্ভর ধর্মান্ধ গণমানসকে জয় করার এক বিশেষ সুবিধাজনক পন্থা। এই খণ্ডের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কবির আত্মপরিচয়। 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' নির্দেশ করতে গিয়ে সকল কবিই আপনার জন্ম-সন, আপন পরিচয় বাসস্থান, বংশ ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ বিবরণ প্রদান করেছেন। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকদের পক্ষে এই অংশটি বিশেষ উপকারে এসেছে।

গ্রন্থের তৃতীয়াংশ "দেবখণ্ড" নামে পরিচিত। এই খণ্ডে সাধারণতঃ যা বর্ণীত হয় তার মধ্যে প্রধান হ'লো : 'সৃষ্টি-রহস্য কথন, দক্ষপ্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ, সতীর-দেহত্যাগ, হিমালয়-গৃহে নবরূপে জন্মলাভ, মদন ভস্ম, উমার তপস্যা, গৌরীর বিবাহ, কৈলাসে হর-গৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষা যাত্রা ইত্যাদি। এই অংশের শিবের একচ্ছত্র প্রাধান্যটি বিশেষরূপে লক্ষণীয়। শিব আদি-অন্তহীন এক অদ্ভুত পরমাশ্চর্য দেবতা—যেন গ্রামের প্রান্ত-সীমায় এক সুবিশাল বটবৃক্ষ, 'কত কালের কেউ না তাহা জানে' কিন্তু যুগ যুগ ধরে বংশ পরাম্পরায় সকলেই তা'র ছায়াতলে সান্ত্বনা ও শান্তি লাভ করে আসছে। সৃষ্টির আদিম-তম যুগ হ'তে এই আপনভোলা মানুষটি আপনার অলক্ষ্যে সকলের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। স্বর্গের সকল দেবতার উপরে তাই শিবের স্থান। শিবের এই অভিনব প্রভাব মানুষের ওপরেও বর্তমান। মানুষ যখন আর্য-অনার্য বিভাগে সকল দেবদেবীগণকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে আর্য-অনার্য রূপ দান করেছে তখন শিবকে গুপ্ত গণ্ডীর মধ্যে সীমিত করবার দুঃসাহস তাদের হয়নি। শিব সকল সমাজের ওপর আপন প্রভাবটি বজায় রেখেছেন। তাই আর্যপুরাণে তাঁর যেমন প্রতিষ্ঠা বাংলার লোকজীবনেও তার অনুরূপ প্রভাব বর্তমান। শিব যেন উভয় সমাজের সর্বসাধারণের সমাজ-সম্পত্তি। মঙ্গল কাব্যের শিবের এই আত্যন্তিক প্রভাব উভয় সমাজের ঘনিষ্টতাকে অধিকতর নিবিড় করে দিয়েছে। অনার্য দেবতাদের আর্য-ঐতিহ্য প্রদানের জন্যে সকল মঙ্গল কাব্যের পৌরাণিক খণ্ডে শিবদেবতার অবতারণা। পৌরাণিক-সংস্কৃতির সাথে লোক-সংস্কৃতির মিলন-পটভূমি রচনায় মঙ্গল কাব্যে শিবের মহান প্রতিষ্ঠা।

সর্বশেষাংশের নাম 'নরখণ্ড'। এই খণ্ডই মঙ্গলকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। কোন স্বর্গলোকবাসী এবং বাসিনী কোন বিশেষ মঙ্গল-দেবতা কর্তৃক শাপ-গ্রস্ত হ'য়ে

মর্ত্তে অবতীর্ণ হন এবং উক্ত দেবতা বা দেবীর পূজা প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করে স-শরীরে স্বর্গারোহণ করেন। এই অংশেই তৎকালীন সমাজ জীবনের ছবি অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। 'বারমাস্যা'—নায়ক কিংবা নায়িকা কর্তৃক বার মাসের দুঃখ বর্ণনা—এবং চৌতিশা—বিপদ-গ্রস্ত নায়ক কিংবা নায়িকা কর্তৃক চৌত্রিশ অক্ষরে আলোচ্য দেবতার স্তবগান—এই অংশের এক অমূল্য সম্পদ। এ ছাড়াও নায়ক দর্শনে নারীগণের পতিনিন্দা, রন্ধন প্রণালী, কাঁচুলী বা কারুকলা-সমৃদ্ধ বক্ষাবরণ নির্মাণ এই অংশের অপরিহার্য অঙ্গ।

॥ চার ॥

॥ প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর মঙ্গল কাব্য ॥

বাঙালীর জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে বাংলার কোমল বুকে অমৃত-বাণী বাহক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। তিনি বহন করে এনে ছিলেন অসীম মানব-প্রেম আর দ্বেষ-বিনির্মুক্ত অভিনব জীবনায়ন। নির্বীর্য, শ্রীহীন, মরণোন্মুখ বাঙালীকে এই প্রেম-সুধা পান করিয়ে তিনি তাদের করে তুলে ছিলেন চিরঞ্জীবী। এক বিপুল প্রেমোন্মাদনায় এবং সর্বাত্মক মিলনাকাঙ্ক্ষায় বাঙালী-চিত্ত সেদিন প্রেমের অনির্বান দীপালোকে বহ্নিমান হ'য়ে উঠেছিল। বাঙালীর জাতীয়-জীবনের ধ্বংসস্তূপের ওপর তাই সেদিন সুরু হ'য়েছিল মহান সৃষ্টি-যজ্ঞের গঠন-পরিকল্পনা। জীবনের সর্বদিক দিয়ে এই গঠন-ক্রিয়া দুর্বার হ'য়ে উঠেছিল—সাহিত্য, ধর্ম, শিল্প, সমাজ সর্বত্রই ধ্বনিত হয়েছিল এই গঠমান সৃষ্টি-যজ্ঞের পদ-সঞ্চার। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে যে সমাজ-কাঠামো চূর্ণপ্রায় হ'য়ে উঠেছিল—তা' আবার নতুনতর বলিষ্ঠতায় সুদৃঢ় হলো, যে ধর্ম গোঁড়ামীর অতলান্ত অন্ধতায় অধর্ম হ'য়ে উঠেছিল তা' সর্ব কালিমা বিনির্মুক্ত হ'য়ে নবীনালোকে ভাস্বর হ'য়ে উঠ্‌লো, যে সাহিত্য ছিল অসম্পূর্ণ এবং অশ্লীল তা'তে এল মহত্তর সৃষ্টি-মহিমার অযুত সম্ভাবনা।

মহাপ্রভুর প্রভাবে মঙ্গল-কাব্যের সৃষ্টি-ধারায় এল অভূতপূর্ব পরিবর্তন। ভাবে, প্রকাশ ভংগীতে এমন কী দেব-দেবীর রূপ-কল্পনায় এই পরিবর্তন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো।

ক ॥ মঙ্গল-কাব্য সমূহের প্রাচীনতম উদ্ভব হ'য়েছিল পাঁচালী কাব্যের আকারে। বলাবাহুল্য এ কাব্য ছিল অসম্পূর্ণ। অবশ্য মহাপ্রভুর পূর্বে এ কাব্য

পূর্ণাঙ্গের পথে অগ্রসর হ'য়েছিল—কিন্তু এ কাব্যের যথার্থ সাহিত্যিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হ'লো চৈতন্যোত্তর যুগে মহাকবি মুকুন্দরামের হাতে। মঙ্গল কাব্যের প্রথম সার্থক শিল্পী মুকুন্দরাম। এই মুকুন্দরামের কবি-মানসের ওপর মহাপ্রভুর সুগভীর প্রভাব পড়েছিল এবং একখানি সার্থক শিল্পসমুন্নত মঙ্গল কাব্য লেখার পিছনে এই প্রভাবের মূল্য সুগভীর।

খ ॥ মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব যুগে (age of orision) এই শ্রেণীর কাব্যের কোন শৈল্পিক রসমণ্ডিত বিকাশ সম্ভব হয়নি। কেননা "রস-সৃষ্টি অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক দেবতার সর্বজনীন প্রতিষ্ঠা প্রতিপাদনই এখনো এই শ্রেণী কাব্য-প্রবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ;—আর এই উদ্দেশ্য-সাধনের সহায়ক-রূপে লোক-চিত্তে ভীতি-সৃষ্টি, তথা, রুষ্টদেবতার বিভীষণ রূপ-চিত্রনই প্রধান উপায় বলে পরিকল্পিত হ'য়েছিল। ফলে, দেবমূর্তি যেমন সর্বপ্রকার মহিমা-বর্জিত ভয়াবহ দানবীয়-রূপে প্রতিভাত হয়েছে, মানব-চরিত্রগুলিও, হয় মানবতা-বর্জিত দানবীয়-রূপে (চাঁদ সওদাগর) প্রকাশ লাভ করেছে—নয়ত বা চিত্রিত হ'য়েছে মেরুদণ্ডহীন যূপকাষ্ঠের সম্মুখীন পশুর আকারে।" চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গল কাব্য সমূহ এই পটভূমি ও ভাবধারা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে নবীন সজীবতায় অনবদ্য হ'য়ে উঠলো। প্রথমে সাম্প্রদায়িকতার কুটিল-জঞ্জাল মঙ্গলকাব্যের গতিপথ হ'তে মহাপ্রভুর দুকূলপ্লাবী প্রেম-বন্যায় দূরপথে ভেসে গেল। নবীন যুগ-চেতনার স্বর্ণ-দ্বারে সাম্প্রদায়িকতার আর বিশেষ কোন প্রবেশাধিকার রইলো না। ফলে তীব্র-সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-সঞ্চারী মঙ্গল-দেব-দেবীগণ আপনার সাম্প্রদায়িক গুরুত্ব হারিয়ে কাঙাল হ'য়ে পড়লো, তাদের গতিবিধি সীমিত হলো কাহিনীর অপ্রধান ভূমিকায়। এই সব দেবদেবীগণকে নেপথ্যলোকে রেখে নাট্য-মঞ্চের পাদ-প্রদীপের তীব্রোজ্জ্বল দৃশ্যাবলীতে অবতীর্ণ হলো রক্তমাংসের মানুষ—মানুষের বিজয়-গানে মুখর হলো মঙ্গলকাব্য। চৈতন্যোত্তর যুগের কাব্য সমূহ তাই শক্তিমান মানুষের বিজয়-অভিযানের চরম আলেখ্য।

॥ গ ॥ প্রধান ভূমিকায় মানবের পদ সঞ্চারে মঙ্গল কাব্যে এল মানব-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি, হ'ল সমাজ-জীবনের রূপায়ণ। এই যুগের মঙ্গল কাব্য-প্রবাহ একাধারে জীবন-রস-সমৃদ্ধ এবং আঙ্গিক সু-সম হ'য়ে উঠেছিল ; বস্তুতঃ এই যুগের প্রচেষ্টার মধ্যেই মঙ্গল কাব্য-সমূহের সাহিত্যিক সৌন্দর্য সর্বাপেক্ষা বিকশিত হ'য়েছিল। তাই মঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিক শ্রীআশুতোষ

ভট্টাচার্য এই যুগটিকে এই শ্রেণীর কাব্যের 'সৃজন যুগ' (age of creation) নামে অবিহিত করেছেন।

॥ ঘ ॥ চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গল কাব্যে মানুষের বিজয়-গাথা সূচিত হ'লেও মনুষ্য চরিত্রগুলি দেব-দেবী বিদ্বেষী নয়। যদিও তারা প্রধান ভূমিকায় আত্ম-প্রকাশ করেছে তথাপি দেব-দেবীর সাথে তাদের এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দেব-দেবীগণ তাদের রুদ্র-ভয়ঙ্কর মূর্তি ত্যাগ করে অনেকখানি মানব-নির্ভর এবং মানবান্বিত হ'য়েছে আর মানব-সমাজও তেমনি আত্ম-বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তি ভূমিতে দাঁড়িয়ে দোষ-গুণের সম্মিলনে দেবতান্বিত হ'য়ে উঠেছে। দেবতা-মানবে, মানব-দেবতায় একাকার হয়ে পরম-প্রীতির সম্পর্কে যেন মহাসম্মিলনে এক হ'য়ে মিশেছে। বস্তুতঃ চৈতন্যোত্তর মঙ্গল-কাব্য-সমূহ মহাপ্রভুর জীবন সাধনা 'দেববাদ-নির্ভর মানবতার'ই বাঙ্ময় প্রকাশ।

॥ ঙ ॥ বৈষ্ণব শাস্ত্রে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিবিধ মূর্তির উল্লেখ আছে—ঐশ্বর্য মণ্ডিত মূর্তি এবং মাধুর্য-সিক্ত প্রেমাধার। শ্রীচৈতন্য আজীবন ব্যাপী ঐশ্বর্য বিবর্জিত, মাধুর্যের আধার শ্রীকৃষ্ণকেই আরাধনা করবার উপদেশ দিয়েছেন। তাই দ্বিজমাধব, মুকুন্দরামের চণ্ডী রণাঙ্গিনী মূর্তি পরিত্যাগ করে অনেকখানি শান্ত এবং স্ব-স্থ হ'য়ে উঠেছেন।

॥ চ ॥ চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্য সমূহের ভাষা এবং ছন্দ আশ্চর্য রকম উন্নত। অশ্লীলতা-মুক্ত নমনীয় ভাষায় কাব্য-সমূহের অন্তর্নিহিত ভাবধারা অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে।

॥ ছ ॥ প্রাক্-চৈতন্য যুগের মঙ্গল কাব্যগুলি সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির তীব্রতার জন্যে Communal Poetry-র অন্তর্গত আর এই সাম্প্রদ্রায়িক ভেদ-বিভেদের তীরভূমি হ'তে সরে এসে চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্যগুলি উদার মানবিকতার পটভূমিতে হয়ে উঠেছে সার্থক জাতীয় কাব্য—National Poetry.

॥ পাঁচ ॥

॥ মঙ্গল কাব্যের যুগ-বিভাগ এবং পতনের কারণ ॥

মঙ্গল কাব্যের কাল-সীমা এবং পরিচয়-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন: "খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ একপ্রকার সাম্প্রদায়িক

(Sectarian) সাহিত্য প্রচলিত ছিল,—তাহাই বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গল কাব্য নামে পরিচিত।" অবশ্য এই কাল-পরিধির পূর্বে ও পরে যে মঙ্গল কাব্য রচিত হয়নি তা' নয়—তথাপি এই যুগটাই হ'ল প্রকৃত মঙ্গল কাব্যের যুগ। এই যুগের মধ্যেই মঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি, বিকাশ এবং পূর্ণ পরিণতি। মঙ্গল কাব্যের ক্রম বিকাশের ধারাটি গভীর ভাবে অনুধাবন করে শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এই যুগটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন :

১॥ উদ্ভব-যুগ—Age of Origin—কাল-সীমা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী।

২॥ সৃজন-যুগ—Age of Creation—কাল-সীমা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী,

৩॥ ঐশ্বর্য-যুগ—Age of glory—কাল-সীমা অষ্টাদশ শতাব্দী।

এখন প্রতিটি যুগ সম্পর্কে মোটামুটি একটা আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই উদ্ভব যুগের আলোচনা। এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্পষ্ট করে স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন—কয়েকটি বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এবং বিচ্ছিন্ন পদ ছাড়া এই যুগের সাহিত্য প্রচেষ্টার কোন সম্পূর্ণ গ্রন্থ-নিদর্শন পাওয়া যায় না। সুতরাং উদ্ভবেই যে পরিণতির সম্ভাবনা কতটা ছিল তা' নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। মঙ্গল কাব্যের যে তিনটি শাখা বিশেষ রূপে বলিষ্ঠ এবং প্রাণস্বরূপ সেই তিনটি শাখা-কাব্যেরই—অর্থাৎ মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল—বিপুল সম্ভাবনার বীজ এই যুগেই রোপিত হ'য়েছিল। মনসা-মঙ্গল কাব্যের সূচনা যে এই যুগেই হ'য়েছিল তার প্রমাণ পাই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে মনসা-মঙ্গলের বলিষ্ঠ কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যে। তিনি তাঁর কাব্যে মনসা-মঙ্গলের আদি কবি কানা হরি দত্ত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
> প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত॥
> হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
> যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥

এই রূঢ় মন্তব্যে বিজয়গুপ্তের আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেয়েছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় সম্পাদিত "বাইশা"-য় কানা হরি দত্তের যে পদ দুটি সংকলিত হ'য়েছে তা'তে কবির যে কাব্য-শক্তি এবং বিশেষরূপে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে তা' স্মরণ করে কবিকে কোনক্রমেই মূর্খ বলা চলে না। তা' ছাড়াও কবির কাব্য যে বিজয় গুপ্তের সময় লুপ্ত হয়নি তা' বেশ বোঝা যায়

কেননা স্বয়ং বিজয় গুপ্তই কানা হরি দত্তের বহুপদ আত্মসাৎ করেছেন। সে যাই হোক বিজয় গুপ্তের এই আত্ম-প্রচার-ধর্মী মন্তব্যে আমরা যতই ক্ষুব্ধ হইনা কেন লাভবান হ'য়েছি তার থেকে অনেক বেশী। এই পদ থেকেই আমরা জান্‌তে পেরেছি যে বিজয় গুপ্তের পূর্বেই হ'য়েছিল মনসা-মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব এবং তার রচয়িতা ছিলেন মূর্খ (?) কানা হরি দত্ত।

অনুরূপে আমরা চণ্ডী মঙ্গলের আদি কবি (?) মানিক দত্তের সন্ধান পাই মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে। ষোড়শ শতকের শেষ পাদে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনায় ব্যাপৃত হ'য়ে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কবি মানিক দত্তের প্রতি মুগ্ধ-মনের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন :

মানিক দত্তেরে বন্দোঁ করিয়া বিনয়।
যাহা হইতে হইল গীত-পথ-পবিচয়॥

কবি ঘনরাম চক্রবর্তীকেও ধন্যবাদ। তাঁর কৃতজ্ঞতা নিবেদনের মাঝেই আমরা জান্‌তে পেরেছি ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ুর ভট্টের নাম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় নিমগ্ন হ'য়ে তিনিও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর পূর্ববর্তী কবিকে :

ময়ুব ভট্টেরে বন্দি সঙ্গীত আদ্য কবি।

এখানে একটি বিষয় বিশেষ রূপে লক্ষণীয়। বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দরাম এবং ঘনরাম সকলেই তাঁদের পূর্ববর্তী কবিকে স্মরণ করেছেন কিন্তু এই স্মরণ করার মধ্যে সুরের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। বংশী দাসের স্মরণে প্রকাশ পেয়েছে আত্মম্ভরিতা, মুকুন্দরাম-ঘনরামের স্মরণে প্রকাশিত হ'য়েছে শ্রদ্ধা যেন আত্ম-নিবেদন। কবি-মনের এই পরিবর্তন সম্ভব হ'য়েছে মহাপ্রভুর কূলপ্লাবী প্রেম-ধর্ম প্রচারের প্রেম-বন্যায়। প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বিজয় গুপ্ত যেখানে রূঢ়, চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদ্বয় সেখানে বিনয়-নম্র।

আমরা পূর্বেই বলেছি উদ্ভব-যুগের কাব্যের কোন সুস্পষ্ট এবং সুসম্পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায় না। মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যের সূচনা এ যুগে হ'লেও এর সাহিত্য-মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

উদ্ভব যুগের পর সৃজন-যুগের আলোচনা। প্রকৃত পক্ষে এই যুগেই হ'য়েছে মঙ্গল কাব্য সমূহে বলিষ্ঠ যৌবন-সঞ্চার। মঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন আখ্যায়িকাগুলি এই যুগেই একটি নির্দিষ্ট গতিধারায় এবং স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্যে

বিকশিত। উদ্ভব-যুগের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং প্রচলিত আখ্যায়িকাগুলি এই যুগেই একটা নির্দিষ্ট কাহিনী ধারায় গ্রথিত হ'য়ে বলিষ্ঠ রূপ লাভ করেছে। শুধু কাহিনীর পূর্ণ স্বরূপ বিকাশের জন্য নয়, উপরন্তু মঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন শাখার সকল বলিষ্ঠ কবিগণই এই যুগে আবির্ভূত হ'য়ে মঙ্গল কাব্যের পরিণাম এবং প্রসারকে সুদূর বিস্তারিত করে দিয়েছেন। মনসা-মঙ্গলের কীর্তি-খ্যাত কবি বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব এবং দ্বিজ বংশীদাস এই যুগেই কাব্য-সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম ইত্যাদি চণ্ডীমঙ্গলের তথা মঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ এই যুগেই আবির্ভূত হন। মাণিক গাঙ্গুলী, খেলারাম ইত্যাদি কবি-শিল্পীগণ এই যুগেই বাণী-বন্দনায় মনোনিবেশ করে ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের বলিষ্ঠ বুনিয়াদ গঠন করেন। এমনি ভাবে প্রতিভা-দীপ্ত কবিকুলের পদসঞ্চারে মঙ্গল-কাব্যের সকল ধারাই বিকাশের উচ্চ-গ্রাম স্পর্শ করে। তা' ছাড়া এই যুগেই মঙ্গলকাব্য সমূহের মধ্য দিয়ে উচ্চতর সমাজের সাথে লৌকিক গণজীবনের মধ্যে সমন্বয়-সেতু গঠিত হয়। পূর্বে উচ্চতর সমাজের অধিবাসী লৌকিক দেব-দেবীর কীর্তি-আলেখ্য মঙ্গলকাব্য সমূহকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তে পারতেন না, পুরাণের দেব-দেবী, আখ্যায়িকা এবং কাহিনীতেই ছিল তাঁদের অবিচল নিষ্ঠা। তাই এই যুগের বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্যের কবিগণ আশ্চর্য্য-কৌশলে লৌকিক কাহিনীর অন্তরালে পৌরাণিক দেবদেবীর মহিমা প্রচার করে মঙ্গল-কাব্য সমূহকে আভিজাত্য দান করেন। পৌরাণিক আখ্যায়িকা-ধর্মী হ'য়ে মঙ্গলকাব্য তখন সর্বশ্রেণীর উপযুক্ত হ'য়ে ওঠে। সৃজন-যুগে মঙ্গলকাব্য সমূহের এই বলিষ্ঠ রূপায়ণের মধ্যেও ছিল দুর্বলতা। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে তখন প্রাণ ছিল ভংগী ছিল না, রস ছিল—রূপ ছিল না। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের ভাষায় "তখনও ইহারা ভাবায় এবং কল্পনায় সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা মুক্ত হইয়া সাহিত্যিক সমুন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।" এই সাহিত্যিক সমুন্নতি লাভের জন্য, ভংগী এবং রূপের জন্য মঙ্গলকাব্যকে আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হ'য়েছিল। অবশেষে মঙ্গলকাব্যের এই কাঠামোর ওপর বিপুল বর্ণালীর অপূর্ব দীপ্তি ঝলকিত হ'য়ে উঠেছিল ঐশ্বর্যমান কবি ভারতচন্দ্রের হাতে।

ঐশ্বর্যযুগের শক্তিমান কবি ঘনরাম চক্রবর্তী এবং ভারতচন্দ্র। এঁদের মধ্যে আবার বিন্যাস-ভংগীতে এবং অলংকার-নিপুণতায় ভারতচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ

সুচিক্কণ বাণী-বিন্যাসে এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষার যথাযথ প্রয়োগে ভারচন্দ্রের মত শিল্পী বিরল-দৃষ্ট। এজন্যেই বুঝি ভারতচন্দ্রের কাব্যকে 'রূপের তাজমহল' বলা হ'য়েছে। "এই যুগে সেই একই বিষয়-বস্তুর উপরই শব্দ-ঝংকার ও রচনা-পরিপাট্য মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এক কৃত্রিম বাহ্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিল।... এই যুগেই সর্বপ্রথম বঙ্গ-সাহিত্য:কি ভাষায়, কি ভাবে গ্রাম্যতা মুক্ত হইল। ঘনরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায় এইযুগের স্রষ্টা। বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া এই যুগে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার প্রয়াস হয় নাই, কিন্তু চরিত্রগুলিকে অভিনব রূপদান করিয়া কাব্যদেহের অংলকার সজ্জার যে নিপুণ ব্যবস্থা হইল, তাহা সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যের এক অতি মূল্যবান সম্পদ হইয়া রহিল।" ঐশ্বর্য যুগের এতসব ঐশ্বর্যের কথা স্বীকার করে নিয়েও এযুগ সম্পর্কে কিছু বলার আছে। প্রথম এবং সর্বপ্রথম কথা হ'ল এ যুগের কাব্য 'প্রাণ' হ'তে সরে এসেছিল। কেবল ভংগীর বিন্যাসেই আদর্শ কাব্য হয় না। আদর্শ কাব্য-সৃষ্টির জন্যে চাই প্রাণ এবং ভংগীর সুন্দর-সমন্বয়। কিন্তু এ যুগের কাব্য ভাব হ'তে সরে এসে কেবল বাক্-সর্বস্ব হ'য়ে উঠেছিল। রূপ আছে কিন্তু লাবণ্য নেই। নয়ন ধাঁধায় কিন্তু মন ভেজে না। শব্দাডম্বর এবং অলংকার-প্রবণতায় কেবল একটা নিরস রূঢ় কাঠিন্যই চোখে পড়ে। পূর্বেকার কবিদের আত্মবিভোরতা এযুগের কবিদের নেই। সেই সরল সহজ ভংগীর রেখা-বিন্যাসে যে কাব্য আমাদের হৃদয় স্পর্শ করতো এ যুগের কাব্যে তার অভাব একান্ত ভাবে পরিলক্ষিত হয়। রাজকীয় পরিবেশে ঝাড় লণ্ঠনের সুতীব্র আলোকচ্ছটায় নিভৃত পল্লীর দেউলের নির্মল দীপালোকের সম্ভ্রম বিনষ্ট হয়েছে। তা' ছাড়া এযুগের বড় দোষ অশ্লীলতা। ভারতচন্দ্র তাঁর বিদ্যাসুন্দরে (কিছুটা অন্নদামঙ্গলেও) যে উন্মুক্ত কেলি-বিলাস-চিত্র অঙ্কন করেছেন তার সমকক্ষ অশ্লীলতা কেবল মধ্যযুগে কেন সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ছাড়া আর কোথাও নেই। তথাপি এ যুগের কাব্য অলংকার-সর্বস্ব হ'য়ে যে বাংলা সাহিত্যের বড় একটা অভাব পূরণ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ আরোপ করা যায় না।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মঙ্গলকাব্যের যে তিনটি বিভাগ করেছেন তার সাথে আমরা আর একটি যুগ জুড়ে দিতে চাই—পতন যুগ বা age of downfall. বস্তুতঃ ঐশ্বর্য যুগটিকেই পতন যুগ বলা চলে। ঐশ্বর্য যুগের মধ্যেই পতনের সকল কিছু চিহ্নিত হ'য়ে আছে। সংক্ষিপ্তাকারে এখন আমরা মঙ্গল

কাব্যের বিলুপ্তির কারণগুলি আলোচনা করব। পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি ঐশ্বর্য-যুগের কবিদের হাতে মঙ্গল কাব্যের প্রাণ শুকিয়ে গেছে। প্রাণের বদলে এসেছে তার বহিরাবরণে অলংকার-সুষম দীপ্তি। প্রাণ হ'তে সরে এসে কোন কাব্য কেবল চাকচিক্য নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। তাই দেখি এই যুগে দুর্গামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শিবমঙ্গল ইত্যাদি নামে যে সকল মঙ্গলকাব্য রচিত হ'য়েছে তাদের একটিকেও সঠিক মঙ্গলকাব্যের এলাকা-ভুক্ত করা যায় না—না রচনা-রীতির দিক দিয়ে, না কাহিনী-বিন্যাসের দিক দিয়ে। অধিকাংশই পুরাণের ভাষানুবাদ মাত্র। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঐশ্বর্য-যুগের কবিদের হাতে মঙ্গল কাব্যের উৎসমূল এবং প্রাণাবেগ শুকিয়ে এসেছিল। এ ছাড়াও আছে রাজনৈতিক অভিসম্পাত। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে এদেশে নিজেদের অধিকার পাকা করে নিয়েছে। তাদের প্রতিষ্ঠায় বাঙালীর জাতীয় জীবনে এসেছে নবজাগরণ। পাশ্চাত্য নাগর-সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক এদেশের সামাজিক কাঠামোয় ভাঙন ধরিয়েছে। গোষ্ঠী-চেতনার বদলে এসেছে ব্যষ্টি-চেতনা। মঙ্গলকাব্য একান্তভাবে গোষ্ঠী-চেতনা-সম্ভূত কাব্য—ব্যষ্টি-সর্বস্ব মন নিয়ে তার সৃষ্টি অসম্ভব। সুতরাং সামাজিক এই পরিবর্তন মঙ্গলকাব্যের পতনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। তা'ছাড়া পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে আমাদের মন আবেগ-বহুল অন্ধ ভক্তি-বিশ্বাসের পথ পরিত্যাগ করে বুদ্ধি-বিবেচনার পথে অগ্রসর হ'য়েছিল। এবং বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌লে বিবিধ মঙ্গলকাব্যের কাল্পনিক দেবদেবীগণের মূর্তির ভিত্তিমূল অনেকখানি শিথিল হ'য়ে পড়ে, কেবল শিথিল নয় বুদ্ধির পথ অগ্রসর হ'য়ে কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে মঙ্গল দেব-দেবীগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে এইভাবে আমাদের মত-বিশ্বাস আমূল পরিবর্তিত হওয়ায় অন্ধ আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত মঙ্গল কাব্য সমূহের ধ্বংস অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। এ ছাড়াও এই সংকট-মুহূর্তে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর কোন উল্লেখযোগ্য কবি-প্রতিভারও আবির্ভাব ঘটেনি। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "সে যুগে মঙ্গলকাব্য-রচনার শিল্পগুণ বৃদ্ধি পাইলেও অন্তরের দিক দিয়া ইহার দৈন্য দেখা দিয়াছিল—ইহার বহিরঙ্গের রসপুষ্টি ইহার অন্তরগত ভাব-দৈন্য কিছুতেই ঘুচাইতে পারে নাই।

অতএব, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত না হইলেও মঙ্গলকাব্য অধিক অগ্রসর হইবার প্রাণশক্তি ইতিমধ্যেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং ইহার বিনাশ সকল দিক হইতেই অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল।"

॥ ছয় ॥

॥ নারায়ণ দেবের চাঁদ-চরিত্র ॥

বাংলা সাহিত্যে কোন বিরাটাকায় পৌরুষোজ্জ্বল ধীরোদ্ধত চরিত্র নেই বলে একটা আক্ষেপ চিরদিন সমালোচক-কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়েছে। প্রথম দিকে সমালোচকগণের কণ্ঠের সাথে আমরাও কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছিলাম—কেননা বাংলা সাহিত্যে যে ক'টি বীর চরিত্রের সাথে তখন পরিচিত ছিলাম তাঁদের একটিও সার্থক নয়। মেঘনাদে বীরত্ব-সৃষ্টির যথেষ্ট আয়োজন আছে কিন্তু তা' অনেকাংশে ব্যর্থ, শৌর্য-দীপ্ত রাবণও শেষ পর্যন্ত অক্ষমতার গ্লানিতে ম্লান, গোরা আদর্শবাদী—ফলে পঙ্গু—এরপর নিখিল বাংলা সাহিত্যের আর কোথাও বীর্য-দীপ্ত পৌরুষের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ মেলে না। কিন্তু যেদিন সর্বপ্রথম 'প্রাগৈতিহাসিকে'র ভিখুর সাথে পরিচিত হলাম সেদিন এই বিশ্বাসের ভিত্তিমূল অনেকখানি শিথিল হয়ে গেল। ভিখুর মধ্যে যে আদিম শক্তির বহ্নিস্ফুরণ ঘটেছে তা' কেবল অনবদ্য নয়—অভিনব। চাঁদ সওদাগরে এই অভিনবত্বের চরম প্রকাশ। বাংলার বিদ্রোহী দুলাল "শির নেহারি আমারি নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রীর" ব'লে পৌরুষ চরিত্রের যে দীপ্ত ঘোষণা করেছেন চাঁদ সওদাগরের অটল চরিত্র সেই নির্ভিকতারই পরিচয়-বাহী। চাঁদ সওদাগরের মত শৌর্য-মণ্ডিত অনবদ্য চরিত্র বাংলা কাব্যে নেই—মার্লোর টেম্বারলন এবং গ্যেটের ফাউষ্ট চাঁদের একমাত্র তুল্য প্রতিযোগী।

সেই আদিম যুগে যখন দেবদেবীর চরণ-প্রান্তে যূপকাষ্ঠের সম্মুখে মেরুদণ্ডহীন পশুর মত মানবের দিতে হ'তো আত্মাহুতি সেই যুগে চাঁদের মত একজন grand fellow—সাবাস পুরুষের কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। চাঁদ কোন দিন কোন ঘটনাতেও পরাজয় স্বীকার করে নি। দেবী মনসার সকল চক্রান্ত, সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে, সকল বিপদ-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে চাঁদ আপনার মস্তক উর্দ্ধোত্থিত করেছেন। এখানে চাঁদ নির্বিচার এবং যথেচ্ছ দৈবী-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানবী-শক্তির গৌরবোজ্জ্বল প্রতীক।

চাঁদ সওদাগর শিবের পরম ভক্ত। মনসা স্বীয় পূজা প্রচারের জন্যে যখন বার বার চাঁদের নিকট হ'তে প্রত্যাখ্যাত হ'লেন তখন তীব্র প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি হ'লেন বদ্ধ পরিকর। নীচ প্রতিহিংসার বশবর্তী হ'য়ে দেবী মনসা ঘৃণ্য আচরণে নন্দন-কানন-তুল্য চাঁদের গুয়াবাড়ী ধ্বংস করলেন। এরপর সামান্য মানুষকে বশীভূত করতে গিয়ে দেবী মনসা বুঝি নীচতা ও হীনতার শেষ স্তর অতিক্রম করে গেলেন। সর্পাঘাতে রাজ্যের নরনারী প্রাণ হারাতে লাগ্‌লো। কিন্তু চাঁদের বন্ধু শঙ্কর গারড়ী সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিদিগকে পুনরায় জীবন দান করলেন। ফলে মনসার সকল নীচ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'লো।

এরপর মনসা প্রতিহিংসায় জান্তব-রূপ ধারণ করলেন। কৌশলে শঙ্কর গারড়ীর স্ত্রীর নিকট হ'তে গারড়ীর মৃত্যুর উপায় জেনে নিয়ে তিনি তাকে হত্যা করলেন। চাঁদের দক্ষিণ হস্ত কাটা গেল। প্রতিহিংসা পরায়ণা দেবী এখানেও থাম্‌লেন না। চাঁদকে ছলনা করে তিনি তাঁর মহাজ্ঞান হরণ করলেন। এরপর চাঁদের ওপর এল প্রচণ্ডতম আঘাত। খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করতেও নির্লজ দেবীর নীচতায় বাধল না। কিন্তু তবুও চাঁদ আপন পৌরুষের, আপন আত্মবিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তি-ভূমি হ'তে বিচ্যুত হলেন না। স্বপ্নে মনসা চাঁদকে তাঁর পূজা করতে আহ্বান করলেন, স্ত্রী সনকা অশ্রুসজল চোখে স্বামীকে দেবীর পূজা করতে অনুরোধ জানালেন—কিন্তু পূজা তো দূরের কথা, লাঠির আঘাতে চাঁদ দেবীর কাঁকলী ভেঙে দিলেন। অত্যাচারীর পদপ্রান্তে মস্তক অবনত করা চাঁদ-স্বভাবের বিরুদ্ধ এখানেই সে বিক্ষুব্ধ, লাঞ্ছিত, জাতীয় মনুষ্যত্বের প্রথম উদ্বোধক।

এরপর নতুন করে পট উন্মোচিত হয়—দেবীর নীচ মনোবৃত্তির মাঝে চাঁদের হিমাদ্রী-বিশাল রূপ অধিকতর ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হ'য়ে ওঠে। তাঁর চৌদ্দ ডিঙা সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেছে, লখীন্দর মারা গেছে, মৃত পতীকে নিয়ে পুত্রবধূ বেহুলা চলে গেছে কোন অজানা দেশে। চাঁদের অন্তর্লোক ঘিরে দুঃখ-শোক, ব্যথা-বেদনার প্রচণ্ড ঘূর্ণিবার্তা বয়ে চলেছে অবিরাম। এক দিকে পুত্র-শোকের প্রচণ্ড আঘাত অপর দিকে ধৈর্যের চরম পরীক্ষা। লখীন্দরকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে চাঁদের মনোরাজ্যে যে একটা প্রচণ্ড সংগ্রাম চলেছে তা নারায়ণ দেব নিপুণ তুলিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

অসংখ্য ঘটনা প্রবাহের পর চাঁদ কর্তৃক মনসা-পূজা সুসম্পন্ন করাবার অঙ্গীকারে

বেহুলা একক মানবী শক্তি দ্বারা জয় করে ফিরিয়ে এনেছে মৃত স্বামী লখীন্দর, ছয় ভাসুর চৌদ্দ ডিঙা। চাঁদ যদি একটি বারের জন্যে মনসার পূজা করেন তা' হ'লে সব কিছুই ফিরে পান। কিন্তু তবুও প্রজাবর্গ, জ্ঞাতি, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পুত্রবধূ সকলের মিলিত অনুরোধ, সকলের অশ্রু সজল প্রার্থনা তিনি উপেক্ষা করেন। তাঁর উচ্চশির কখনো মনসার পদতলে লুণ্ঠিত হ'বে না। তিনি দীপ্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করেন :

শিবলিঙ্গ আমি পূজি যেই হাতে।
সেই হাতে তোমাবে পূজিতে না লয় চিতে॥

এখানে চাঁদ যেন সমসাময়িক নিপীড়িত যুগ-চেতনার বহিঃপ্রকাশ। কোন কিছুই তাঁকে অটল সংকল্প হ'তে বিচ্যুত করতে পারে না। নব-জীবন-বোধের 'তোরণ দ্বারে তিনি যেন বন্ধনমুক্ত প্রমিথিউস : যে অগ্নি-শিখার আলোকে প্রোজ্জ্বল হ'বে নব জীবনের তিমিরাভিসার তিনি যেন তার প্রথম অগ্নি হোত্রী।' তাঁর পদতলে দেবীর সকল নীচ প্রতিহিংসা-প্রবণতা, সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। দেবী এখানে মানুষের কাছে পরাজিতা—কাঙাল। চাঁদের মানবিক-বোধ তাঁর মহান নিষ্ঠা দেবীর অভিমান ও প্রতীজ্ঞার মর্মমূলে আঘাত হেনেছে। মানবিকতার বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে চাঁদ তার আপন সংকল্পে নিশ্চল। নতুন করে আবার সকলে চাঁদকে বোঝান। কেবল একটি বার মাত্র পূজা করলেই তিনি সব কিছুই ফিরে পাবেন। নতুন করে চিন্তা করেন চাঁদ—"সহসা তাঁহার চোখের সম্মুখে অসহায়া বেহুলার সেই দিনকার মুখখানি জাগিয়া ওঠে—তাঁহার নিকট বেহুলা তখন আর তাঁহার পুত্রবধূ নহেন, ব্যথিত মানবাত্মার প্রতীক মাত্র।" মানব-শক্তি-পূজারী মানবাত্মার এই করুণ ক্রন্দনকে উপেক্ষা ক'রতে পারলেন না। বন্ধু-বান্ধবের অশ্রুসজল সরব আহ্বানে যা হয়নি—ব্যথিত মানবাত্মার নীরব ক্রন্দনে তাই হ'লো। অবশেষে চাঁদ সহজাত শক্তির উদ্দাম প্রবাহে শির উঁচু রেখে বাম হস্তে মনসার পূজার জন্য একটি ফুল দিতে স্বীকৃত হ'লেন : 'পিছ দিআ বাম হাতে তোমারে পূজিম।'
একটি ফুলের পূজায় যদি একটি অসহায়া বালিকার অন্তর ব্যাপী বেদনার লাঘব হয়—সে পূজা কখনো চাঁদের কাছে উপেক্ষণীয় নয়। কেননা এ তো দেবীর পূজা নয়—এ যে মুক্তিকামী মানবাত্মার পূজা। পিছন ফেরা বাম হস্তের এই অবহেলা ও ঘৃণার পূজাতেই কাঙাল দেবী কৃতার্থ। এ যেন দেবী কর্তৃক চাঁদের

অটল পৌরুষের মশাল উত্তোলন। কেবল বাম হস্তের পূজা নয়—চাঁদ দেবীর প্রতি নির্দেশ-প্রদান স্বরে ঘোষণা করেন: 'আমার নাম চাঁদোয়ায় তোমার মাথার উপরে টাঙিয়ে রাখ্‌লে তবে পূজো পাবে।' ভিক্ষারিণী দেবীর কাছে এই তো সহস্র-কোটী মুক্তা। অতএব সানন্দে স্বীকৃতি দান করলেন। চাঁদের পৌরুষ-দীপ্ত সুমহান মানবিক বোধের কাছে দেবীর দেবীত্ব খণ্ডিত ও ম্লান। দেবীর শত আঘাতেও চাঁদের বল-দীপ্ত আদিম পৌরুষের কণামাত্র ছিন্ন হয়নি।

মৃত-পতিসহ দেবপুর গমনার্থিনী বেহুলার জন্যে কলার ভেলা রচনার প্রস্তাব মাত্রই চাঁদ ক্রোধান্ধ হন। কিসের জন্যে এই ভেলা রচনা, পুত্র গিয়েছে যাক, তা'হলে কলার ভেলায় করে গিয়ে দেবীর পায়ে ধরে পুত্রের জীবন ভিক্ষাতে তাঁর মানসিক অতৃপ্তি বেড়েই যাবে। তিনি পরাজিত হ'তে পারেন না, উর্দ্ধোত্থিত মস্তক অবনমিত করা তাঁর স্বভাব নয়। ভেলা তৈরীর জন্যে কলাগাছ কাটলে যে আর্থিক ক্ষতি হ'বে তার জন্যে তিনি বলেন:

> …এক দুঃখ মৈল সাত বেটা।
> তাহা হইতে অধিক দুঃখ কলা জাইব কাটা॥

এই তো আদিম মানুষের চরিত্র! অবশ্য আধুনিক কালে শোকার্ত-পিতৃত্বের এই প্রকাশ অমানুষিক এমন কী বর্বর বলেও প্রতিভাত হতে পারে "তবুও স্মরণরাখা উচিত, ব্যক্তি চরিত্রের নিরাবরণ, নিরাভরণ প্রকাশজাত এই বর্বরতা আদিম মনুষ্যত্বের সাধারণ লক্ষণ,—আর এই সাধারণ পরিচয়কেই কবি নারায়ণ দেব অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্ধার করেছেন।" তাই চাঁদ চরিত্রের এই বজ্রকঠোর ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধাচিত্তেই প্রণতি জানাতে হয়। "শোকে উন্মাদ, প্রতিহিংসায় অসুর-বলধারী, স্বার্থে সংকীর্ণ-চিত্ত—কিন্তু সর্বত্রই স্ব-প্রকাশ-মানতার মহিমায় ভাস্বর;—সার্থক মহাকাব্যিক নায়ক [Epic Hero]।"

নারায়ণ দেবের পরিকল্পনায় যে চাঁদকে আমরা পেলাম—বাস্তবিক কেবল প্রাচীন কেন আধুনিক যুগেও অমন ধীরোদাত্ত মনুষ্যত্বের মহিমায় সমুদ্ভাসিত, পরম-পৌরুষ-প্রদীপ্ত চরিত্রের সাথে আমাদের বড় একটা সাক্ষাৎ হয় না। চাঁদ সওদাগর যেন দেববাদ বিনির্মুক্ত মানবতা জাগরণ-যজ্ঞশালার বিদ্রোহী বিশ্বামিত্র—দেবীর সকল চক্রান্তকে ভেদ করে তিনি করেছেন মানবী শক্তির চিরন্তন প্রতিষ্ঠা।

॥ সাত ॥

॥ চণ্ডীমঙ্গলের সামাজিক চিত্র ॥

সাহিত্য মানব-জীবনের রূপালেখ্য। সমাজকে ঘিরেই মানব-জীবনের হয় ক্রমবিকাশ তাই মানব-জীবনের বর্ণনায় অনিবার্য কারণে সামাজিক-জীবন-প্রতিচ্ছবির ছায়াপাত ঘটে। তা' ছাড়া যিনি সাহিত্য রচনা করেন তিনিও একজন সামাজিক ব্যক্তি তাই সাহিত্যের মধ্যে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে নানা ভাবে সমাজের কথা অনুপ্রবিষ্ট হয়। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ দ্বিজমাধবের "মঙ্গলচণ্ডীর গীতে"ও পাই সমাজ-চিত্রের এক অত্যুজ্জ্বল রূপায়ণ। অতীত-যুগের বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের এক বিরাট অধ্যায় আপন মহিমায় আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

"মঙ্গলচণ্ডীর গীত"-এ দুটি পৃথক কাহিনী স্থান পেয়েছে—একটি ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী অপরটি সওদাগর ধনপতির কথা। প্রথম কাহিনীতে ব্যাধ-জীবনের যে চিত্র পাই তা' তৎকালীন সমাজের নিম্নস্তরের অনার্য লোক-জীবনের একাংশের একটি অখণ্ড রূপ—বলাবাহুল্য এ রূপ সমাজের একাংশের কিন্তু সমাজের পূর্ণতর রূপ পাই ধনপতির গল্পাংশে। এখানে উচ্চ স্তরের তথা অভিজাত শ্রেণীর জীবন-যাত্রার কথা সুন্দররূপে তুলে ধরা হ'য়েছে।

ব্যাধজীবনের যে রূপ পাই তা' নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। ব্যাধগণ পিতাপুত্রে একসাথে শীকারে যেত এবং যে পশুপাখী শীকার করতো তার মাংস হাটে-বাজারে বিক্রি করে তবে উদরান্নের ব্যবস্থা হ'তো। অধিকাংশ সময়ে ব্যাধ-রমণীরা এই মাংস হাটে বিক্রয় করতো—ফুলরা তার প্রমান।[৯] শীকার না পেলে অনাহারে থাকতে হ'তো শীকারীদের। ব্যাধরাও যে বহু বিবাহ করতো এবং স্ত্রীদের মনে যে এ সন্দেহ সর্বদা জাগরূক থাকতো পূর্ণযৌবনা দেবীর প্রতি ফুলরার উক্তিতে তার পরিচয় নিহিত রয়েছে। ফুলরার বারমাসী দুঃখ বর্ণনায় যে অপরিসীম অভাব-অনটন এবং বেদন-দাহন নিহিত রয়েছে তা' তৎকালীন সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক দুর্দশার চরম আলেখ্য।

সহরাঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অসংখ্য নরনারী একসঙ্গে বসবাস করতো। তাদের ভিতর মিলন ছিল আন্তরিক। একে অপরের সাহায্যের জন্য আসতো এগিয়ে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বিভেদ-বিরোধ-বিহীন যে জাতীয়-মুক্তির

পথ-প্রদর্শন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মধ্যযুগের সামাজিক জীবনে তার প্রভাব দুর্নিবার হ'য়ে উঠেছিল এবং এই সর্বাত্মক মিলন-চিত্র মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে অনবদ্য হ'য়ে ফুটেছে। পূর্বে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুস্‌লিমের মধ্যে যে বিরোধ দুরতিক্রমী হ'য়ে উঠে'ছিল—মহাপ্রভুর আগমনে তা হ'য়েছিল তিরোহিত—তাই বিভিন্ন বৃত্তি নিয়ে একস্থানে বসবাস করতে তাদের কোন আপত্তি ছিল না। কালকেতু গুজরাটে যে নগর তৈরী করেছিল সেই নগরে তাই নিজ নিজ বৃত্তি নিয়ে একীভূত হতে পেরেছিল ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, বণিক, মালী. কুমার, ব্যাধ, চণ্ডাল, তামলী, ধীবর, ডোম, মুসলমান ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়। তাম্বুলী বিক্রি করে গুয়া-পান, মালী রচনা করে পুষ্পমালার পসার, 'মহেরা' সজ্জিত করে মিষ্টান্নের ভাণ্ডার, তাঁতি-নাপিত আপন আপন কাজে ব্যস্ত এমন কি ঘাটে খেয়া দেওয়ার জন্যে পাটনীও প্রস্তুত। মলঙ্গী-মুচীও নগরের বিভিন্ন স্থানে উপবেশন ক'রে আপন আপন বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করে। আর মুসলমান :

বৈসয়ে মুসলমান   প্রঢ়ে কিতাপ কোরান
নমায়াজ পঢ়ে পাঁচবার
সোলেমানী মালা করে খোদার নামে জিগির কাঢ়ে
সৈদ কাজী বোসিল অপার ॥

এখানে সার্বিক মিলনাকাঙ্খার পটভূমিতে "স্মার্ত-পৌরাণিক জাতিভেদ-প্রথার মধ্যেও গুণ-কর্মানুযায়ী বিভক্ত সামগ্রিক গোষ্ঠী-চেতনার" যে অসম্প্রদায়িক রূপ বিমূর্ত হ'য়েছে তা' বাংলার মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তৎকালীন নিখিল বাংলা ব্যাপী স্বয়ং সম্পূর্ণ যে যৌথ সমাজ-ব্যবস্থা ছিল, ব্যক্তি হিসেবে উচ্চ-নীচ সকলেই সেই যৌথ-সমাজের শক্তি-সংগঠনে এক একটি সক্রিয় অনু (Active Unit). কেউ উপেক্ষিত নয়, কেউ অবহেলিত নয়—সকলের সম্মিলিত শক্তি-যজ্ঞে সমাজ-সমুদ্র কল্লোল-গানে মুখর হ'য়ে উঠেছিল। এই উদার সমাজ-ব্যবস্থার পিছনে যে চৈতন্য ঐতিহ্য নিরন্তর বেগ সঞ্চার করেছে সে সম্পর্কে আচার্য যদুনাথের সার্থকতম মন্তব্য স্মরণ যোগ্য : The new creed (Bangal Vaisnavism propunded by Chaitanya), ...has opened a new life of knowledge and spirituality to the lower castes, and under its life-giving touch they have

produced many Vaishnav saints and poets, scholars and leaders of thought. This was not possible in the old days of orthodox Brahmanic domination over society. Thus Vaishnavism has proved the saviour of the poor ; it has proclaimed the dignity of every man as possessing within himself a particle of divine soul (Jivatma),

উদার সামাজিক পটভূমিকায় সব মানুষই যে মনের দিক থেকে উদার হয়ে উঠেছিল সে কথা চলে না। দুষ্ট এবং খল স্বভাব লোকেরও অভাব ছিল না। ভাঁড়ু দত্ত এই শঠতা এবং ধূর্ততার প্রতীক। ভাঁড়ু দত্তের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের শঠতাপ্রবণ চরিত্রহীন মানুষের এক বিরাট কলঙ্কময় দিক উন্মুক্ত হয়েছে। ভাঁড়ু দত্তকে নিয়ে আমরা পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছি বলে এখানে এ সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ধনপতি সওদাগরের কাহিনীতে আমরা পাই বৃহত্তর সমাজ-জীবনের আর একরূপ। ঘর মুখো বাঙালী যে কেবল ঘরের মধ্যেই পড়ে থাক্‌তো তা নয়—বাইরের বিপুল সওদাগরী-জীবন যে তাদের আকর্ষণ করতো তার পরিচয় পাই ধনপতি এবং শ্রীমন্তের চরিত্রে। দূর দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলার সাথে অন্যান্য দেশের যে একটি নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এই গ্রন্থের বহু পৃষ্ঠা ব্যাপী তার পরিচয় রয়েছে। এই সময় বাণিজ্য চল্‌তো তা' বিনিময় (Barter) প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—এবং এ বাণিজ্য ছিল উপকূল বাণিজ্য costal trade। সে সময় বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের জন্যে যে পাশা খেলার প্রচলন ছিল তাও আমরা ধনপতির কাহিনী হতে অবগত হই। উচ্চ শ্রেণীর ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারাবত উড়ানোএ ছিল আমোদ-প্রমোদের আর একটি প্রধান অংগ। এই সমস্ত ঘটনা সমগ্রভাবে উচ্চশ্রেণীর বিলাসিতার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত এই গ্রন্থে সামাজিক চিত্রের আর একটি বিশেষ দিক বহু বিবাহ-সঞ্জাত কুফলের নারী হৃদয়ের নিদারুণ হাহাকার। খুলনার সমগ্র জীবন যেন ট্রাজেডির এক অখণ্ড প্রবাহ। এক দিকে আছে সতীন লহনার দুঃসহ যন্ত্রণা—অন্যদিকে স্বামীর বিরহ—এই উভয় সংঘাতে খুলনার সমগ্র জীবন যেন অকাল বৈধব্যের তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় পাণ্ডুর হয়ে গেছে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে সতীন সতীনের ওপর যে কি ভীষণ বজ্র-শেল

নিক্ষেপ করতে পারে—লহনা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। খুলনাকে কেবল ঢেকি-শালে শয়নের ব্যবস্থাতেই লহনা তৃপ্ত নয়, তাকে মাঠে মাঠে ছাগল চরাবার নির্দেশ দেয়। খুলনাকে সেই নির্দেশ নিরুপায় হয়ে মাথা পেতে নিতে হয়। দুঃসহ পরিশ্রমের পর সে খেতে পায় পোড়া ছাইমাখা দুর্গন্ধযুক্ত তণ্ডুল—জল পায় ভাঙা নারিকেলের মালায়। এবং এই অন্ন-ব্যঞ্জন তাকে খেতে হয় ঢেকিশালে বসে 'মানের পাতায়'। কোন দিন জ্বরে উত্থান-শক্তি রহিত হলেও ছাগল চরানোর হাত হতে খুলনার নিস্তার নেই। করুণ মিনতিতে অক্ষমতার অজুহাত জানায় খুলনা :

খুলনা বোলে দিদি গায়ে মোর জ্বর।
হস্ত দিয়া চাহ দিদি ললাট উপর॥

এই করুণ প্রার্থনায় প্রতিহিংসা-পরায়ণা নারীর উল্লাস বেড়ে ওঠে। সজল প্রার্থনার সব কিছু অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে লহনা ঘোষণা করে তার অলঙ্ঘনীয় তীব্র-তীক্ষ্ণ নির্দেশ বাণী :

লহনারে বোলে বেটী লজ্জা নাহি গা।
আপনা গৌরব রাখি ছেলি লইয়া যা॥

এ যেন প্রতিহিংসা পরায়ণা আদিম রিপুর বঙ্গিমান প্রকাশ! এখানে দ্বিজমাধব প্রত্যক্ষ রূপদর্শীর মত বাঙালা গার্হস্থের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত ছবিকে তুলির টানে অনবদ্য করে তুলেছেন। এ চিত্র তৎকালীন বাঙালী সমাজের এক কলঙ্ককাহিনীর চরমালেখ্য।

খুলনার পূজায় দেবী সন্তুষ্ট হয়ে যখন বর প্রার্থনা করতে বলে তখন খুলনার মুখ দিয়ে বার হয়ে আসে :

খুলনারে বোলে দেবী এই বর চাই।
হারিছে ছাগল পাইলে মরণ এড়াই॥

অন্য কোন বর নয়, ধন-দৌলত প্রার্থনা নয়, প্রবাসী স্বামীকে নিকটে পাওয়ার তীব্র বাসনাও নয়—কেবল হারান ছাগল পাওয়ার ঐকান্তিক আকাঙ্খা। সতীনের অত্যাচারকে কী ভীষণ হয়ে উঠেছিল দেবীর কাছে খুলনার এ প্রার্থনা তার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। তৎকালীন সমাজে যে শিক্ষার প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাই ব্রাহ্মণী কর্তৃক লহনার হ'য়ে খুলনার নিকট পত্র রচনায়। শিক্ষার জন্যে পাঠশালার ব্যবস্থা ছিল, তার প্রমাণ নিহিত রয়েছে শ্রীমন্ত কর্তৃক জনার্দন পণ্ডিতের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে।

সেকালে বহু বিবাহ ফলে পুরুষ বহুক্ষেত্রেই নারীর যৌবন-কামনাকে মেটাতে পারতো না। নারীর দেহান্তরালে যখন যৌবনের নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণ জাগ্রত হ'য়ে উঠ্‌তো—সেই জাগ্রত যৌবন-কামনা বিফল বিরহের আকার ধারণ করতো। ধনপতিকে বিদেশে নির্বাসন দিয়ে দ্বিজমাধব খুলনার এই যৌবনোন্মাদনাকে বিরহের মাধ্যমে সুন্দর প্রকাশ করেছেন :

আর দূর দেশে দুবা না পাঠাব পিউ।
বিরহ-পয়োধি মধ্যে যদি রহে জীউ॥
কেবা বোলে এ হারে জগতে সুখময়ে।
না জানি কি ভালমন্দ বিপদ সময়ে॥

এমনি ভাবেই সমগ্র মঙ্গল চণ্ডীর মধ্যে তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার সুন্দর ছবি ফুটেছে। রূপ-দর্শী কবি তুলির টানে টানে সে চিত্র আমাদের নিকট একেবারে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।

॥ আট ॥

॥ ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র ॥

ভাঁড়ু দত্ত বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। ইংরাজী সাহিত্যেও ঠিক এই ধরণের চরিত্র আছে কি না সন্দেহ। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় "ভাঁড়ু শকুনীশ্রেণীর ব্যক্তি,—ধূর্ত্ততার জীবন্ত প্রতিমূর্তি।" ভাঁড়ু সম্পর্কে এইটাই বোধ হয় সার কথা। দারিদ্র্যনিপীড়িত, শঠতাপ্রবণ বাঙালীর জীবন্ত বিগ্রহ এই ভাঁড়ু দত্ত। কেবল তৎকালীন সমাজে কেন অদ্যাবধিও সমাজ-জীবনে দত্তের মত লোকের অভাব নেই।

গুজরাটের নিকটে ভাঁড়ু দত্তের বাড়ী—অকর্মণ্য ভাঁড়ুর বাড়ীতে লক্ষ্মীর পদসঞ্চার হয় না—ফলে অধিকাংশ দিন উপবাসে যায়। একদিন উপবাসে কাটিয়ে প্রাতঃকালে তপন দত্তের মায়ের কাছে অন্নের খোঁজ নিলে তার পত্নী উত্তর দেয় : কালি গেল উপবাস আজ কোথা চাউল।" অতএব চাউলের সন্ধানে বার হয় ভাঁড়ু দত্ত। 'ছাওয়ালের মাথে' 'ছয় বুড়ি' অচল ভাঙা কড়ি গামছা বেঁধে দিয়ে বাজারের পথে পা' বাড়ায় ভাঁড়ু দত্ত—সুরু হয় তার মিথ্যার বেসাতি।

বাজারে প্রথমে ধানপসারীর নিকট উপনীত হ'য়ে সের কয়েক চাউল চায় এবং পয়সা সম্পর্কে বলে : তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাব তোরে।' কিন্তু ধনা

ভাঁড়ুকে পূর্ব হ'তে জানে ফলে ধারে চাউল দিতে অস্বীকার করে। এইবার ভাঁড়ু আপনরূপে প্রকাশমান হ'য়ে ওঠে। তার অন্তর্নিহিত শঠতা-প্রবণ তীক্ষ্ণ-ধার-বুদ্ধি দীপ্তোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। সে ধনাকে জানায় রাজার পাইকদের সাথে তার একান্ত জানাশোনা—তাদের দিয়া সে ধনাকে উপযুক্ত শিক্ষাদেবে। ধনা ভয় পায় এবং চাউল দিতে পথ পায় না। এইভাবে সে ভয় দেখিয়ে শাক এবং লবণ সংগ্রহ করে। এরপর 'তেলী'র কাছে এসেই :

কি তৈল কি তৈল বলি হাত জাবড়ায়ে।
আপনার গোপে দিল ছাবালের মাথায় ॥

বাঙালী চরিত্রের কী উজ্জ্বল প্রকাশ! তেল পরীক্ষার ছলে কি তেল বলে হাত ডুবিয়ে গোঁফে এবং মাথায় দেওয়ার ধূর্ত-প্রথা আজো বাংলার পল্লীতে পল্লীতে দৃষ্ট হয়। এভাবে ভাঁড়ু তৈল, গুবাক, চিড়া, মিঠাই, সন্দেশ এবং দধি সংগ্রহ করলো। সহজে যে দিতে অস্বীকার করে তাকে রাজার পাইক-পিয়াদার সাথে এমন কি স্বয়ং রাজার সাথে বন্ধুত্বের কথা তোলে এবং তাদের দিয়ে উপযুক্ত শাসনের ভয় দেখায় :

প্রাতঃকালে প্যাদা পাঠাইব ঘরে ঘরে।
পতাকা তুলিয়া দিব গাছের উপরে ॥

ঘোষের মা দধি দিতে অস্বীকার করায় তা'কে জানায় :

চোরা গরু লয়ে বুড়ি তোমার বসতি।
বাদী হইয়াছে যত গ্রামের রায়তি ॥

দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ায় সে দধি দেওয়ার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই ভাঁড়ু যেমন ধূর্ত তেমনি অপরের দোষত্রুটি তার নখাগ্রে। সকলকে জব্দ করে বাজার সংগ্রহ করলেও 'মাছোনি'র কাছে ভাঁড়ু ভীষণ জব্দ হয়। মাছ নিতেই ডোমনী বলে : 'কড়ি না দিয়া মৈছ্য লইয়া যাও কেনি ॥' ভাঁড়ু তার স্বভাবসুলভ ধূর্ততায় করের ভয় দেখিয়ে ডোমিণীকে বলে : "এথকাল মৎস্য বেচ কর দেয় কারে।" কিন্তু ডোমণী সাধারণ মেয়ে নয়—সে ভাঁড়ুর বাড়া। কণ্ঠ ছেড়ে সেও উত্তর দেয় :

ভাঁড়ু তুই তার কে।
করের লাগি ধরিবেক জোয়াতি হয় যে ॥

কর আদায়ের যে যোগ্য ব্যক্তি সেই কর নেবে—সুতরাং এখন নগদ কড়ির প্রয়োজন। অতএব ডোমণীর সাথে ভাঁড়ু দত্তের 'বহুল হুড়াহুড়ি' সুরু হয় এবং

এর ফলে 'কচ্ছ হোতে ভাঁড়ু দত্তের পড়ে ভাঙ্গা কড়ি।' ভাঙা কড়ি পড়ায় যেন হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙে। ফলে লজ্জায় 'মৎস্য এড়িয়া ভাঁড়ু উঠিয়া পলায়ে।' এখানে লজ্জা পাওয়াটা ভাঁড়ুর মত লোকের পক্ষে কলঙ্ক বলেই মনে হয়। বাজারের পালা এখানে শেষ এরপর রাজদরবারে ভাঁড়ুর অশোভন আচরণের সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে। সেখানে চন্দনের ফোঁটা প্রথমে 'মণ্ডল বুঢ়ন' পাওয়ায় ভাঁড়ু ক্রোধান্ধ হ'য়ে কালকেতুকে বলে :

দত্তকুল অল্প জাতি তোমার জেয়ান।
ভাঁড়ু থাকিতে চন্দন পায় অন্য জন॥

এবং রাজার প্রতি এই অশিষ্ট আচরণের অনিবার্য ফলরূপে চড় কিল লাথি অবিশ্রাম বৃষ্টিধারার মত পড়ে ভাঁড়ুর পিঠে। অবশেষে ধুলাবালি ঝেড়ে বাড়ীর পথে পা বাড়ায়। স্ত্রী ধুলির কথা জিজ্ঞাসা করে ভাঁড়ু বলে যে রাজার সাথে আজ পাশা খেলার প্রতিযোগিতা হয় এবং খেলায় রাজা ছ'বার পরাজিত হয়। ফলে রাজা 'রসে অবশ হইয়া করে হুড়াহুড়ি।' সেই জন্যেই গায় ধূলাবালির প্রলেপ পড়েছে। বলা বাহুল্য এখানে ভাঁড়ু আপন স্বভাব-সুলভ ধূর্ততার উচ্চ-গ্রামে (climax) পৌঁছে গেছে। উপস্থিত বুদ্ধিতে নতুন কথা উদ্ভাবনের অভিনব কৌশল ভাঁড়ুর অদ্ভুতভাবে আয়ত্ত।

কিন্তু মিথ্যা কথা বলে স্ত্রীর নিকট প্রশংসা পেলেও মনে মনে প্রতিহিংসার আগুন তীব্রতর হ'য়ে ওঠে। সে কৌশলে কলিঙ্গ রাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় প্ররোচিত করে এবং যুদ্ধও হয়। কিন্তু উভয় রাজার মধ্যে যখন সন্ধি হয় এবং ভাড়ুর দোষ ধরা পড়ে তখন অশ্বমূত্রে মস্তক ভিজিয়ে বাম পদতলে মাঝে মাঝে ক্ষুর ঘষে নিয়ে ভাড়ুর মস্তক মুণ্ডনের ভার নাপিতের উপর অর্পিত হয়। মস্তক মুণ্ডনের পর তাতে ঘোল ঢেলে দিয়ে তাকে গঙ্গা পার করে দেওয়া হয়। কিন্তু গঙ্গাপারে গিয়েও ভাঁড়ু আপন স্বভাব ভুলতে পারে না—বরং এই পরপারে এসেই বুঝি তার স্বভাব অধিকতর উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে। 'মাথা-মুড়া' কেন জিজ্ঞাসা করলে জনসমক্ষে সে উত্তর করে, "গঙ্গা সাগরেতে গিয়া মুড়ায়েছি মাথা।" এখানকার ভাঁড়ুই ভাঁড়ু—বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণ মিথ্যা-উদ্ভাবনী শক্তির কী তীব্র-প্রকাশ! কোন কিছুই ভাঁড়ুকে স্পর্শ করতে পারে না—বিপদ-সঙ্কুল ঘর্ণাবর্তেও ভাঁড়ুর মস্তক চির-উন্নত। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাঁর অঙ্গ-ভূষণ। অপমান তার রাজ-মুকুট। আপন স্বভাব-সুলভ সহণীয়তার দ্বারা

সে সব কিছুই অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করে। একা ভাঁড়ুই দূর-অতীতের বাঙালী-সমাজের এক বিশেষ শঠতাপ্রবণ মানুষ-গোষ্ঠীর ছবি অত্যুজ্জ্বল রূপে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছে। এই শ্রেণীর ধূর্ত মানুষের যথার্থ প্রতিনিধি ভাঁড়ু। ভাঁড়ু ভাঁড় নয়—মধ্যযুগীয় যৌথ-বাঙালী সমাজ-চিত্রের কলঙ্ক-প্রলেপ।

॥ নয় ॥

॥ জাতীয় কাব্য হিসেবে মঙ্গলকাব্যের অবদান ॥

মঙ্গলকাব্যগুলি জাতীয় কাব্য কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বেই 'জাতীয় কাব্য' বল্‌তে আমরা কি বুঝি সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় কাব্যে থাক্‌বে একটা জাতীর জীবন-যাত্রা, সভ্যতা-সংস্কৃতির চিরন্তন পরিচয়। জাতির হিয়া হ'তে অমিয় মন্থন এবং পান করে এই জাতীয় কাব্যের বর্ধন এবং পরিপুষ্টি। জাতীয় কাব্য যেন বিশাল বৃক্ষ। এর পত্র-পল্লব যেন অসংখ্য নরনারী, এর ডালপালা যেন বহু সম্প্রদায়ের প্রতীক, সমগ্র বৃক্ষটি যেন বহু বিভক্ত সম্প্রদায়ের আত্মলীন অভিব্যক্তি। জাতীয় কাব্য তাই জাতীর প্রতিবিম্ব, জাতীয় সংস্কৃতির ধারক, বাহক এবং সংগঠক। জাতীর রস পান করে যেমন এদের বর্ধন তেমনি এর মধ্যেই প্রতিবিম্বিত হ'য়ে ওঠে জাতীর আশা-আকাঙ্খার প্রতিচ্ছায়া।

জাতীয় কাব্যের এই রূপের পটভূমিতে আদিযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিকে কোন ক্রমেই জাতীয় কাব্যের দিগন্তে ফেলা যায় না। কেননা প্রথম দিকের কাব্য-গুলিতে সামগ্রিক জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তি অপেক্ষা প্রধান হয়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক রূপালেখ্য। বাঙালীর জাতীয়-জীবনের উদ্ঘাটন এবং "রস সৃষ্টি অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক দেবতার সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান" তখন এই শ্রেণীর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ফলে প্রথম দিকের মঙ্গল কাব্যগুলি একান্ত ভাবেই Communal Poetry-র অন্তর্ভুক্ত। Communal Poetry-র যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য 'of the people by the people and for the people' এর সবগুলিই আদি যুগের মঙ্গলকাব্য সমূহের মধ্যে নিহিত—ফলে একাব্য-গুলির আবেদন তখন সম্প্রদায় বিশেষের সীমাবদ্ধগণ্ডীতে সীমিত ছিল। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক, তীব্র ভেদবুদ্ধি দীর্ঘদিন মঙ্গল কাব্যগুলিকে শাসন করতে পারে নি। "কারণ, এই দেশের এই সকল সংকীর্ণতামূলক সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের উপর দিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের কূলপ্লাবনী বন্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার

ফলে এই সমাজের প্রায় সমগ্র সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের বৈষম্যের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে।" বস্তুতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আজীবন-আচরিত প্রেম-বন্যার বিপুল ঊর্মিমুখর জোয়ার-তরঙ্গে সমাজ-জীবনের সমুদয় ভেদবুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক দ্বেষ দূরীভূত হ'য়েছিল। মঙ্গল কাব্যগুলিও সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ ভেদ-ভূমি এই উদার অসাম্প্রদায়িক পটভূমিতে করেছিল পদসঞ্চার। যেদিন মঙ্গলকাব্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ গলিপথগুলি অসাম্প্রদায়িক পবিত্র আলোকমালায় প্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল সে দিন এ কাব্যগুলি হ'য়েছিল জাতীয় কাব্যের দুর্লভ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। Communal Peotry সে দিন National peotry-র উদার আসনে হয়েছিল উন্নত। জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্খার বাণীতে তাই চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্যগুলির পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। ধর্মমঙ্গল এবং বিশেষ করে চণ্ডীমঙ্গল তার সার্থক উদাহরণ। বহুসম্প্রদায় বিশিষ্ট বহুধা জাতীয়-জীবনে এই মঙ্গলকাব্যগুলি মিলন এবং ঐক্যের বাণী বহন করে এনেছে। বিভিন্ন সম্প্দায়ের ভিন্নমুখী অসংখ্য চিন্তাধারা সমন্বয়-সূত্রে গ্রথিত করে বিশৃঙ্খলসমাজ-জীবনে একটি সংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা এ কাব্যগুলির মধ্যে দেখা যায়। এবং এই সমন্বয়-আশঙ্কার ফলেই 'উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কবি তাঁর কাব্যের নায়ক করেছেন অস্পৃশ্য ব্যাধ-সন্তান কালকেতুকে। ডোম-পূজিত ধর্মঠাকুর তাই অভিন্ন রূপে কল্পিত হয়েছেন কবির আরাধ্য দেবতা বিষ্ণুর সাথে।' এখানে বর্ণ-শ্রেষ্টত্বের ছুঁত-মার্গ রোগ এসে কবির উদার কল্পনাকে সার্থক করে তুল্‌তে পারে নি। জাতীকে ধ্বংসের হাত হ'ত বাঁচাবার জন্যে কবি এখানে দলাদলির প্রাচীরটিকে সমূলে ধ্বংস করেছেন।

জাতীয় কাব্যে যে চরিত্রগুলি স্থান পায় তারা যে কেবল সমসাময়িক সংস্কৃতি এবং জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে আমাদের চিত্তের সংযোগ ঘটায় তা' নয়—জাতীয় জীবনে চিরন্তন-সত্য এবং ঐতিহ্যগুলি এই সমস্ত চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে শাশ্বত-কালীন রূপ লাভ করে। জাতীয় চরিত্রের যা' নিত্য-কালীন বৈশিষ্ট্য তা' এই চরিত্রগুলিতে বাঙ্ময় হ'য়ে ওঠে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে আমরা এমনি কতকগুলি চরিত্রের সন্ধান পাই। এমন কতকগুলি চরিত্র এই সকল কাব্যসমূহে স্থান পেয়েছে যারা চিরকালীন বাঙালী ঐতিহ্যের মূর্তিমান প্রতীক। "চণ্ডী মঙ্গলের ফুল্লরা, ভাঁড়ু দত্ত, মুরারী শীল; ধর্মমঙ্গলের কর্পূরসেন; মনসা-মঙ্গলের বেহুলা-সনকা বাঙালী গৃহের নিত্যকালের চিত্র।

এই সমস্ত চরিত্র-চিত্রনে কবিরা শুধু দেবলোকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, বাঙালীর নিত্য-পরিচিত গৃহাঙ্গণ হইতে ইহাদিগকে তুলিয়া লইয়া সাহিত্যে অমরতা দান করিয়াছেন। এই চরিত্রগুলির সহিত পরিচিত হইয়া আমরা প্রাচীন কালের সাহিত্যে আধুনিক কালের যোগসূত্র রচনা করিতে পারি এবং সেই সুদূর অতীতেও পরিচিত পদধ্বনি শুনিয়া চমৎকৃত হই।··· মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ণ প্রভৃতি মঙ্গল কাব্যগুলিতে এইভাবে বাঙালীর জাতীয় জীবনের একটা নিত্যকালের চিত্তের সহিত আমরা সহসা মুখোমুখি হইয়া পড়ি। জামাতা শিবের দারিদ্র-কল্পনা বাঙালী পিতা চিরদিনই নিজের কন্যারই দুর্ভাগ্যের বিভীষিকা কল্পনা করিয়াছে, সদ্য-বিধবা পুত্রবধূ-বেষ্টিতা শোকাতুরা সনকার মাতৃহৃদয়ের হাহাকার অকাল বৈধব্য-পীড়িত এই সমাজে ধ্বনিত হইতেছে।" এই চরিত্রগুলির অন্তর্ভেদী করুণ ক্রন্দনে আমাদের চিত্ত ক্রন্দনাকুল হ'য়ে ওঠে, এদের হাস্য-মুখর জীবন-যাত্রায় আমাদের চিত্ত আনন্দোদ্বেল হ'য়ে ওঠে। চণ্ডীমঙ্গলের শিব-পার্বতী তো দরিদ্র-নিপীড়িত বাঙালী-দম্পতী। গৃহিনী উমার গঞ্জনায় শিব গৃহ ত্যাগ করেন এবং দেশে দেশে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। গৃহিনীর প্রতি তখনো তাঁর ক্ষোভ যায় নাই :

দেশে দেশে ফিবি কত ভিক্ষা করি
ক্ষুধার অন্ন নাহি মিলে।
গৃহিনী দুর্জন, ঘর হৈল বন
বাস করি তরুমূলে॥

শিব গৃহ ত্যাগ করায় অভিমান শোনা যায় গৌরীর কণ্ঠে :

ময়ূরে মুষিকে হয় সদাই কোন্দল।
এই হেতু দুই ভাইয়ে দ্বন্দ্ব মোর কর্মফল॥
বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই কলকলি।
গণার মুষা ঝুলি কাটে আমি খাই গালি॥

এই অংশে "শাশ্বত বাঙালী-দাম্পত্যজীবনের যথার্থ-চিত্রণ পূর্ণতার সর্বোচ্চ-গ্রামে climax) সুপ্রতিষ্ঠ হ'য়েছে।······গৃহিনী দুজন ইত্যাদি বলে শিব যখন অনুযোগ করেন কিংবা 'বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর···ইত্যাদি বলে গৌরী যখন সেই তিরস্কারের প্রত্যুত্তরে খেদ প্রকাশ করেন, তখন মনে হয় না কি,— কবি-মুকুন্দরাম নিত্যদিনের বাঙালী-দম্পতির কণ্ঠ হতে ভাষা কেড়ে নিয়ে শিল্পের রূপান্তর সংগঠন সংযোজন করেছেন।" মোটকথা এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি চরিত্র বাঙালী জীবনের চরম রূপালেখ্য। চরিত্রগুলির মধ্যে বাঙালী জীবনের শাশ্বতকালীন আশা-আকাঙ্খার, ব্যথা-বেদনার ছবি ফুটে উঠেছে বলেই এই কাব্যগুলিকে জাতীয় কাব্য বল্‌তে আমাদের কোনই কুণ্ঠা থাকে না।

॥ মৈমনসিংহ গীতিকা ॥

॥ এক ॥

॥ গীতিকার সংগা ও বৈশিষ্ট্য ॥

মধ্যযুগে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপর মধুর রস-সিঞ্চন করে এক শ্রেণীর আখ্যানমূলক লোক-গীতি—Narrative folk-song—আপামর জনসাধারণের চিত্ত ব্যাপক হরণ করেছিল—এই লোক-গীতিরই ইংরেজী প্রতিশব্দ Ballad-এই Ballad শব্দটি বাংলায় 'গীতিকা' রূপে কায়া বদল করেছে। আসলে Ballad এবং গীতিকার অন্তরাত্মা এক, উভযের মর্মমূলে একই রাগিনী শত ভাব-ব্যঞ্জনায় ঝংকৃত হয়েছে।

'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য-প্রদান-প্রসঙ্গে গীতিকার যে মূল্যবান সংগা দিয়েছেন তা' বিশেষ রূপে স্মরণ যোগ্য: "ইহা আখ্যানমূলক হয়, ইহা আবৃত্তি করার পরিবর্তে গীত হয় ও প্রকাশ-ভঙ্গির দিক দিয়া ইহার লৌকিক বৈশিষ্ট্য Folk character অক্ষুণ্ণ থাকে, অর্থাৎ আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতে যে একটি বিশিষ্ট লৌকিক ছন্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে. তাহার ব্যতিক্রম করিয়া গীতিকা রচিত হয় না এবং জনশ্রুতিমূলক traditional বিষয়ই ইহার ভিত্তি। ইহার মধ্যে রচয়িতার একটি আত্মনির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ পায়। এক মাত্র ঘটনাই ইহার লক্ষ্য, গীতি-সংলাপ ও ঘটনা-প্রবাহের ভিতর দিয়া ইহার কাহিনী শেষ পর্যন্ত দ্রুত সঞ্চারিত হইয়া যায়।"

গীতিকা একটি কাহিনীর দৃঢ়বদ্ধ রূপায়ণ। এই কাহিনীর বিন্যাস এলায়িত কিংবা শিথিল নয়—জমাট এবং দৃঢ়-পিনদ্ধ। কাহিনীর যে তিনটি মূল এবং অংগীভূত বৈশিষ্ট্য—ক্রিয়া (action), পরিবেশ ও বিষয়-বস্তু এবং চরিত্র—গীতিকার মধ্যেও তাদের অস্তিত্ব বিগুমান! কিন্তু ক্রিয়া, পরিবেশ এবং চরিত্র এই তিনটির মধ্যে আবার সমগ্র কাহিনীর উপর ক্রিয়ার প্রাধান্য গভীর এবং সুদূর প্রসারী। এমন কি ক্রিয়ার সর্বগ্রাসী ব্যাপকতায় সমগ্র কাহিনীটির মধ্যে পরিবেশ এবং চরিত্রের প্রভাব গৌণ ও ম্লান হ'য়ে যায়। "ক্রিয়াই বা

action-ই গীতিকার মূল আকর্ষণ। অনেক সময় এই ক্রিয়া উচ্চাঙ্গ নাটকীয় গুণের অধিকারী হয়, ঘটনার উত্থান-পতন চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়; ইহার ঘন-সন্নিবিষ্ট ঘটনাজালের মধ্য দিয়া কোন ফাঁক দেখা যায় না, অনাবশ্যক ঘটনা ও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা ইহার মধ্যে পরিত্যক্ত হয়।" সকল প্রকার আবর্জনা এবং উপকাহিনীর অনাবশ্যক উপদ্রব পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র মূল কাহিনীটি বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণ নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে করতে অন্তর্ভেদী পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

॥ দুই ॥

॥ মঙ্গলকাব্য ও গীতিকা ॥

মঙ্গলকাব্যের সাথে গীতিকার প্রধান পার্থক্যও এখানে। মঙ্গলকাব্যেও একটি মাত্র দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারক কাহিনী অবলম্বনে রচিত কিন্তু সে কাহিনী গীতিকার কাহিনীর মত দ্রুত-সঞ্চারী নয়—নানা শাখা এবং উপ-কাহিনীর ভারে তা' মন্থরগামী। এপিক বা মঙ্গলকাব্যের কাহিনী যেন সমতল ক্ষেত্রবাহী শিথিল-স্রোতা বিশাল নদী—গতিপথের সমুদয় আবর্জনা মাথায় নিয়ে, উপকূলবর্তী বৃক্ষলতায় প্রাণ-স্পন্দন জাগিয়ে দিগন্ত-লীন প্রান্তর-ভাগ শ্যামাঙ্গ-শস্যে উজ্জ্বল করে ধীর প্রবাহে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যায় পক্ষান্তরে গীতিকা যেন বন্ধুর পাহাড়ী পথে নৃত্যচপল ঝর্ণা—আবর্জনার বন্ধন সে মানে না, বাধাবিঘ্ন সে জানে না, সকল বিপদজাল অতিক্রম করে কেবল-মাত্র বিপুল সমুদ্রের সাথে মিলনের জন্যেই দূর মোহনার পথে সে ক্রমাগ্রসর। দ্রুত পরিণতিতেই গীতিকার চরম সার্থকতা।

এ ছাড়াও আর একটি পার্থক্য উভয়ের মধ্যে প্রধান হ'য়ে উঠেছে। মঙ্গল-কাব্য সমূহের উৎপত্তি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উৎসমূল থেকে। কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-প্রচার করাই তার লক্ষ্য, সম্প্রদায়গত ধর্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করাই তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু গীতিকার মধ্যে কোন দেব-দেবীর গুণ-কীর্তন নেই, সাম্প্রদায়িক কলুষিত আবহাওয়ার মধ্যেও তার জন্ম নয়, কোন ধর্মের ছোঁয়াচ গীতিকাগুলিতে নেই। তবুও গীতিকার মধ্য হ'তে একান্তভাবেই যদি কোন ধর্মের নাম করতে হয় তা' হলো শাশ্বতকালীন মানব-ধর্ম। জাত-কুলের অতীত, দেশ-কালের অতিরিক্ত পরম

পবিত্র চিরন্তন মানবিকতাই গীতিকার অন্তর্মূলে বেগ সঞ্চার করেছে।

মঙ্গলকাব্য এবং গীতিকার পার্থক্য নির্ণয়ে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যগুলি সর্বদাই লিখিত হ'তো এবং লেখা-পৃষ্ঠাতেই তারা আত্মরক্ষা করেছে কিন্তু গীতিকাগুলি সর্বত্রই মৌখিকভাবে রচিত হ'য়েছে এবং মানুষের স্মৃতিই তাদের আত্মরক্ষার একমাত্র আশ্রয়স্থল। মঙ্গলকাব্যের কবিগণের অধিকাংশ শিক্ষিত এবং পণ্ডিত। কিন্তু গীতিকার কবিগণ পল্লবাসী, নিরক্ষর। অবশ্য এখানে স্মরণ রাখা দরকার এই কবিকুল নিরক্ষর হ'লেও মূর্খ নয়—যে শাশ্বত শিক্ষা মানুষকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে সেই মানব-প্রেমের পবিত্র অনির্বান দীপশিখা এই সকল কবিগণের অন্তরপ্রদেশ ঝলকিত করেছিল। মঙ্গলকাব্যে লাচাড়ী, পয়ার, ত্রিপদী, ইত্যাদি বিভিন্ন ছন্দ পরিলক্ষিত হয় কিন্তু গীতিকা একটি মাত্র শ্বাসাঘাত প্রধান পয়ার ছন্দেই বিরচিত। সর্বোপরি মঙ্গলকাব্যগুলি অপেক্ষা গীতিকাগুলিতে পল্লী-প্রাণের সরল কলগুঞ্জন নিবিড় হ'য়ে ধরা দিয়েছে। মাটির স্পর্শে এগুলি জীবন্ত, পল্লীর সরল মানুষের সহজ-জীবন কথায় এগুলি স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছে।

॥ তিন ॥

॥ গীতি ও গীতিকা ॥

স্থূলভাবে গীতি এবং গীতিকার মধ্যে বিশেষ কোন দুরতিক্রমী ব্যবধান নেই কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌লে-উভয়ের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য বিশেষরূপে অনুভব করা যায়। প্রথমতঃ আয়তনের দিক দিয়ে গীতি বা লোক-সংগীত—folk song—গীতিকা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। গীতিকায় একটি দৃঢ়-পিনদ্ধ কাহিনী আছে কিন্তু গীতিতে কোন কাহিনী নেই। বস্তুতঃ কাহিনীযুক্ত গীতি-ই গীতিকা। গীতিকায় সুর অপেক্ষা কাহিনীই প্রধান—কাহিনীর অধীন হয়ে সুর গুঞ্জিত হয়েছে, এখানে সুরের স্বাধীনতা বিশেষরূপে ক্ষুণ্ণ। সুরের কোন টানা পোড়েন এবং বৈচিত্র্য না থাক্‌লেও শ্রোতাগণ বিশেষ ধৈর্য সহকারে গীতিকা শ্রবণ করতো—কেননা গীতিকার তীব্র নাটকীয় গুণসম্পন্ন কাহিনী শ্রোতাদের মনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করতো। কাহিনীর এই সঞ্জীবনী সুধা সমগ্র পরিবেশের ওপর ছাপিয়ে ওঠায় সুরের দৈন্য ও বৈচিত্র্যহীনতার দিকে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হ'তো না। কিন্তু গীতিতে সুরেরই প্রাধান্য।

গীতিতে কাহিনীর কোন তীব্র আকর্ষণ না থাকায় সুর এবং ভাব আপন দেহ-সঞ্জাত পেলব স্পর্শ দিয়ে কাহিনীর সেই অপূর্ণ স্থানকে পূরণ করেছে। তাই "সুর ব্যতীত গীতির প্রকৃত রসোপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে না! ...গীতির সঙ্গে সুর 'বাগর্থবিব সম্পৃক্ত' অর্থাৎ বাক্যের সঙ্গে অর্থের যে সম্পর্ক ইহারও কথার সঙ্গে সুরের সেই সম্পর্ক। সেইজন্য সুর ব্যতীত কেবলমাত্র কথা দ্বারা গীতি প্রকাশ করা যায় না।" গীতিতে তাই সুরের অধীন কথা, ভাবের অধীন অঙ্গ। সুর এবং ভাব উভয়ের প্রবল অধীনে কথা নিতান্ত গৌণ হ'য়ে পড়েছে। গীতিতে কাহিনী না থাকায় যেমন সুরের প্রাধান্য দেওয়া হ'য়েছে - তেমনি সুরের বৈচিত্র্যও সম্পাদিত হ'য়েছে। কেননা একই সুরে গীত হ'লে একঘেয়েমি আসবেই—গীতির এই একঘেয়েমি দূর করার জন্যে তাই বিভিন্ন পল্লী-বাদ্যযন্ত্রের সহায়তায় সুরের বৈচিত্র্য সম্পাদন অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি গীতিকাতে শোনা গিয়েছে একটি মাত্র সুরের রেশ। গীতিকার একতারা দিয়ে ধ্বনিত হ'য়েছে বৈচিত্র্যহীন একই সুর-ঝংকার।

॥ চার ॥

॥ বৈষ্ণব সাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা ॥

বৈষ্ণব সাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা এই দুই পরমাশ্চর্য সৃষ্টি-প্রেমের অপূর্ব ব্যঞ্জনায় রোমাঞ্চ-রঙীন। প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্তোল্লাস, হৃদয়ার্তির রূপায়নায় উভয় গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল। তাই এই সৃষ্টি প্রেম-পরিচিতির নতুন 'কাম সংহিতা'। পটভূমি এক হলেও শিল্পী-মানসের বিভিন্নতার জন্যে উভয় কাব্যের আঙ্গিকে এবং নায়ক-নায়িকার চরিত্র-বিকাশে এক সুদূরপ্রসারী ব্যবধান রচিত হ'য়েছে। বৈষ্ণবকাব্য খণ্ড গীতির সমষ্টি—গীতিকার মত আনুপূর্বিক কোন কাহিনী তাতে স্থানলাভ করেনি। ছন্দের দিক দিয়েও বৈষ্ণবকাব্য মৈমনসিংহ গীতিকা অপেক্ষা অধিকতর আঙ্গিক-সুষম এবং কলা-নিপুণ। ছন্দ-বৈচিত্র্য এবং অনুপ্রাসের বিচিত্র ঝংকার বৈষ্ণব-কাব্যকে এক বিরল-বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এই বিরল-বৈশিষ্ট্য সংগীত-সুষমার মোহাঞ্জন-স্পর্শে অভিনব ও প্রাণবন্ত। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মৈমনসিংহ গীতিকায় একমাত্র কাহিনী ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের বৈচিত্র্য

লক্ষণীয় হ'য়ে ওঠেনি। এর ছন্দ শিল্প-সুষম নয়—সুরও এর সঙ্গে কোন লাবণ্য-শ্রী দান করনি। যদি করেও থাকে তা' একান্ত গোণ।

বৈষ্ণবকাব্যের নায়ক-নায়িকা রাধা এবং কৃষ্ণ—কোন উপনায়ক নেই। আয়ন ঘোষের কথা উল্লেখ থাকলেও কাব্যের মধ্যে তার কোন স্থান নেই, যবনিকার অন্তরালে সে এক নির্বাক ছায়া মাত্র। রাধা-কৃষ্ণের কূল-প্লাবনী প্রেম-বন্যায় সে সামান্যতম তৃণের মত কোন দিগন্ত-হারা পথে অবলুপ্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকার প্রেম-ত্রিভুজ সর্বদাই নায়ক-নায়িকা এবং আর এক বা বহু উপনায়ক- নায়িকার পদভারে কম্পমান হ'য়ে উঠেছে। এই উপনায়ক-নায়িকার আগমনে গীতিকার কাহিনীর নাটকীয়তা অধিকতর জটিল এবং ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে।

প্রেম উভয় কাব্যের উপজীব্য হ'লেও—প্রেমের রূপায়ণ উভয় কাব্যে এক নয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রেম আধ্যাত্মিক রাজ্যের। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভাষায় "বৈষ্ণবপদাবলীর কেন্দ্রীভূত এক স্বর্গীয় উপাদান আছে, উহা মানবীয় প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহসা সুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিনী ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌছিতে সমর্থ হইয়াছে।" রাধা-কৃষ্ণ যেন স্বর্গ হ'তে দু'দিনের জন্যে মর্তে এসে মর্তের কুঞ্জবনে স্বর্গের লীলা করে আবার স্বর্গের সোনালী পথ বেয়ে অনন্তলোকে চলে গেছেন। প্রেমোন্মাদিনী রাধার কাছে তাই সমাজের বন্ধন নেই, গুরুজনের অবরোধ নেই, গৃহের গণ্ডীও বিচ্ছিন্ন। সকল দুরতিক্রমী বন্ধন তিনি ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকার নায়িকাগণ দুর্বার প্রেমোন্মাদনায় মত্ত হয়েও লজ্জার অবগুণ্ঠনে অবনত, সমাজে শ্রদ্ধাবান, গৃহের কুলবধূ। মৈমনসিংহ গীতিকার সম্পাদক কী অপূর্ব ভাবেই না এই উভয় নায়িকার প্রেম-পার্থক্য নিরূপণ করেছেন, "এই ভালবাসার (মৈমনসিংহ গীতিকার নায়িকাগণের) পুরস্কার—দুঃসহ অত্যাচার, উৎকট বিপদ্, মৃত্যু ও বিষ-পান। এই পুরস্কার পাইয়া বন্ধুর দুরারোহ দুর্গম পথে অনুরাগের খর প্রবাহ চলিয়াছে ; স্বীয় গতির আনন্দে ঝংকৃত হইয়া সমস্ত বাধা উপেক্ষা-পূর্বক, এই আত্মতৃপ্ত, সংসার-বিমুখ, উর্দ্ধমুখী মন্দাকিনী স্বীয় মানস-কল্পলোকের সন্ধানে ছুটিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতা বঙ্গরমণী সমাজ-দ্রোহী, পরিজনের প্রতি উপেক্ষাময়ী, দুর্জয় দর্পশীলা। কিন্তু এই সকল গাথায়, তিনি গৃহের-গৃহলক্ষ্মী,

সমাজের নিকট নতশিরা, তাঁহার দর্প-অভিমান নাই, লজ্জার অবগুণ্ঠন তিনি টানিয়া ফেলিয়া রাজপথে বাহির হয়েন নাই, কিন্তু তথাপি অনুরাগের ক্ষেত্রে তিনি জগজ্জয়ী,—কুটীরে থাকিয়াও তিনি স্বর্গের বৈভব দেখাইয়াছেন। সমাজের অনুশাসনে ধরা দিয়াও, তিনি চিরমুক্ত, আত্মার অটল বল প্রকাশ করিতেছেন, সমাজের ভ্রূকুটিতে তিনি মর্মপীড়া পাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অনুরাগ সেই বাধায় আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।"

বৈষ্ণবপদাবলীর প্রেমে আধ্যাত্মিকতার সুর প্রধান কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রেম বঙ্গ-বালার প্রাণ-সম্পদ। প্রেমের মলয়-সমীরণে প্রকৃতিগতভাবে বঙ্গ-কুমারীর হৃদয়ে যে প্রেম-শতদল বিকশিত হ'য়ে ওঠে—গীতিকায় নিহিত রয়েছে সেই প্রেমের নিবিড়তম পরিচয়। নীতিবোধ, ধর্মবোধ এবং সংস্কার বোধ এই ত্রিবিধ সঙ্গম-তীর্থে এই প্রেম অত্যুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

॥ পাঁচ ॥

॥ মৈমনসিংহ গীতিকা ও বাংলা উপন্যাস ॥

আধুনিক বাংলা উপন্যাস বাস্তবানুগ এবং কর্ম-বহুল মানুষের জীবন-বেদ। এর প্রতিটি পৃষ্ঠা দেববাদ-নির্মুক্ত মানবতার বিজয়গানে মুখর। বাস্তবতার রূপালেখ্যে এবং কর্মচঞ্চল মানুষের জীবন-বিন্যাসে এগুলি আমাদের হৃদয়ের গোপনতম স্থান সহজেই অধিকার করে নিয়েছে। সর্বোপরি এর ঘনসন্নিবিষ্ট ঘটনাজাল, নাটকীয় উপস্থাপনা, প্রেম-বৈচিত্র্যের সীমাহীন বিস্তার আমাদের কর্মক্লান্ত মনকে কী নিবিড় ভাবেই না আকর্ষণ করে। আধুনিক উপন্যাসের এই সকল প্রধান লক্ষণগুলি বীজাকারে বাংলা মাটির প্রাণ-সম্পদ মৈমনসিংহ গীতিকার মধ্যে নিহিত রয়েছে। অঙ্গসৌষ্ঠবের কথা বাদ দিলে মৈমনসিংহ গীতিকা এবং আধুনিক উপন্যাসের প্রাণ-স্পন্দন একই আবেগে কম্পিত হ'য়েছে। উভয়ই একই উৎসমূল হতে বেগ নিয়ে একই সমান্তরাল সরল রেখায় দিগন্ত পরিভ্রমণ করেছে। প্রকাশ-রীতি ছাড়া আবেগ উভয়ের একই, ঝংকার উভয়ের এক, পটভূমিতে কোনই বিভিন্নতা নেই।

মধ্যযুগের আখ্যায়িকা কাব্যের অন্যতম শাখা মঙ্গল-কাব্য সমূহের মধ্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই সূত্রে অনেকেই মঙ্গলকাব্যকে আধুনিক উপন্যাসের পূর্ব-সূচনা

বলে উল্লেখ করেন। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তো স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণাই করেছেন : "যে সকল চারিত্রিক উপাদান অবলম্বন করিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাস রচিত হইয়াছে, বিজয় গুপ্ত এখানেও সেই উপকরণগুলিরই সন্ধান পাইয়াছেন এবং তাহাই তাঁহার কাব্য রচনার উপজীব্য করিয়াছেন। এই সূত্রে বিজয় গুপ্তের কাব্য আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক কথা-সাহিত্যের অগ্রদূত।" মন্তব্যটি অস্বীকার করা যায় না—কিন্তু অতিভাষণ-দুষ্ট। মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলির লীলা-মাধুরীতে হয়তো আধুনিক উপন্যাসের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, ঘটনা বিন্যাসেও হয়তো তার পরিচয় জড়িয়ে আছে কিন্তু আধুনিক উপন্যাসে দেববাদ-বিনির্মুক্ত মানবিকতার যে বলিষ্ঠ সরব উচ্চারণ-বাণী ঘোষিত হ'য়েছে মঙ্গলকাব্যে তার পরিচয় কোথায়? মঙ্গল-কাব্যে যে দেব-দেবীর ভয়াল পদভারে মানব-কুল ভগ্ন-মেরু! মানব-সমাজের নব জয়গানের নব উত্থান এ কাব্যে নেই—এ কাব্য মর্তের মাননীয় শক্তির ধ্বংসস্তূপের ওপর দেবদেবীর নিষ্ঠুর-নিপীড়নের বিজয়গাথা। এ কাব্যের সুবিশাল রাজ্যে একচ্ছত্র সদর্প-সম্রাট অলৌকিক দেবদেবী। সুতরাং আধুনিক ঔপন্যাসিক-ঘটনা-বিন্যাস এবং মানবের সুখ-দুঃখের কিছু পরিচয় এসব কাব্যে বর্তমান থাকলেও আধুনিক উপন্যাসের পূর্ব-সূচনা বলা যায় না কোন মতেই। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকায় দেব-দেবীর এই অবাঞ্ছিত উপদ্রব নেই। এ কাব্যের জীবন-স্রোত মানবীয় জীবন-রসে স্ফটিক-স্বচ্ছ, আকস্মিক কোন অলৌকিকত্ব এসে সেই স্রোতকে আবিল করে তুলতে পারেনি। অবজ্ঞাত পল্লীর অশিক্ষিত নরনারী পৃথিবীর রঙ্গ-মঞ্চে জীবন-নাট্যের যে প্রেম-লীলাঙ্ক অভিনয় করেছে এ গীতিকা সেই লীলাভিনয়ের অত্যুজ্জ্বল রূপায়ণ। মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার বর্ণবহুল বিন্যাসে গীতিকাগুলি যেন বর্তমান উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। মহুয়ার জীবনের যে দুঃসহ বেদনা, চন্দ্রাবতীর জীবনের যে অপরিসীম দুঃখ, মদিনার জীবন-সায়াহ্নে যে বিমলিন ট্রাজেডী ঘনায়মান হ'য়ে উঠেছে তা আমাদের হৃদয়কে করুণ-রসে অভিসিক্ত করে তোলে। এদের দুঃখময় জীবন-বর্ণনায় সর্বত্র বাস্তবতার অভিনব ছায়াপাত ঘটেছে। কোথাও এরা এই তৃণ-শ্যামল ধূলি-মলিন পৃথিবীর উপরে উঠে যায় নি। আধুনিক উপন্যাসের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নায়ক-নায়িকার জীবন-প্রবাহে আর এক উপনায়ক-নায়িকা আনয়ন করে' প্রেম-ত্রিভুজ রচনা

করা—বলাবাহুল্য মৈমনসিংহ গীতিকার সর্বত্রই উপনায়ক-নায়িকার আবির্ভাবে জটিল আবর্তনের সৃষ্টি হ'য়েছে। এদের আগমনে আধুনিক উপন্যাসের মত মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনী-গ্রন্থি ক্রম-জটিল হ'য়ে উঠেছে। এই ক্রম জটিলতাকে আবার সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে কুট্টনী বুড়ি এবং চিকণ গোয়ালিনীর মত কয়েকটি 'উচ্ছিষ্ট' জীব। আধুনিক উপন্যাসে এমন চরিত্র বিরল নয়। কোন দেবত্ববাদ নেই, কোন ধর্মপ্রচার নেই—উপন্যাসের বস্তুনিষ্ঠ একান্ত বাস্তব কাহিনীই মৈমনসিংহ গীতিকার উপজীব্য। এখানেও গীতিকাগুলির সাথে আধুনিক উপন্যাসের ঘনিষ্ট যোগ বর্তমান।

আখ্যায়িকাগুলিতে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র ফুটেছে তা' সংক্ষিপ্ত হ'লেও বাস্তবতার দিক দিয়ে নিখুঁত। শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' ইত্যাদিতে সমাজের যে দুষ্ট প্রকৃতির সমাজ-পতির সন্ধান পাই—এই গীতিকার অনেকগুলি আখ্যানে তেমন চরিত্র ছড়িয়ে আছে। শাস্ত্রীয় অনুশাসনে এবং স্বৈরাচারী বামুন ইত্যাদির অনুপীড়নে গীতিকার অনেকগুলি চরিত্র ম্লান না হ'য়েও ধ্বংসের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হ'য়েছে—আধুনিক উপন্যাসের বহু স্থানেই এর নজির মিল্‌বে। গীতিকার অনেকগুলি কাহিনীতে আরণ্যক-জীবনের বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃ-প্রকৃতির যে পরিচয় পাই 'কপালকুণ্ডলা'র মত বহু উপন্যাসেই তার চিত্রণ ঘটেছে। কিন্তু এই সকল ছাড়াও আর একটি স্থানে বুঝি উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্টতম সম্পর্ক বিদ্যমান। শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় তা অনবদ্য হ'য়ে ফুটেছে: "...আভ্যন্তরীন সমাজপীড়নের কোন সুলভ সমাধান নাই। যে সামাজিক সংকীর্ণতা মানুষের সুখের পথে শেষ অন্তরায় হইয়াছে তাহার প্রতিবিধান দৈবেরও ক্ষমতাতীত। কাজীর শূলের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু দুর্বলচিত্ত চান্দবিনোদ বা তাহার আচার-মূঢ় আত্মীয়-স্বজনের জন্য সেরূপ কোন আশু ফলপ্রদ প্রতিকারের ব্যবস্থা নাই। কারকুনকে নরবলি দিয়া আখ্যায়িকা হইতে বিদায় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অর্থলোভী আত্মীয়াধম ভাটুক ঠাকুরের আসন সমাজবক্ষে স্থিরতর রহিয়াছে। অত্যাচারী কাজী, দেওয়ান প্রভৃতি প্রবল প্রতিক্রিয়ার বেগে জ্যা-নির্ম্মুক্ত ধনুকের ন্যায় দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু নেতাই কুটনী, চিকন গোয়ালিনী, প্রভৃতি জীব, যাহারা অপরের লালসার বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া আসিতেছে ও পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, তাহারা চিকিৎসাতীত দুষ্ট ব্রণের ন্যায় সমাজ-দেহে

অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই দিক দিয়া বর্তমান কালের সমাজ-জীবনের সহিত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের একটা অক্ষুন্ন যোগসূত্র রহিয়া গিয়াছে।" এই গীতিকায় যে উপমা ব্যবহার করা হ'য়েছে তা একান্তভাবে প্রকৃতির নিজস্ব, সংস্কৃত-সাহিত্যের ঢক্কানিনাদের অবাঞ্ছিত প্রবেশে বাংলার পেলব-মসৃণ সুরটি গীতিকা হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি, নায়িকাদের শোকোচ্ছ্বাস আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। এই গীতিকায় কাজী বা দেওয়ানদের যে অত্যাচারের কথা বলা হ'য়েছে তা সবল কর্তৃক দুর্বলের ওপর অত্যাচার, শাসক কর্তৃক শাসিতের ওপর নিপীড়ন—এই কাজী বা দেওয়ান শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ বেনিয়াদেরই প্রকারভেদ মাত্র। আধুনিক উপন্যাসের বহু পৃষ্ঠায় হ'য়েছে এই শ্বেতাঙ্গ অত্যাচারের চিত্রাঙ্কণ। সর্বোপরি "ভাব প্রকাশে কথ্য ভাষার প্রয়োগ ইহাদিগকে উপন্যাসের আরও নিকটবর্তী করিয়াছে।·· উপন্যাস সাহিত্যের পূর্ব-স্বচনার দিক্ দিয়া মৈমনসিংহ গীতিকার প্রয়োজনীয়তা সর্বথা স্বীকার্য্য।"

কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকাকে আধুনিক উপন্যাসের পূর্ব-স্বচনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে আমাদের এতসব প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় একটি কথায় উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন আধুনিক উপন্যাসে মৈমন সিংহ গীতিকার কোন প্রভাব নেই—কেননা এই সব গীতিকা সমূহের আবিষ্কার এই মাত্র সেদিন সম্পন্ন হয়েছে। এতদিন তারা অনাবিষ্কৃত অবস্থায় মৈমনসিংহের ঝোপে জঙ্গলে আর্তনাদ করে মরেছে। সুতরাং শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্যের মতে "চণ্ডীমণ্ডপের কৃত্রিম ধারাটিই ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিগণের সহায়তায় নব প্রতিষ্ঠিত নাগরিক দরবারের সিংহদ্বার পর্যন্ত পৌঁছিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, উন্মুক্ত মাঠের সাহিত্য পল্লীর মাঠে মাঠেই বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, কোন সুসংবদ্ধ রূপলাভ করিয়া আধুনিক সাহিত্য সংস্কৃতির অলংকার স্বরূপ হইতে পারে নাই। সেইজন্য বাংলার লোক কথাও গীতিকার মধ্যে বাংলা উপন্যাসের স্বচনা দেখা গিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারা আধুনিক উপন্যাস পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই।" শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্যকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিন্তু বিপক্ষে কিছু বলা যায়। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় রূপকথা, লোক-গাথা এবং গীতিকাগুলিই আপন আপন সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে।

আমাদের বাংলা সাহিত্যেও ঐ একই ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। গীতিকাগুলি অনাবিষ্কৃত ছিল এবং পুস্তকাকারে পূর্বে প্রচারিত হয়নি বলেই যে তারা আধুনিক উপন্যাসে কোন বেগ সঞ্চার করেনি এ কথা সর্বাংশে সত্য নয়। এই গীতিকাগুলি অনাবিষ্কৃত অবস্থাতেই বাংলার আপামর জনসাধারণের নিকট ছড়িয়ে পড়েছিল—ঠাকুর মা এবং প্রাচীন বয়বৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিকট থেকে এমন গল্প আমরা বহু শুনেছি। ঠাকুর মা জাতীয় বয়বৃদ্ধারাই এসব গীতিকাকে নিখিল বাংলায় ছড়িয়েছেন। সুতরাং গীতিকাগুলি যে আধুনিক উপন্যাসের সাথে একেবারেই সম্পর্ক শূন্য তা কোন মতেই স্বীকার করা চলে না। পুস্তকাকারে বহু পূর্বে প্রচারিত হ'লে যে প্রভাব গভীর এবং ব্যাপক হ'তো—অমুদ্রিত অবস্থায় মৌখিক প্রচারের মাধ্যমে ব্যাপকতার পরিমাণ সংকুচিত হয়েছে মাত্র।

॥ ছয় ॥

॥ মৈমনসিংহ-গীতিকা বাংলা-মাটির সম্পদ ॥

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মৈমনসিংহ-গীতিকার আবিষ্কার-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "এই পল্লীগাথার আবিষ্কার আমার চক্ষে খুব বড় রকমের একটা জাতীয় ঘটনা।" কেননা এই গীতিকাগুলির প্রত্যেকটি কাহিনীর মধ্য হ'তে জাতীয় ঐতিহ্যের সুমহান সুরতরঙ্গ অভিনবরূপে স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছে। প্রতিটি কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায় বাংলার মাটির স্পর্শ, প্রতিটি আখ্যানের মধ্যে জড়িয়ে আছে পল্লী-প্রান্তরে ফুটে ওঠা কেতকী-শেফালীর মধুর সুরভী, প্রতিটি গল্পের মধ্যে মিশে আছে নদীমাতৃক বাংলা দেশের পেলব-মসৃণ সায়াহ্ন-কোমলতা। এর ভাষা ভাস্কর্য-সুঠাম অলংকার দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল নয়—গ্রামীন গণচিত্তের সরল কথ্য রূপ। এর উপমা বিদেশী স্বপ্নরঙীন ডেফোডিল পুষ্প এবং শোয়ালো পাখী নয়—শ্যামাঙ্গ-উজ্জ্বল বাংলাদেশের বিশাল বনানী, সদাহাস্য চাঁপা-কদম এবং পত্র-পল্লব অন্তরালবর্তী বৌ. কথা কও পাখীর সুরেলা ডাক। এর পরিব্যাপ্তীর দিগন্তে নটারডেম, টেম্স নদীর সুড়ঙ্গ, রোমের ভ্যাটিক্যান নেই, আছে পূর্ব-মৈমনসিংহের ঝিল ও তড়াগ, সর্পব্যাঘ্র-সংকুল অরণ্যভূমি, স্বর্ণপ্রসূ শালীধানের দিগন্ত বিথারী বিস্তার। এর চরিত্রাবলী মিসেলেগুা, ডেসডেমনা, নোরা-র দীপ্তি রং-এ রঙীন নয়—মলুয়া,

মহুয়া, মদিনার শান্ত দ্যুতিতে শুভ্রময়। এই চরিত্রাবলীর আবাসভূমি তীব্রদ্যুতি-ঝলসিত রাজপ্রাসাদ নয়, অনির্বান দীপালোকে সমুজ্জ্বল মাটীর পর্ণকুটির। এই গীতিকাগুলির সর্বত্রই বাংলা মাটির কী অমোঘ আকর্ষণ, কী মহান সংযোগ! বাংলার মৃত্তিকায় প্রবাহমান নদ-নদী, বাংলার মৃত্তকায় দোদুল্যমান তৃণলতা, বাংলার মৃত্তিকার জল-বায়ু-পশু-পাখীর কলরবে এই গীতিকাগুলির আভ্যন্তরীণ সকল নীরবতা মুখর হ'য়ে উঠেছে।

॥ ক ॥ ভাষার অকৃত্রিমতা :

মৈমনসিংহ গীতিকায় আমরা যে ভাষা পেয়েছি তা' কৃত্রিমতার কালিমায় কলুষিত নয়—অকৃত্রিম ভাষার অনাবিল স্রোতধারায় অনন্য-সুন্দর। যে কালে এই গাতিকাগুলির সৃষ্টি-যজ্ঞ মৈমনসিংহের অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লী-প্রান্তরে চল্‌ছিল সেকালে বাংলা ভাষা ক্রমান্বয়ে দেবভাষার অতিরঞ্জনে স্ফীত, অলংকার-অনুপ্রাসে মুখর এবং শব্দৈশ্বর্যে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠছিল কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই গীতিকাগুলিতে সেই অতিরঞ্জনের এতটুকু স্পর্শ নেই—এগুলি আশ্চর্য ভাবে সেই দুরারোগ্য ছোঁয়াচ-ব্যাধি হ'তে মুক্ত। এখানে আমরা চাষী-মুখের সেই অকৃত্রিম-কথ্য ভাষাটিকেই পেয়েছি। গীতিকাগুলিতে বহুতর উর্দ্দূ-ফারসী-আরবী ভাষা লক্ষ্য করা যায়—কিন্তু এগুলি বলপূর্বক উপর হ'তে চাপান হয়নি। সে সময় দেশের শাসনকর্ত্তা মুস্‌লিম সম্প্রদায়—এবং তারই প্রভাবে সুদীর্ঘ পাঁচ-ছয় শতাব্দী ধরে ক্রম-লেন-দেনের প্রভাবে বাংলা ভাষাটা হিন্দু-মুস্‌লিমের যৌথ-সম্পত্তি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। "এই মিশ্রভাষা আমাদের চাষার কুটিরে, এমন কী হিন্দুর অন্তঃপুরে পর্যন্ত ঢুকিয়াছে। বাংলার অভিধান হইতে এখন আর তাহা বাদ দেওয়া চলে না। কিন্তু হিন্দু লেখকগণ মুখে যেভাবে কথা কহিয়া থাকেন, সংস্কৃতের ঘোর প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া লিখিবার সময় সেগুলি অন্যরূপ করিয়া ফেলেন। শতবার কথিত ও শ্রুত 'খাজ্‌না' তাঁহাদের লেখনীতে 'রাজস্ব' রূপে পরিণত হয়—চিরপরিচিত 'ইজ্জৎ' 'সম্মান' হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে 'জবরদস্তি' 'বলপ্রয়োগ,' 'দুস্তি' 'বান্ধবতায়,' 'জমি' 'মৃত্তিকায়,' 'আসমান' 'আকাশে' এবং আরও শত শত নিত্যকথিত বিদেশী শব্দ যাহাদের অস্থি মজ্জা বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারা লিখিত সাহিত্যে সংস্কৃত আগন্তুকের নিকট নিজেদের স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া থাকে।" হিন্দু লেখকগণ যেমন বাংলাকে আরবী-ফারসী-

ঘেঁসা করে একপ্রকার জগাখিচুড়ী 'মুসলমানী বাংলা' করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই উগ্র হিন্দু-মুস্‌লিম সম্প্রদায় ভুলে গিয়েছিলেন যে "ভাষা জিনিষটা পণ্ডিত বা মোল্লার হাতের মোরব্বা নহে। দেশের জলবায়ু ও আলোকে ইহা পুষ্ট হইয়া থাকে। ইহা স্বীয় জীবন্ত গতির পথে, ইচ্ছাক্রমে বর্জন ও গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, স্বীয় ললাট-লিপিতে কোন শিক্ষকের ছাপ মারিতে চায় না।" মৈমনসিংহ গীতিকায় আমরা যে ভাষা পেয়েছি তা' বাংলা মাটির একান্ত আপন সম্পদ। কৃত্রিমতার কোন কালিমা এতে স্থান পায়নি। এ গ্রন্থের ভাষা যেন পথ-প্রান্তে তৃণ-শয্যায় আপনি বিকশিত হ'য়ে ওঠে যূথিকা পুষ্প—এর অঙ্গের ধূলি-মালিন্য এ আপনিই ঝেড়ে ফেলে। কিন্তু এই পুষ্প যখন বহুমূল্য গজ দন্তের টেবিলোপরি কারুকার্য সমন্বিত পুষ্পাধারে স্থান পায় এবং তখনই যত গোলযোগ। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকায় এই বনফুলই রক্ষিত হয়েছে। তাই "এই সকল গাথায় 'হস্তী' (হাতী) শব্দ 'আত্তি' 'বর্ষা' শব্দ 'বাস্যা, 'শ্রাবণ' শব্দ 'শাওন', 'মিষ্ট' শব্দ 'মিডা' 'শিকার' শব্দ 'শিগার' প্রভৃতি প্রাকৃত ভাবেই সর্বদা ব্যবহৃত হইয়াছে। এখনও চাষারা এই ভাষায় পাড়াগাঁয়ে কথা কহিয়া থাকে। পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে ঘুরিয়া আমাদের মাথা ঘোলাইয়া গিয়াছে, আমরা অভিধানের সাহায্যে প্রাকৃত শব্দ সংশোধনপূর্বক সেই সংশোধিত ভাষাটাকেই বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া পরিচয় দিতেছি।"—দীনেশচন্দ্র সেন। ভাষার এই অকৃত্রিমতা রক্ষিত হয়েছে বলেই মহুয়া কৃত্রিম রোষে নঙ্গার ঠাকুরকে বল্‌তে পেরেছে:

লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর
গলায় কলসী বান্ধ্যা জলে ডুব্যা মর ॥

এবং এই ভাষাতেই নঙ্গের ঠাকুর আপন অন্তরের অসীম আকৃতির সবটুকু উজাড় করে উত্তর দিয়েছে:

কোথায় পাইবাম কলসী কন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ি।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি ॥

এই একান্ত সজীব আন্তরিক ভাষাই মৈমনসিংহ-গীতিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাটির কথা মাটির ভাষাতেই ছন্দিত আন্দোলনে অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে।

॥ খ ॥ বাংলা মৃত্তিকা-জাত উপমা:

এই গীতিকা সমূহে যে সকল উপমা ব্যবহার করা হ'য়েছে তা' একান্তভাবে

বাংলারই। এই সকল উপমার জন্যে কবিকে অসীম স্বর্গালোকে উঠ্‌তে হয় নি, স্বর্ণ-ঝলকিত রাজপ্রাসাদেও পদার্পণের প্রয়োজন হয়নি—এই উপমা-রাজী আহৃত হ'য়েছে বিপুল বিস্তারিত বনভূমি হ'তে, বর্ষা-বিস্ফারিত নদ-নদী হ'তে, নীলিমার উদার শ্যামলীমা হ'তে। এক কথায় যা প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব, যা মনোরম এবং সুন্দর সেই সমুদয় বস্তুগুলি প্রত্যক্ষদর্শী কবিদের কল্পনায় নিবিড় ভাবে ধরা দিয়েছে। মহুয়ার রূপ-বর্ণনায় কবি বলেছেন :

হাট্টিয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল।
মুখেতে ফুট্টা উঠে কনক চাম্পার ফুল॥

এখানে মহুয়ার দীর্ঘায়িত কেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'আজানুলম্বিত' এই বিশেষ কথাটির ব্যবহার নেই, মুখের শুভ্রতা ও নির্মলতার বর্ণনায় বহুপরিচিত পূর্ণচন্দ্র এসে ভীড় জমায় নি—বাঙালীর অতিপরিচিত চাঁপা ফুল দিয়ে কবি মহুয়াকে কেমন মনোরম অনবদ্যতার দুষ্প্রাপ্য-মনোহর করে তুলেছেন। শত উপমা-উৎপ্রেক্ষায় যা' সম্ভব হ'তো না এক চম্পাকলিতে তাই সম্ভব হ'য়ে উঠেছে! মহুয়া তাইতো আমাদের সম্মুখে কামনা-মন্দির রৌদ্র-বিলাসিনী চম্পা-সহচরী নয়—নিটোল-যৌবনা কৃষাণ-কুমারী।
'কমলা'র রূপ বণনায় কবি আশ্চর্য দক্ষতার সাথে যে উপমাগুলি প্রয়োগ করেছেন তাতে কমলার রূপ শত ভাব-ব্যঞ্জনায় ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। অভিনব রূপাল্পনায় কবি যেন তুলির টানে টানে কমলাকে রেখাঙ্কনে জীবন্ত করে তুলেছেন।

চান্দের সমান মুখ করে ঝলমল।
সিন্দুরে রাঙ্গিয়া ঠুট তেলাকুচ ফল॥
দেখিতে রামের ধনু কন্যার যুগ্ম ভুরু।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি কটিখানা সরু॥
কাকুনি শুপারি গাছ বায়ে যেন হেলে।
চলিতে ফিরিতে কন্যা যৌবন পড়ে ঢলে।
আষাঢ় মাস্যা বাশের কেরুল মাটী কাট্টা উঠে।
সেই মত পাও দুইখানি গজন্দমে হাটে
বেলাইনে বেলিয়া তুলছে দুই বাহুলতা
কণ্ঠেতে লুকাইয়া তার কোকিল কয় কথা॥

রক্ত-রঙীন তেলাকুচ ফলের সাথে রক্তাভ ঠোঁট, সমীরণে কম্পমান শুপারি

গাছের সাথে যুবতীর যৌবন-ভারাক্রান্ত দেহের কম্পন, সজল আষাঢ়ের সরস মৃত্তিকা ভেদী বাঁশের শ্যামল-সতেজ অঙ্কুরোদ্‌গমের সাথে নব যৌবন-সম্ভারে সজ্জিতা যুবতীর অটল পদযুগল এবং বেলুনে বেলা নিটোলতার সাথে সুকোমল বাহুদ্বয় উপমিত হওয়ায় যৌবন-রাগ-দীপ্ত কমলার যে অপূর্ব মূর্তি আমাদের সম্মুখে অঙ্কিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে তা' বিরল-দৃষ্ট। অথচ প্রতিটি উপমাই আমাদের কত পরিচিত, কত প্রত্যক্ষ!

দীর্ঘ বিরহ এবং বিচ্ছেদের পর নদের ঠাকুর যখন মহুয়ার সন্ধান পায় তখন তার অতৃপ্ত হৃদয়ের পরম শান্তির বার্তা কবির তুলিকায় রেখায়িত হ'য়ে ওঠে এই ভাবে:

সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল।
পদ্মফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল ॥

এখানে সাপ ও মণি, পদ্ম ও ভমরা, মহুয়া ও নদের চাঁদের অন্তরাত্মাকে অপূর্ব ব্যঞ্জনালোকে সমুদ্ভাসিত করে তুলেছে।

কঙ্কের বিরহে লীলার হৃদয়ে বজ্রশেল নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে—বিরহের সুতীক্ষ্ণ দহনে লীলার লালিত্যাস অঙ্গশ্রী মলিন হ'য়ে গেছে:

ভাবিতে ভাবিতে লীলার বদন হইল কালা।
সাপের বিষ হইতে অধিক বিরহের জ্বালা ॥

এই বিরহেই লীলার দীঘল কেশপাস চাচুলীর আঁশে পরিণত হয়:

গঙ্গার তরঙ্গ লীলার দীঘল কেশপাশ।
সে কেশ শুকাইয়া হইল চাচুলীর আঁশ ॥

চাচুলীর আঁশের সাথে (বাঁশ চাঁচিলে যেরূপ আঁশ হয়) বিরহিনী লীলার বিশুষ্ক কেশের তুলনা কি অনন্য সুন্দর এবং মর্মান্তিক। এই উপমাগুলি লীলার বিশীর্ণ ছবিকে সুন্দররূপে তুলে ধরেছে। কিন্তু উপমার চাতুর্য ও প্রয়োগ মহিমা বুঝি সর্বোচ্চ গ্রামে (Climax) পৌঁচেছে বিরহ-কাতরা লীলার শীর্ণ দেহ বর্ণনায়:

প্রথম যৌবন কন্যা কমনীয় লতা।
সে দেহ শুকাইয়া হইল ইক্ষুকের পাতা।
বৈকালীর রাঙ্গা ধনু মেঘেতে লুকায়।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু শয্যাতে শুকায় ॥

বিরহের এই দীর্ণ দশা, এই অন্তিম অবস্থা অন্য কোন ভাষায় এমন হৃদয়বিদারক হ'য়ে উঠবে? এক বিশুষ্ক ইক্ষুকের পাতা লীলার অন্তর্ভেদী সমুদয় বেদনা-ব্যথাকে উজাড় করে আমাদের অন্তরমূলে সঞ্চারিত করে দিয়েছে। এ উপমা কত সজীব, কত জীবন্ত, কত গভীর গূঢ় অর্থ ব্যঞ্জক! মৈমনসিংহ-গীতিকার মৃত্তিকাজাত উপমাগুলির চরম সার্থকথা এইখানে।

গ॥ মাটির চিত্র:

মৈমনসিংহ-গীতিকায় মাটির ভাষায়, মাটির উপমায় যে চিত্র ফুটেছে তা' একান্তভাবে মাটিরই চিত্র। মৃত্তিকার সুধা-রসে তা' সিক্ত। মৃত্তিকার মোহাঞ্জন-স্পর্শে তা' পরমসুন্দর। এই চিত্র কোন দূর পথের কৃত্রিম ইট-পাথরের ধাঁধানো সৌন্দর্যকে প্রকট করে তোলে না—মুক্ত প্রকৃতির শ্যামল-সৌন্দর্যকে উন্মুক্ত করে দেয়। বর্ষার কদম্ববৃক্ষ, নদীর তীর-ভূমে কেয়াফুলের ঝাড়, মান্দার গাছের ডালে ঘেরা কদলীবন, চাঁপা-কুমুদের কুসুমাস্তীর্ণ পথ এবং সর্বোপরি ছায়া-ঢাকা শ্যামল বৃক্ষতলে ছোট ছোট কুটির—স্বপ্নমন্থর সোনালী দিনের মত এক অপূর্ণ রহস্যালোকে আমাদের নিখিল চিত্তকে উদ্বেল করে তোলে। বিরহী কঙ্ক যে পথে বাঁশী বাজিয়ে চলে সেই বিজন-প্রান্তরের গলিপথ আমরা যেন স্পষ্টই দেখ্‌তে পাই, চাঁদ বিনোদ যে পথ দিয়ে হরষিত মনে ধান কাট্‌তে চলে সে পথ আমাদের কত পরিচিত, যে বনপথে কাজলরেখা বিসর্জিত হয়েছিল তা' আমাদের অজ্ঞাত নয়, যে পর্ণকুটিরাভ্যন্তরে বসে বিরহিনী মদিনা দুলালের জন্যে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় পাণ্ডুর-ম্লান দিনগুলি যাপন করেছিল তা' আমাদের পরিচিত দিগন্তের উজ্জ্বল স্বর্ণ-দেউল। প্রথম ধান ঘরে আনার সময় যে অসীম আনন্দে চাষীদের অন্তর্লোক আনন্দ-মূর্চ্ছনায় রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌তো তা'র সার্থকতম প্রতীক চাঁদ বিনোদ। তার বারমাসীতে সেই আনন্দ-রোল শত ধারায় গুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। এই মৃত্তিকার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাই স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায়: "গুরু গুরু ডাকে মেঘ জিল্‌কি ঠাডা পড়ে' ছত্রটিতে 'জিল্‌কি' শব্দের দ্বারা বর্ষার তমসাচ্ছন্ন আকাশ হঠাৎ বিদ্যুৎ-স্ফুরণে কিরূপ ক্ষণতরে আলোকিত হইয়া যায়, পূর্ব-বঙ্গবাসীর চক্ষে সেই চিরপরিচিত দৃশ্যের আভাস আনায়ন করিতেছে। 'হাতেতে সোনার ঝাড়ি বর্ষা নেমে আসে'—কি সুন্দর পদ! তাহা হইতে 'বৌ কথা কও' পাখীর বর্ণনা। মাথায় বজ্র, অনবরত শ্রাবণের জলে সিক্ত

দেহ,—সেদিকে দৃকপাত নাই—পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে পথে 'বৌ কথা কও' বলিয়া অভিমানিনী প্রিয়তমার মান ভাঙ্গাইতে চেষ্টা পাইতেছে। 'শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে। 'বউ কথা কও' বলি কাঁদে পথে পথে" ॥ ··অপরাহ্ন কাল,·· আরালিয়াতে আসিয়া তৃণশস্পময়ী বনভূমির উপান্তে পুষ্করিণীর পাড়ে কদম গাছের তলায় দাঁড়াইয়া 'ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা' মান্দারের বেড়ায় বেষ্টিত রন্তাবন ও জলের নীলাভ শোভা দেখিতে দেখিতে বাপীস্পর্শ-শীতল বায়ুর হিল্লোলে চাঁদ বিনোদ ঘাটের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তখন মলুয়ার মেঘের মত নিবিড় কৃষ্ণ-কুন্তল তাহার পায়ে লুটাইতেছিল ও তাহার কলসীতে জল ভরিবার শব্দ শুনিয়া মেঘ-গর্জন মনে করিয়া কুড়াপাখী চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সেই কুড়ার ডাক আসন্ন বর্ষার আবেশ আনয়ন করিয়াছিল।" এ চিত্র কী গভীর মর্মস্পর্শী! এই পটভূমিতে যখন দুর্জয় প্রেম-শক্তিশালিনী মহুয়াকে 'সীমাহীন আকাশের নৃত্যলীলা ময়ূরী'র মত অসীম বেগে জৈন্তা-পাহাড় হ'তে ছুটে বামুন-কান্দা গ্রামে আস্‌তে দেখি, যৌবন-সন্তরা কমলাকে যখন তৃণ-বিস্তীর্ণ ছলিয়া গ্রামের পথে পথে ভ্রমণ করতে দেখি, উলুয়াকান্দা-বেদের দীঘি-ঠাকুরবাড়ীর উপর দিয়ে যখন ধীর পদসঞ্চারে সরল অনাড়ম্বর দুরন্ত প্রেমের এক সদর্প মিছিল অস্পষ্ট রেখার মত চলে যায় তখন আমাদের সমগ্র সত্তা মাটির পরিচিত স্পর্শে দুরন্ত আবেগে আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। দীঘলহাটি গ্রামের প্রান্তর সন্নিহিত কেয়াবনে রোরুদ্যমানা সোনাইয়ের শোচনীয় পরিণাম, বাঘরার হাওরে তার মর্মান্তিক মৃত্যু—আমাদের সমগ্র মন প্রাণকে ক্রন্দনাকুল করে তোলে। তারপর দস্যু কেনারামের সেই নল খাগড়ার বন আমাদের মন গহনে কী অপূর্ব বেদনার স্মৃতিই না বহন করে আনে। সর্বোপরি সেই বারদুয়ারী ঘর, শানবাঁধান পুকুর ঘাট, বিশাল আম্র-বীথি, সীমাহীন শস্য-শ্যামল-প্রান্তর সকলের সম্মিলনে অতিপরিচিত পল্লীর একটি চিত্র অঙ্কিত হওয়ায় আমাদের সমগ্র মন-প্রাণ মাটির রসে সিক্ত হ'য়ে ওঠে! মৈমনসিংহ গীতিকা তো তাই মৃত্তিকার সন্তান!

॥ সাত ॥

॥ মৈমনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্র ॥

মৈমনসিংহ গীতিকার শ্রেষ্ঠ সম্পদ এর নারীচরিত্র। এই নারীচরিত্র গুলিই গ্রন্থখানিকে এক অখণ্ড স্বর্গীয় মহিমা দান করেছে। সমাজ যে প্রেমকে রক্ষা

করে না বরং যে প্রেম তার সমুদয় মহিমা ও শক্তির প্রজ্জ্বলতায় সমাজকে রক্ষা করে—এই গীতিকার প্রত্যেকটি নারী চরিত্র সেই চিরপবিত্র উজ্জ্বলতম নিষ্কলুষ মধুময় প্রেমের সার্থকতম প্রতিনিধি। প্রেমের অনির্বান দীপালোকে প্রতিটি চরিত্র হীরকোজ্জ্বল। "কোথাও কৃত্রিমতা, বাঁধাবাঁধি, মুখস্থ করা শাস্ত্রের গৎ, ইহার কিছুই নাই। পরিণয় আছে কিন্তু পুরোহিতের মন্ত্রপূত দম্পতীর চেলীর বাঁধের মত তাহা বাহ্যাড়ম্বর নহে। এই গীতি সাহিত্যের উদার-মুক্ত-ক্ষেত্রে প্রেমের অনাবিল স্রোত শতধারা ছুটিয়াছে, তাহা প্রস্রবণের মত অবাধ, নির্ঝরের মত নির্মল, শ্যামল ক্ষেত্রের উপর মুক্তাবর্ষী বর্ষার অফুরন্ত মহাদানের ন্যায় অজস্র। এই ভালবাসার পুরস্কার—দুঃসহ অত্যাচার, উৎকট বিপদ, মৃত্যু ও বিষ-পান। এই পুরস্কার পাইয়া বন্ধুর দুরারোহ দুর্গম পথে অনুরাগের খর প্রবাহ চলিয়াছে; স্বীয় গতির আনন্দে ঝংকৃত হইয়া সমস্ত বাধা উপেক্ষাপূর্বক, এই আত্মতৃপ্ত, সংসার-বিমুখ, উর্দ্ধমুখী মন্দাকিনী স্বীয় মানস কল্পলোকের সন্ধানে ছুটিয়াছে।" প্রতিটি চরিত্রই এই 'উর্দ্ধমুখী মন্দাকিনী'র গর্জনোন্মুখ কল-গানে মুখর। প্রেমের অনাবিল ধারায় তারা প্রবাহমান। বিপদ উৎপীড়নে, ঝঞ্ঝা-ঘূর্ণাবর্তায় চরিত্রগুলি অটল-বলে স্থির। সকল বাধা-বিঘ্ন প্রেম-মন্দাকিনীর দুর্জয় স্রোতে দিগন্তহারা হ'য়েছে।

এই মন্দাকিনীর উন্মাদ স্রোতেই মহুয়া জীবনের সকল বাধা ও বিপত্তিকে অতল সলিলে নিমজ্জিত করেছে। শ্রাবণের অবিরল বারিবর্ষণের মত শত ধারায় দুঃখ-বেদনা মহুয়ার জীবন-বেলায় ঘনায়মান অন্ধকারের মত জমেছে, কিন্তু 'এই প্রেমের মুক্তাহার কণ্ঠে পরে মহুয়া চির বিজয়ী, মৃত্যুকে বরণ করে মৃত্যুঞ্জয়ী। মলুয়ার পূর্বরাগ, বাসর ঘরে স্বামীর সহিত আলাপ, কাজীর ধৃষ্ট প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর—এই সমস্ত কি অপূর্ব! এই অতুলনীয় চিত্র জীর্ণ গৃহে, অনশনে স্বামী-বিরহে, দেওয়ানের হাবলিতে, সর্পদষ্ট স্বামীর পার্শ্বে এবং শেষ দৃশ্যে ডুবন্ত মন-পবনের নৌকায় বিচিত্রভাবে সর্বত্র অনুরাগের অরুণরাগে উজ্জ্বল। সর্বশেষে শাপগ্রস্তা লক্ষ্মীর ন্যায়, বিজয়ী প্রেমের কিরীট অতল জলে ডুবে যাচ্ছে। রাগে উজ্জ্বল, বিরাগে উজ্জ্বল, সহিষ্ণুতায় উজ্জ্বল এই মহীয়সী প্রেমের সম্রাজ্ঞীর তুলনা কোথায়?' চন্দ্রাবতীর জীবনে দেখি এই প্রেমের অপূর্ব ব্যঞ্জনা। শৈশব হ'তে যে প্রেম তিল তিল করে কঙ্ক ও লীলার জীবন-সমুদ্রে সীমাহীন তরঙ্গমালার মত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল—ভাঁটার টানে সেই

প্রেম-সমুদ্র যেদিন বিশুষ্ক হল সেদিনের তপস্যাচর্যা লীলার ধ্যান-সমাহিত মূর্তিকে ভুলবে কে। সেই "চাইর কোনা পুষ্কুনির পারে চম্পা নাগেশ্বর" পুষ্পচয়ন করা হ'তে বিবাহের পূর্বদিন পর্যন্ত এ যে একটানা দুরূহ ব্রতের নির্মম অনুশাসন, ভগবানকে পাওয়ার জন্যে ভক্তের বিরামহীন ব্যাকুলতার মতই তা' গূঢ় অর্থবাহী। এই তীব্র প্রতীক্ষার পরিণতি হ'ল হৃদয়ভেদী এক সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে। কারকুন এবং দেওয়ান ভাবনার লালসা-বহ্নিতে ইন্ধন না যুগিয়ে কমলা এবং সুনাই উভয়েই ঘরছাড়া হ'য়েছে—নারী-ধর্মের বিপুল উদ্দাম তাদের এই দুর্গম পথে যাত্রা করার মূলে বেগ সঞ্চার করেছে। বহু উৎপীড়ন-গিরি-খাত অতিক্রমের পর অবশেষে কমলার সাথে রাজপুত্রের বিবাহ হয়েছে কিন্তু প্রিয়তম মাধবকে উদ্ধারের পর সাধ্বী সুনাই বিষপানে আত্মহত্যা করলে সমগ্র কাহিনীটির উপর ট্রাজেডির যে করুণ সুর বেজে ওঠে তার রেশ হৃদয়ের গহনতম স্থান পর্যন্ত পৌঁছে আমাদের সমগ্র চিত্তকে বিষাদ মলিন করে তোলে। মদিনা চরিত্রের মাধ্যমে প্রেমের অপরিসীম মাধুর্য যেন নবীন রূপে বিকাশমান। তালাকের পরও যখন মদিনাকে আমরা দুলালের জন্যে প্রতীক্ষা করতে দেখি তখন আমরা বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে পড়ি। মানবীয় প্রেমের সর্বোচ্চ পরিণতি বুঝি এখানেই। কেবলমাত্র অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সম্মুখ সংগ্রাম কিংবা আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে যে নারীর শক্তি প্রকাশ পায়, তা' নয়—নীরব সহিষ্ণুতার ভিতর দিয়াও যে তার এক অপূর্ব মহিমা প্রকাশিত হয় মদিনা আপন জীবন বাঞ্ছিতের পদতলে উৎসর্গ করে তাই প্রমাণ করেছে। এখানে মদিনা অনন্য সাধারণ, এখানে মদিনা দোসর-হীন।

মৈমনসিংহ-গীতিকার নারীচরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে প্রেমের এই বিচিত্র গতি অভিনবরূপে রেখাঙ্কিত হ'য়েছে। এক একটি গীতিকার অভ্যন্তর দিয়ে এক এক ভাবে এই প্রেম-রেখাঙ্কন উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠেছে। প্রতিটি আখ্যান ভিন্ন, প্রতিটি কাহিনী পৃথক কিন্তু তবুও সকল আখ্যান সকল কাহিনীর ভিতর দিয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় প্রেমের দুর্বার প্রবাহ বহমান। এই সূত্রে সকল কাহিনীই আপন আপন বিভেদকারী প্রাচীর ভেঙে মহত্তর গণ্ডীতে শ্রীক্ষেত্রের মহা সম্মিলনে এক হ'য়ে মিশেছে। সেখানে তারা পৃথক নয়, সেখানে তাঁরা বিচ্ছিন্ন নয়—সেখানে তারা একদেহ ধারণ করে একই রূপ লাবণ্যে ঝলকিত হয়ে উঠেছে। সবার মূলেই প্রেম, সবার মূলেই প্রেম-গীতার

অভিনব মন্ত্রোচ্চারণ। তাই দেখি এই পল্লী-গাথার রমণীরা অনেকবার কুলধর্ম-বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু কখনই নারী-ধর্ম পরিত্যাগ করেনি।

এই গীতিকার নারীচরিত্রগুলির পাশে পুরুষ চরিত্রগুলি যেন একান্ত নিষ্প্রভ। নারীচরিত্রগুলি রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল পাদ-প্রদীপের সম্মুখে জীবন-নাট্য অভিনয়ে কর্মবহুল পুরুষ চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছে আর পুরুষ চরিত্রগুলি চলে গেছে অন্তঃপুরিকার নিভৃততম কক্ষে। অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথ-নীলিমার দিগন্ত ব্যেপে নারী চরিত্রগুলি পূর্ণচন্দ্রের মত কিরণ দান করেছে—তাদের অত্যুজ্জ্বল কিরণমালার পাশে নক্ষত্রবৎ ক্ষীণালোকিত পুরুষ চরিত্রগুলি যেন ম্লান পাণ্ডুর হয়ে গেছে। তাইতো দেখি মাধবকে উদ্ধারের জন্যে সুনাই এগিয়ে গেছে, রাজপুত্রকে পাওয়ার জন্যে সমুদয় বিপদ-রাশি মাথায় করে নিয়েছে কমলা, নদের চাঁদকে পাওয়ার জন্যে তাই তো মহুয়ার আমরণ সাধনা, বিনোদের প্রেম-বিহ্বল বক্ষে মিলিত হওয়ার জন্যে তাইতো প্রেমোন্মাদিনী মলুয়া চালিয়েছে বিজয়-অভিযান। জীবন-যুদ্ধের বিভীষণ রণভূমে স্ত্রী চরিত্র-গুলিই সেনাপতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছে—পুরুষগুলি হীন পদাতিক মাত্র। সকল বাধা-বিঘ্ন, সকল অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পরাভূত ধ্বংস স্তূপের উপর প্রেম-নির্ভিক বীর-রমণীগণ উড্ডীন করেছে প্রেমের বিজয়-পতাকা। অবশেষে স্মরণ করি এই গীতিকা-সংকলকের অপূর্ব বাণী: "এই গীতিকাগুলির নারী-চরিত্র সমূহ প্রেমের দুর্জয় শক্তি, আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা ও অত্যাচারীর পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে। নারী-প্রকৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড় হন নাই, চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে। জননীরূপে তিনি জগতের বরেণ্যা, স্ত্রীরূপে তিনি জগতের প্রাণ।...নারী ধর্মের যে জীবন্ত মূর্তিগুলি এই সকল গাথায় পাওয়া যাইতেছে—তাহারা পাতিব্রত্যে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, বিপদে, ধৈর্য্যে, উপায়-উদ্ভাবনায় এবং একনিষ্ঠায় অতুল্য।"

॥ আট ॥

॥ একটি সার্থক গীতিকার পরিচয় ॥

বাংলায় বহুল প্রচলিত 'বাঁশ বনে ডোম কানা' প্রবাদটির অর্থ নতুন করে উপলব্ধি করলাম স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক সংকলিত "মৈমনসিংহ-গীতিকা" পাঠ করে। এই বিশালায়তন গ্রন্থটির মধ্যে মোট দশটি গীতিকা

সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে কোন গীতিকাটি যে সর্বোৎকৃষ্ট তা' নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা অসম্ভব। এক একটি গীতিকার অন্তর্মূল হ'তে এক একটি স্বতন্ত্র সুর-ধ্বনি ঝংকৃত হয়েছে। আখ্যানভাগে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, আমাদের চিত্ত-ভূমিতে তাদের আবেদনও তাই পৃথক। কোন গীতিকার পরিসমাপ্তিতে অনুভব করি মহান মিলনের অপূর্ব মাধুরী আবার কোন গীতিকার সমাপ্তি-সীমা হ'তে বেজে উঠেছে গভীর বিষাদের সকরুণ রেশ। কোন গীতিকার সঞ্চারণ-ভূমিতে দেখেছি সর্বস্ব-ত্যাগী সীতার স্বর্গীয় মূর্তি আবার কোন গীতিকার মর্মমূল হ তে উৎসারিত হ'য়েছে সীতা-সাবিত্রীর অটল বৈভব! প্রত্যেকটি গীতিকা যেন ঘটনার স্বর্ণ-ইষ্টকে ভাবের তাজমহল হ'য়ে উঠেছে।

তবুও উত্তমের মধ্য হ'তে আমাদের সর্বোত্তমটি নির্ণয় করতে হ'বে।

প্রথমেই একটি কথা স্পষ্ট করে স্বীকার করে নেওয়া ভাল। আস্বাদনের দিক হ'তে প্রত্যেকটি গীতিকা অভিনব হ'লেও গীতিকার যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য-গুলির সাথে আমরা পরিচিত "মৈমনসিংহ-গীতিকার" প্রত্যেকটি আখ্যানে তা' যথাযথরূপে রক্ষিত হয়নি। তুলনামূলক আলোচনায় "মহুয়া" গীতিকাটি আমাদের নিকট অনেকখানি ত্রুটি-শূন্য বলে মনে হয়।

কাহিনী: গীতিকার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো আখ্যান ভাগ হ'বে একটি মাত্র কাহিনীর ঘনসন্নিবিষ্ট রূপায়ণ। কোন উপকাহিনীর অবাঞ্ছিত প্রবেশাধিকার তা'তে থাক্‌বে না। মূল কাহিনী দ্রুত-সঞ্চারিত হ'য়ে পরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে। "দস্যু কেনারামের পালা"-য় মূল কাহিনীকে পিছনে ফেলে সরব হ'য়ে উঠেছে মনসামঙ্গলের পাঁচমিশেলী কাহিনী। "দেওয়ানা মদিনা"-র প্রথমাংশের সাথে শেষাংশের বিশেষ কোন যোগ নেই, "কাজলরেখা"য় 'শুকপাখী' একটি বড় রকমের ভূমিকা গ্রহণ করে নায়িকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে দুর্বল করে দিয়েছে এমন কী "মলুয়া" এবং "কমলা"-র মত গীতিকা দু'টি বর্ণনাত্মক হওয়ায় অযথা ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়েছে। "মহুয়া" গীতিকাটির-কাহিনী অংশের মধ্যে এই দুর্বলতা নেই। উপকাহিনীর উৎপীড়ন হ'তে মুক্ত হ'য়ে এবং বর্ণনার ফেনিল অংশ হ'তে সরে এসে বিদ্যুৎ-গতিতে উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে চরম পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে গেছে। এই হুমরা কর্তৃক মহুয়াকে চুরী, এই মহুয়ার খেলা দেখান, এই নদ্যার ঠাকুরের সাথে তার সাক্ষাৎ এবং প্রেম নিবেদন, তারপর স্থানান্তরে গমন ইত্যাদি

সকল ঘটনা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। সময় সময় মনে হয় পল্লীকবি এই কাহিনী বর্ণনায় একটি পৃষ্ঠা তো দূরের কথা একটি পংক্তি, এমনকি একটি শব্দও অপব্যয় করেননি। প্রতিটি শব্দ যেন ওজন করা, প্রতিটি বর্ণ যেন লক্ষ্যভেদী। পল্লীকবি মহুয়ার চুরীর দৃশ্যটি এইভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন :

ছয় মাসের শিশুকন্যা পরমা সুন্দরী।
রাত্রি নিশাকালে হুমরা তারে করল চুরি॥
চুরি না কর‍্যা হুমরা ছাড়্যা গেল দেশ।
কইবাম্ সে কন্যার কথা শুন সবিশেষ॥

কেমন করে চুরি, কোথা হ'তে চুরি, কন্যার পিতামাতার বিলাপ করল কিনা, হুম্‌রা দেশ পরিত্যাগ করলই বা কেমন করে—সকল কিছুই অবলীলাক্রমে ত্যাগ করে পল্লীকবি তাঁর পাঠক-পাঠিকাকে নিয়ে এসেছেন কাঞ্চনপুর হ'তে বামনকান্দায়—নতুনতর পটভূমিতে। এই চারটি পংক্তির মধ্যে যা সমাপ্ত হ'য়েছে—সেই চুরির ব্যাপার নিয়ে বাংলাদেশে বিশালায়তন ডিটেকটিভ উপন্যাসের অভাব নেই। এখানে পল্লীকবি কাহিনীকে বিস্ফারিত করার যে দুর্দমনীয় লোভ সংবরণ করেছেন বাংলা সাহিত্যে তা' বিরল-দৃষ্ট।

নাটকীয় বিন্যাস : কাহিনীর মূল বৈশিষ্ট তিনটি—পরিবেশ, চরিত্র এবং ক্রিয়া। গীতিকা যদিও এই তিনটি উপাদানের সংমিশ্রনে গঠিত তথাপি ক্রিয়ার (action) প্রভাব ব্যাপক এবং গভীর। এমন কি ক্রিয়ার সর্বগ্রাসী উত্থান-পতনের মধ্যে অপর দুইটি উপাদান গৌণ হ'য়ে পড়ে। বলাবাহুল্য "মহুয়া"য় আমরা ক্রিয়ার অভিনব আন্দোলন দেখেছি। "মলুয়া", "কমল", "কাজলরেখা," "দেওয়ানা মদিনা" ইত্যাদি উপাখ্যানে ক্রিয়ার প্রভাব এমন তীব্র ও তীক্ষ্ন হ'য়ে ওঠেনি। নদ্যার ঠাকুরকে নিয়ে 'বাদ্যার' দল ছেড়ে পলায়নের পর হ'তেই এই ক্রিয়ার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই সমগ্র কাহিনীটি অন্তিম মুহূর্তের দিকে এগিয়ে গেছে। নদী পথে সওদাগরের করালগ্রাস হ'তে নিজেকে মুক্ত করে মহুয়া ছুটেছে নদ্যার ঠাকুরের সন্ধানে গহীন অরণ্যে। বিপদ-সংকুল অরণ্যাভ্যন্তরে মন্দিরের মাঝে সে পেল বাঞ্ছিতের সন্ধান, কিন্তু সেখানেও আর এক নতুন বিপদ—সন্ন্যাসী মহুয়ার নিটোল যৌবনে প্রলুব্ধ, গভীর রাত্রে সে আসে প্রেম নিবেদন করতে। ক্রিয়ার এ এক বিদ্যুৎশিহরণ!

অবশেষে কঙ্কালসার নদ্যার ঠাকুরকে নিয়ে অচীন অরণ্য-পথে গভীর বিপদের মাঝে ঝাপিয়ে পড়ে মহুয়া। শুরু হয় আরণ্যক জীবন। আজীবন বেদনাতুর জীবনে হয়তো একটু বসন্তের হাওয়া এসেছিল কিন্তু ঠিক সেই সুখের সময় আর এক চরম নাটকীয় পরিস্থিতির অভ্যুদয়। সহসা অরণ্য পথে আসে হুমরা 'বাগ্যা'—সাক্ষাৎ যমদূত। অবশেষে যুগল-জীবনে নামে নিয়তির নির্মম পরিহাস। 'বিষলক্ষে'র ছুরিতে আত্মহত্যা করে মহুয়া আর নদ্যার ঠাকুরের রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ে শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যভূমির নির্জন বনপথে। সমগ্র কাহিনীটি যেন অনিশ্চিত ঘটনার অতর্কিত উত্থানপতনের ভিতর দিয়ে আবেগে কম্পমান হ'য়ে উঠেছে। পরিশেষে মহুয়ার জীবনে যে বিপদ-ঘন গভীর ট্রাজেডী নেমে এসেছে তা' সমগ্র পাঠক-চিত্তকে ক্রন্দনাকুল করে তোলে। ঘটনা-বিন্যাসে গীতিকাটি দৃঢ়-পিনদ্ধ এবং নিঃবদ্ধ। সর্বোপরি কাহিনীর দুর্লভ নাটকীয়তা সকল আখ্যানগুলির মধ্যে "মহুয়া"কে এক বিরল-বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

সংলাপ : গীতিকার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সংলাপ। সংলাপের ভিতর দিয়ে সমগ্র কাহিনীটি দ্রুত-সঞ্চারমান হ'য়ে ওঠে। বলাবাহুল্য এদিক দিয়েও "মহুয়া"র বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। মহুয়া যখন বাঁশে উঠে খেলা দেখাতে ব্যস্ত তখনই নদ্যার ঠাকুরের হৃদয়ে সুপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষার নব জাগরণ ঘটে। পল্লী কবি মাত্র কয়েকট বর্ণসুষম (balanced) রেখাঙ্কনে আমাদের সম্মুখে সেই জাগ্রত প্রেমের ছবিটি সুন্দর রূপে তুলে ধরেছেন :

> যখন নাকি বাদ্যার ছেড়ি বাশে মাইল লাড়া।
> বইসা আছিল্ নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা অইল খাড়া॥
> দড়ি বাইয়া উঠ্যা যখন বাশে বাজি করে।
> নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা কয় পাইড়া বুঝে মরে॥

তারপর আসন্ন সন্ধ্যায় নির্জন জলের ঘাটে চলে ভীরু প্রেমিকের শঙ্কিত প্রেম-নিবেদন :

> জল ভরা সুন্দরী কন্যা জলে দিছ ঢেউ।
> হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ॥

তারপর প্রেমভরা সলজ্জ দৃষ্টি বিনিময়। মহুয়ার মাতা-পিতার পরিচয় জান্তে চায় নদ্যার ঠাকুর। কিন্তু 'মহুয়ার জীবন আদ্যোপান্ত একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সুরে গাথা' :

নাহি আমার মাতা পিতা গর্ভ সোদর ভাই।
সোতের হেওলা অইয়া ভাসিয়া বেড়াই॥

এরপর পরিচয় নিবিড়তর হ'তে থাকে। নতার টাকুরের বিয়ে হয়নি জেনে মহুয়া কটাক্ষ করে—তার উত্তরে ভীরু প্রেমিকের হৃদয়ার্তি অভিনব হয়ে ওঠে :

কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে আমি করি বিয়া॥

এবার নারীত্বের সহজাত লজ্জাপ্রবণতায় আরক্ত হ'য়ে ওঠে মহুয়া—বলে :

লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর।
গলায় কলসী বান্ধ্যা জলে ডুব্যা মর॥

নদের ঠাকুরের প্রেম-নিবেদন এবার সর্বোচ্চ-সীমা (climax) স্পর্শ করে :

কোথায় পাইবাম কল্সী, কন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ি।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি॥

এই সংলাপ যেমন সজীব তেমনি প্রাণবন্ত। কি অমোঘ এর আকর্ষণ!

ছন্দ : ছন্দের দিক দিয়েও "মহুয়া" উপাখ্যানটি ত্রুটি শূন্য। শ্বাসাঘাত্ প্রধান পয়ার ছন্দই গীতিকার একমাত্র বাহন। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন উপাখ্যানে পয়ার ছাড়াও ত্রিপদা ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। "কাজলরেখা" উপাখানটি তো রীতিমত গল্পাশ্রয়ী গদ্যেয় লিখিত। কিন্তু "মহুয়া" এই সকল ত্রুটি হ'তে মুক্ত। আখ্যানটি আগাগোড়া শ্বাসাঘাত প্রধান পয়ার ছন্দের রূপায়নায় মনোরম হ'য়ে উঠেছে।

পরিণতি : পরিণতির দিক হ'তে কয়েকটি আদর্শ গীতিকা গীতিকা-ধর্ম হ'তে বিচ্যুত হয়েছে। কাজলরেখা উপাখ্যানটি তো সম্পূর্ণ রূপকথাশ্রয়ী, মলুয়া গীতিকাটিতেও শেষ পর্যন্ত রূপকথার আমেজ এসেছে। 'মনপবনের নায়ে' চড়ে মলুয়ার যে আত্মহত্যার সংবাদ পরিবেশিত হ'য়েছে তা' একমাত্র রূপকথার রাজ্যেই সম্ভব। কিন্তু "মহুয়া" উপাখ্যানের পরিণতিতে এমন কোন অবাস্তব কল্পনা স্থান পায়নি। একান্ত বাস্তবানুগ পরিণতির ভিতর দিয়ে যে মর্মভেদী হাহাকার উঠেছে তা' আমাদের চিত্তকে অশ্রু-সিক্ত করে তোলে।

কি আঙ্গিক, কি ঘটনা-বিন্যাস, কি চরিত্র-চিত্রন, কি পরিণতি সকল দিক দিয়েই "মহুয়া" অনবদ্য। এই উপাখ্যানটির এক প্রান্তে যেমন আছে নাটকীয় গতিসম্পন্ন দ্রুত সঞ্চারমান কাহিনী তেমনি অন্য কোটিতে কাছে পল্লী প্রাণের উছল সঞ্জীবতা। ভাব ও ভাষায়, শব্দ ও ছন্দে "মহুয়া" সত্যই মনোরম এবং মহান হয়ে উঠেছে।

বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলিম কবি ও কাব্য

॥ এক ॥

॥ মুস্‌লিম পদকর্তাদের পদে চৈতন্য-প্রভাব ॥

বৈষ্ণব নয়—বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন। কথাটা লক্ষ্য করার মত। এই বিশিষ্ট কথাটির প্রথম প্রয়োগকর্তা শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। গাবেষণা কার্যে রত হ'য়ে তিনি ১০২ জন মুস্‌লিম পদকর্তার পদ আবিষ্কার করেছেন এবং পদগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় সেই গবেষণা-গ্রন্থিকার নামকরণ করেছেন "বাংলার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি।" আধুনিক কোন কোন সমালোচক এই গবেষণা-গ্রন্থিকায় সংকলিত পদগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে এই মুস্‌লিম পদকর্তাদের খাঁটি বৈষ্ণব বলার পক্ষপাতী। এ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। অন্ততঃ এই ধারণার পরিপোষকতার কোন সঠিক প্রমাণ আজ পর্যন্ত পা'ওয়া যায়নি। আসলে এই আপাতঃ বিরুদ্ধ কাজ সম্ভব হ'য়েছে প্রবল যুগ-ধর্মের প্রভাবে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই যুগধর্মের প্রবর্তক। উদার মানবতার পটভূমিতে মহাপ্রভুর সমগ্র জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে ভক্তি ও প্রেমের যে বিপুল প্লাবন এনেছিলেন তা' কেবল 'হিন্দুর গৃহপাশেই প্রবাহিত হয়নি—মুসলমানদের আঙ্গিনার পাশ দিয়েও প্রবাহিত হ'য়েছিল'। মহাপ্রভুর ব্যাপক প্রভাবের কথা বল্‌তে গিয়ে নিষ্ঠাবান সমালোচক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয় ঘোষণা করেছেন: "প্রাণ জাগিলেই গান জাগে। মধ্যযুগে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপ্ত করিয়া যেন একটা সংগীতের আসর বসিয়াছিল। ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর করিয়া বাংলাদেশের সুরোন্মত্ত মানুষগুলি বিশ্বজীবনের মহাপ্রাঙ্গণ-তলে সেই সুর-সভায় আসিয়া মিলিত হইল। উপরে অনন্ত নীলাকাশ—নীলকৃষ্ণ; তাহার উপরে রাধা চন্দ্রাবলী—ভুল হইল, চৈতন্যচন্দ্রোদয় হইয়াছে। বাঙালীর ভাবের উচ্ছ্বাস, রসের উল্লাস, আনন্দের উৎসার বাধা মানে নাই। প্রাণ যে জাগিয়াছে—মহাপ্রাণ, মহাগান তো জাগিবেই।" এই মহাসংগীতের সুর-সভাতলে বধির হ'য়ে বসে থাক্‌বে কে? বসে যে ছিল—সে বধির-ই, সুস্থ সবল মানুষ নয়। মুস্‌লিম কবি এবং

শ্রোতাদেরও এই সুর-সভাতল হ'তে দূরে থাকা সম্ভব হয়নি, চৈতন্যদেবের প্রবল ব্যক্তিত্বে এবং যুগধর্মের অনতিক্রম্য প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই সভাতলে এসে যোগদান করেছিলেন। কেবল যোগদান নয়—অন্তরের প্রেরণাবেগে পদ রচনা করেছেন, কীর্তন গেয়েছেন। তাইতো নিষ্ঠাবান বহু বৈষ্ণবের কণ্ঠে মুসলিম পদকর্তাদের পদ সংকীর্তিত হ'য়েছে, বৈষ্ণবপদ সংকলয়িতাদের পক্ষে তাই এই পদকর্তাদের পদ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

পদকর্তাগণ যে বৈষ্ণব ছিলেন না সে সম্পর্কে আরো বড় প্রমাণ এই যে দু'একটি পদ রচনা ছাড়া অধিকাংশ কবি আজীবন মুস্‌লিম-সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করেছেন, সে বিষয়ে বিশালায়তন কাব্য লিখেছেন। সুস্থ মন নিয়ে বিবেচনা করলে এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'বে বিপুলায়তন কাব্যের মধ্যে কবির মানস-ভংগীর যে প্রতিফলন ঘটেছে সেটা সত্য না সামান্য দু'একটি পদে—তা' সে যত তন্ময়তাপূর্ণই হোক না কেন—কবি-মানসিকতার যে ছায়াপাত ঘটেছে সেটা তীব্র।

মুসলিম পদকর্তাগণ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন একথা যাঁরা প্রচার করেন তাঁদের মতও যেমন ভ্রান্ত তেমনি যাঁরা বলেন বৈষ্ণব ধর্মের কোন কিছুতে আকৃষ্ট না হ'য়ে মুসলিম পদকর্তাদের পদগুলি 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' আপনাতে আপনি বিকশিত হ'য়ে উঠেছে তাঁদের মন্তব্যও অনুরূপে একদেশদর্শিতার পরিচায়ক। বৈষ্ণবীতার কোন কিছুতে আকৃষ্ট না হ'য়ে এই স্বতোৎসারিত পদগুলি রচনা করা যে কারো পক্ষে সম্ভব তা' বিশ্বাস করতে মন ঠিক সায় দেয় না। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ না করলেও বৈষ্ণবীয়তায় যে তাঁরা আকৃষ্ট হ'য়ে ছিলেন এ কথা ধ্রুব সত্য। আসলে এই পদকর্তারা বৈষ্ণব নন আবার অবৈষ্ণবও নন—বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন। সে যুগের আকাশে বাতাশে যে উদার প্রেমের মন্ত্র-গুঞ্জরণ ধ্বনিত হ'য়েছিল—সেই গুঞ্জরণে এসকল কবিও আপনাপন কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছিলেন। যুগধর্মের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে এ সব পদকর্তাদের পদে।

বারে বারে আমরা যে যুগধর্মের কথা বলেছি—এখন সেই যুগধর্ম, অর্থাৎ চৈতন্য-সংস্কৃতি এবং চৈতন্য-প্রভাব এই পদকর্তাদের উপর কতটা পড়েছে সেটা দেখে নিতে চেষ্টা করব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার ১৩শ পরিচ্ছেদে পাই :-

কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্তন।
রাত্রিদিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ ॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥

এই নগরে নগরে ভ্রমণ করে কীর্তন করার মাধ্যমেই মহাপ্রভুর জীবনাচরিত প্রেমধর্মের অভিব্যক্তি সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে। এই কীর্তনের মাধ্যমেই তিনি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছেন বেশী। শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাই সত্যই বলেছেন, "চৈতন্য-জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার নিকট তর্কে পরাজিত হইয়া অথবা তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ, যাহারা পাণ্ডিত্যের ধার ধারে না, যাহারা পণ্ডিত চৈতন্যকে বুঝিবার মত পাণ্ডিত্যের অধিকারী নহে, তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল তাঁহার কীর্তনে ও নর্তনে। যাহারা কীর্তনরত শ্রীচৈতন্যের প্রস্ফুট কদম্বপুষ্পতুল্য প্রেম-রোমাঞ্চিত কলেবর ও শিশির সজল পদ্ম-কোরক-সদৃশ প্রেমাশ্রুপূর্ণ অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়ন একবার দেখিয়াছে, তাহারাই ভুলিয়াছে।" এই কীর্তনগান এবং অর্ধনিমীলিত নয়নে আকৃষ্ট হ'য়েছে সরল পল্লীবাসী, পথের কর্ম-ক্লান্ত পথিক, একেশ্বরবাদী মুস্‌লিমও। কেননা এ চৈতন্যদেব তো বৈষ্ণবধর্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা নন, এ চৈতন্যদেব প্রভু—মহাপ্রভু—সকলের মহাপ্রভু। সকল জাতি-ধর্ম, বিভেদ-গ্লানির উর্ধে এঁর স্থান—উদার প্রেমের মূর্ত-বিগ্রহ। বুদ্ধিমান্ত খান কেবল আকৃষ্ট নয়—চৈতন্যের সেবক-প্রধান হ'য়ে পড়েছিলেন :

শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমান্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিহোঁ সেবকপ্রধান ॥

॥ চৈতন্যচরিতামৃত : আদিলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ ॥

বুদ্ধিমন্ত খানের অনুরূপ চৈতন্য-নিষ্ঠার পরিচয় পাই চৈতন্যভাগবতের অন্তলীলার ৯ম পরিচ্ছেদে :

চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়।
আজন্মচৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয় ॥

এছাড়াও চৈতন্যচরিতামৃত এবং চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা হ'তে জানা যায় বহু কাজী এমন কি স্বয়ং হুসেন শাহ্‌ পর্যন্তও চৈতন্যের কীর্তন-শ্রবনে মুগ্ধ

হ'য়েছিলেন। অনুরূপে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন মুস্‌লিম পদকর্তাগণ। তাঁদের গৌরচন্দ্রিকার পদগুলিতে চৈতন্যদেবের এই আবেশ-বিহ্বল মূর্তির সুনিবিড় পরিচয় রয়েছে। বৈষ্ণব মহাজনগণের গৌরচন্দ্রিকার পদসমূহে যে ঐকান্তিকতা ফুটেছে, এঁদের রচিত পদসমূহে তার সমকক্ষ ঐকান্তিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সময় সময় এমনও মনে হয়—গৌরচন্দ্রিকার পদরচনায় এসব কবিদের মানস-চক্ষে গৌরাঙ্গদেবের গৌরমূর্তি স্পষ্টরূপে ঝল্লকিত হ'য়ে উঠেছিল। গৌর-নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার পরিচয় নিবিড় হ'য়ে ধরা পড়েছে সাহা আকবরের একটি পদে :

জীউ জীউ মেরে মন চোর গোরা।
আপহিঁ নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোয়ালিয়া॥

এখানে কবি তাঁর মুগ্ধ মনের সমুদয় ঐকান্তিকতাটুকু যেন উজাড় করে দিয়েছেন। এই বাণী বন্ধনের ভিতর দিয়ে পাঠকের সম্মুখে 'আবেশ বিহ্বল মূর্তিতে' গৌরাঙ্গদেব যেন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেন।

লাল মামুদের একটি পদে 'সোনার মানুষ' গৌরাঙ্গদেবের রূপ-মূর্তি সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে আর ফুটেছে 'সোনার মানুষের পরশে' 'কত লোহার মানুষের' সোনা হওয়ার কথা—পাপীর পুণ্যাত্মায় পরিণত হওয়ার ইতিহাস :

সোনার মানুষ নদে এল রে!
ভক্তসঙ্গে প্রেমতরঙ্গে ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে॥...
সোনার মানুষ, সোনার বরণ, সোনার নূপুর, সোনার চরণ।
চারিদিকে সোনার কিরণ ছুটছে আলোকিত করে।
কত লোহার মানুষ সোনা হ'ল গৌর অবতার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনই তাঁর বাণী। আজীবন আচরণের মাধ্যমে তিনি তাঁর বাণীকেই বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। যে নতুন ভাব-বন্যায় 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়' সেই নতুন ভাবই তাঁর আচরণে সুপরিস্ফুট। 'এই আপনি মেতে জগৎ মাতানোর' কথা ভাবদ্রষ্টা কবি লালনের পদে অপূর্ব চিত্রগরিমায়

বিকশিত। এই একটি মাত্র পদেই যেন মহাপ্রভুর রূপ এবং সমগ্র জীবনাচরণের মর্ম-নির্যাসটুকু বিধৃত হ'য়েছে :

আয় দেখে যা নুতন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপীন ধরা।।

এপর্যন্ত কবি গৌরাঙ্গের বাহ্য-প্রকৃতিকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এরপর কবি চলে গিয়েছেন মহাপ্রভুর জীবন-কথার মূল সুরে, মানব-প্রেমের মধ্যে, আপনি মেতে জগৎ মাতানোর মাঝে :

গোরা হাসে কাঁদে ভাবের অন্ত নাই।
সদা দীন দরদী বলে ছাড়ে হাই
জিজ্ঞাসিলে কয়না কথা হ'য়েছে কি ধন হারা।।
গোরা শাল ছেড়ে কৌপিন পরেছে।
আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে।।

'জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা হ'য়েছে কি ধন হারা' পংক্তিটির মধ্য দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবেগ-বিহ্বল মূর্তির কথা মনে পড়বেই। কবি এ চিত্রাঙ্কনের মধ্যেও থামেননি—আরো এগিয়ে গিয়েছেন। গৌরাঙ্গদেব যে স্বয়ং একটা যুগের স্রষ্টা সে কথা ভাবুক কবি উপলব্ধি করেছেন :

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়।
গোরা তার মাঝে এক দিব্যযুগ দেখায়।।

এই সামান্য পংক্তির মধ্যে কেবল গৌরাঙ্গদেবের স্বরূপটি নয়, চৈতন্য-প্রভাবিত বাংলা দেশ-সাহিত্যের সমগ্র ছবিটি সুস্পষ্ট।

অনেক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের কাছে চৈতন্যদেব কেবল উপায় নন—উপেয়, উপাসক নন—উপাস্য। শ্রীচৈতন্য তাঁদের কাছে সাধারণ মানুষ নন—দেবতা। মুসলিম পদকর্তাগণের অনেকেই চৈতন্যদেবকে দেবতার আসনে বসিয়ে উপেয় রূপে কল্পনা করেছেন। আরাধ্য দেবতার আসনে বসিয়ে তাঁর পদে জীবনোৎসর্গের আকূতি জানিয়েছেন :

গৌরচান্দ আমার।
তোমার লাগি আমি ঘরের বার।।

ছৈয়দ আলির একটি পদে গৌরাঙ্গ আরাধ্য দেবতারই নামান্তর :

গৌর-আজ্ঞায় বিচারিলে পাইবার তার দরশন।
এই তনে ছাপিয়া রইছে সেই রতন ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আলোচনায় আমরা দেখেছি গৌরাঙ্গদেব রাধাকৃষ্ণের মিলিত স্বরূপ। কৃষ্ণই চৈতন্য। একে অপরের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। রাধা-লীলাস্বাদন করার জন্যে, আপনার প্রেম-মাধুর্য উপলব্ধির জন্যে দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ কলি যুগে শ্রীচৈতন্যে রূপান্তরিত। কবিরাজ গোস্বামী তাঁর বিপুলায়তন গ্রন্থে এই কথাটি নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। মুস্‌লিম পদকর্তাদের কেউ কেউ একই সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছেন। গরিব খাঁ'র একটি পদে শ্রীচৈতন্যই যে রাই-কানুর সমন্বিত রূপ সেকথা সুন্দর-রূপে ব্যক্ত হ'য়েছে :

শরমে শরম প্যোলায়ে গেল।
রাই কানু দুটি তনু
যেমন দুধে জলে ম্যালায় গেল ॥

এপর্যন্ত আলোচনা এবং উদ্ধৃত পদসমূহ হ'তে আমরা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছি মুসলিম কবিগণের পদ রচনায় অবতীর্ণ হওয়ার মূলে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব কি ব্যাপক এবং গভীর। বস্তুতঃ কেবল মুসলমান কবিগণ কেন— বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যের প্রেম-বন্যা প্রবাহিত না হ'লে হিন্দু কবিগণও রাধা-কৃষ্ণ প্রেম-বিষয়ক পদরচনায় কতটুকু এগিয়ে আস্‌তেন এবং সার্থকতা অর্জন করতেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বর্তমানে বাংলার বৈষ্ণবধর্ম বল্‌তে যা' বুঝি তা' শ্রীচৈতন্যেরই দান। শ্রীচৈতন্যের দ্বারাই বৈষ্ণবধর্মে নবযৌবন সঞ্চার ঘটেছে। জয়দেব-বড়ুচণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী শ্রীচৈতন্যের দ্বারাই নতুন মহিমায় বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, রায়শেখর এ সকল মহাজনগণ তো চৈতন্যদেবেরই সৃষ্টি। অনুরূপে মুসলিম পদকর্তাগণ চৈতন্যের জীবন হ'তে বেগ নিয়ে কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। চৈতন্যই তাঁদের কাব্য-প্রেরণার উৎস-ভূমি।

॥ দুই ॥

॥ রাধাকৃষ্ণ না শাশ্বত প্রেমিক-প্রেমিকা ॥

চৈতন্য প্রভাবের কথা স্মরণে করে আমরা বার বার বলেছি শ্রীমন্মহাপ্রভু আজীবন আচরণের মধ্য দিয়ে যে সমন্বয়কামী যুগধর্ম গড়ে তুলেছিলেন সেই

যুগধর্মের প্রবল আকর্ষণে মুস্‌লিম পদকর্তাগণ (হিন্দুপদকর্তাগণও) রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক পদ রচনায় প্ররোচিত এবং প্রলুব্ধ হন। এখন আমাদের বিচার করে দেখ্‌তে হবে রাধাকৃষ্ণ এই পদকর্তাদের পদে কি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁরা কি জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রতীক? কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের দেবদেবী? এ কৃষ্ণ কি গীতার কৃষ্ণ? এ রাধা কি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির বহিঃপ্রকাশ? অথবা এ রাধা-কৃষ্ণের অন্তরালে প্রকাশিত হ'য়েছে শাশ্বত প্রেমিক-প্রেমিকার রূপ-মূর্তি?

আমাদের এ জিজ্ঞাসাগুলির উত্তর আংশিক ভাবে "বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি" গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের মন্তব্য হ'তেই পেয়ে যাব। তিনি লিখেছেন, "এই শ্রেণীর মুসলমানরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীকে প্রায়শঃ স্বীকার করেন নাই। স্বীকার করিয়াছেন—প্রেমিক-প্রেমিকার মূর্ত-প্রতীক রাধাকৃষ্ণকে। ইহারা কৃষ্ণ বলিতে গীতার কৃষ্ণকে জানেন না, জানেন রাধাবন্ধু কৃষ্ণকে। এই রাধাকৃষ্ণ আবার অধিকাংশ মুসলমান কবিদের নিকট অপৌরুষেয়। ইহারা বৃষভানু-নন্দিনী বা যশোদা-নন্দন নহেন। 'কানু ছাড়া গীত নাই', 'কানু ছাড়া উপমা নাই',—প্রভৃতি প্রবাদের দ্বারা যে প্রেমিক কানুর কথা বলা হইয়াছে প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া সেই কানুর নাম মুসলমান কবিরাও গ্রহণ করিয়াছেন।" এই সুদীর্ঘ উক্তিটির ভাব-সত্য হ'তে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে এ কৃষ্ণ আর যাই হোক কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের দেব নন। কিন্তু মাঝে মাঝে এই উক্তির অযাথার্থ্যও প্রমাণিত হ'বে। কোন কোন পদে আমরা দেখব কবিকুলের অন্তরের ঐকান্তিক আকূতিতে এ রাধাকৃষ্ণ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের দেব-দেবী হ'য়ে উঠেছেন। কৃষ্ণ সেখানে যশোদা-নন্দন আর রাধা সেখানে কৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তির প্রতীক। কিন্তু এমন পদ আলোচ্য সংকলন গ্রন্থে একেবারে বিরল না হ'লেও বিরল-প্রায়। আসলে এ রাধা-কৃষ্ণের আবরণে আত্মগোপন করে আছে নদীমাতৃক বাংলা দেশের প্রেমোন্মত্ত নরনারী, শাশ্বত প্রেমিক-প্রেমিকা। এই তরুণ-তরুণী, এই প্রেম-বিহ্বল যুবক-যুবতীই রাধা-কৃষ্ণ রূপে কায়া বদল করেছে মুস্‌লিম কবিকুলের পদাবলীতে, বেগ সঞ্চার করেছে তাঁদের কল্পনার প্রসারতায়। আরো একটু লক্ষ্য করলে আমরা দেখ্‌তে পাব এ প্রেমিক-প্রেমিকা

শাশ্বত কিন্তু 'যুগল প্রেমের স্রোতে ভেসে আসা' মিষ্টিক নয়। অঙ্গে ধূলা মাটির আকর্ষণ, মাটির পৃথিবীর সাথে তাদের কি নিবিড় সংযোগ!

মহাজন পদকর্তাদের পদে আমরা বিভিন্ন রস পর্যায়ের পদ পেয়েছি। মুসলিম কবিগণও বিভিন্ন রসপর্যায় নিয়ে পদ রচনা করেছেন। এঁদের পদে 'গোষ্ঠ, পূর্বরাগ, অভিসার, বাসক-সজ্জা, মিলন, কুঞ্জ-ভঙ্গ, বিরহ, মাথুর, খণ্ডিতা, দানলীলা, হোলি-লীলা, নৌকাবিলাস, বংশী দুঃখ, নিবেদন প্রভৃতি বিষয়ক পদ রয়েছে।' এখানে কয়েকটি রস পর্যায়ের পদ আলোচনা করা যেতে পারে:

প্রথমেই গোষ্ঠবিহারের পদ। এ রসপর্যায়ে একটি আশ্চর্য সুন্দর পদ লিখেছেন নশীর মামুদ। পদটি এ রস পর্যায়ের কেবল শ্রেষ্ঠ পদ নয়—শব্দ-ঝংকার এবং অলংকার নিপুণতার দিক দিয়ে পদটির একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। যমুনা-তীরে শ্রীদাম সুদাম সংগীসাথে মিলিত হ'য়ে বালক কৃষ্ণের ধেনু চরাণোর ছবিটি বর্ণাল্পনায় সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে। পদটি যে কোন বৈষ্ণব মহাজনের পদের সাথে তুলনীয়:

ধেনু সঙ্গে, গোঠে রঙ্গে
খেলত রাম, সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাঁচনি বেত্র বেনু
        মুরলী খুরলী গানরি।
প্রিয়দাম শ্রীদাম সুদাম মেলি,
তরুণী-তনয়া-তীরে কেলি,
ধবলি সাঙলি আওবি আওবি,
        ফুকরি চলত কানরি॥
বয়স কিশোর মোহন ভাঁতি
বদন ইন্দু জলদ কাঁতি,
চারু চন্দ্রি গুঞ্জাহার,
        বদনে মদন ভানরি।
আগম নিগম বেদ সার,
লীলায়ে করত গোঠবিহার,
নাশীর মামুদ করত আশ,
        চরণে শরণ দানরি॥

এ পদটি একান্তভাবে বৈষ্ণবভাবাপন্ন। মনে হয় যেন রূপদ্রষ্টা কবি ধ্যান-তন্ময় চিত্তে কৃষ্ণের গোচারণ ভূমি দেখেছেন—দেখে তুলির টানে টানে রূপ

দিয়েছেন। পদটির শেষ স্তবকটি কবির কৃষ্ণভক্তির অনবদ্য প্রকাশ। একটি আবেগ-আকুল কণ্ঠ ধীরে ধীরে ক্রমোচ্চ হ'য়ে শেষ স্তবকে একেবারে কাতরতায় ভেঙে পড়েছে। বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলিম কবি-কুলের যে কোন শ্রেষ্ঠ পাঁচটি পদের মধ্যে নিঃসন্দেহে এ পদটি একটি।

বয়ঃসন্ধির একটি সুন্দর পদ পাই মহাকবি আলাওলের রচনায়। এ বয়ঃসন্ধির বর্ণনা রাধিকার নয়—"পদ্মাবৎ" কাব্যের নায়িকা পদ্মিনীর। অথচ বৈষ্ণবভাবের সুরটি যেন স্পষ্ট শোনা যায়। বস্তুতঃ পরিচয় না দিয়ে পদটি তুলে দিলে রাধার বয়ঃসন্ধির পদ বলে সকলেরই ভ্রম হ'বে।

আড় আঁখি বক্রদৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়।
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয়॥
চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে উপজয়।
বিরহ-বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়॥...

পূর্বরাগের পদে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ফুটেছে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ মহাজনদের পদে যে আত্মহারা ব্যাকুল ভাবটি ফুটেছে এখানে সেটি অনুপস্থিত। আকবর আলীর পদে স্বপ্নদর্শনে রাধিকার চিত্তে পূর্বরাগোন্মেষের চিত্রটি আভাসিত হ'য়েছে :

একা ঘরে শুইয়া থাকি, সুতিলে স্বপন দেখি।
ও আমার কর্ম্মদোষে না পাইলাম জাগিয়া॥...

কবি মোহাম্মদের একটি পদেও পূর্বরাগের সুরটি ধরা পড়েছে :

ও কি অপরূপ পেখিলুং বিপিন মাঝে
জার জথ হিত চিত্ত প্রকাশিত
সাকল নআন সাঝে॥
কতুক কারণে গেলু বৃন্দাবনে
দেখিতে ছো বন্ধু শ্যাম।...

পূর্বরাগের পদে বোধহয় সর্বাপেক্ষা বেশী কৃতীত্বের পরিচয় দিয়েছেন কবি হানিফ :

মধুর মুরলি ধ্বনি শুনিতে সুস্বর।
ভুবন মোহন রূপ চলহ মধুর॥
কি রঙ্গ দেখিলাম সইরে যমুনার কূলে।
পুলকিয়া উঠে প্রাণ ছটফট করে॥...

একটু লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব পদগুলিতে কৃষ্ণতন্ময়তা নেই—আছে কেবল একটি চিত্র। এখানে রাধা-কৃষ্ণ সাধারণ নরনারী—সাধারণ যুবক-যুবতীর আকৃতি এবং হৃদয়াকাঙ্ক্ষা রাধাকৃষ্ণ নামের মাঝে আত্মগোপন করে আছে।

আলাওলের একটি পদে রাধা-চিত্রের অন্তরালে এক অভিসারিকা পল্লীবালার চিত্রটি সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে। 'রাধা', 'ভেল', 'ননদিনী' প্রভৃতি পদাবলীর কয়েকটি বহুল-ব্যবহৃত শব্দের প্রলেপে পদটিকে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন করা হয়েছে। আলাওল যে একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণবরসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন এ পদটি তার সার্থক প্রমাণ। রাধিকা প্রত্যুষে অভিসারে গিয়ে ফিরছেন সন্ধ্যায়—কুটিলা এই বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করেন :

ঘরের ঘরণী জগত মোহিনী
প্রত্যুষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ
কিসে বিলম্ব করিলি।

রাধা বিলম্বের কারণ নিদর্শন করেন :

প্রত্যুষে বেহানে কমল দেখিয়া
পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলা উদানে কমল মুদনে
ভ্রমর দংশনে মৈলুম ॥
কমল-কণ্টকে বিষম সঙ্কটে
করের কঙ্কন গেল।
কঙ্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে
দিন অবশেষ ভেল ॥
সীঁথের সিন্দুর নয়নের কাজল
সব ভাসি গেল জলে।
হের দেখে মোর অঙ্গ জরজর
দারুণি পদ্মের নালে ॥

এটা ঠিক রাধিকার স্বর নয়—অভিসার-প্রত্যাগতা পল্লী কুমারীর কণ্ঠ। যমুনায় পদ্ম—একটু বিসদৃশ মনে হয় না কি। আসলে এটা বৃন্দাবন-উপকণ্ঠ-সিক্ত করা যমুনা নয়—সবুজ পত্র-পল্লবে ঘেরা পদ্মপুকুর। এ কুমারী চতুরা, উপস্থিত

বুদ্ধি প্রখর। বিলম্বের কারণগুলি কি সুনিপুণ দক্ষতার সাথেই না ব্যাখাত হ'য়েছে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে একথাও স্বীকার্য পদটিকে যদি কেউ বৃষভানু-নন্দিনী রাধার উক্তি বলেই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন তাও করতে পারেন। পদটিতে পদাবলীর ছন্দ ও সুরের আশ্চর্য সমাবেশ ঘটেছে।

সেখলালের একটি পদে বিরহের সুরটি সকরুণ হ'য়ে ধরা পড়েছে। এই পদটির প্রশান্ত ভাববাহী সরল অনাড়ম্বর ভাষা চণ্ডীদাসের অশ্রু-সজল-সহজ পদগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পদটির মধ্যে রাধার বিরহকাতর কণ্ঠ সকরুণ হ'য়ে উঠেছে। কবিও যেন এখানে রাধার অন্তরবেদনাটি নিজে গ্রহণ করেছেন—চণ্ডীদাসের মত রাধাভাবে ভাবিত হ'য়েছেন। পদটি একান্ত ভাবে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন :

শুনলো সজনি	কিছুই না জানি	কি বুধি করিব আমি।
তরিতে নারিব	দৈবে মরিব	নিশ্চয় জানিহ তুমি॥
শয়নে স্বপনে	শ্যাম বঁধুর সনে	সুখে গিয়াছিনু নিদ।
পাঁজর কাটি	শ্যাম বঁধুরে কেবা	দিয়া নিল সিঁদ॥
শয়নে স্বপনে	ঘরেতে পিরিতি	করিনু শ্যামের সনে।
সেই হইতে মোর	চিত্ত বেয়াকুল	কিছুই না লয় মনে॥···

এরপর আত্মনিবেদনের পদ। আত্মনিবেদনের পদে সৈয়দ মর্তুজা একটি পদ লিখেছেন। পদটি সমগ্র বৈষ্ণবজগতে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করায় পদসংকলন গ্রন্থ "পদকল্পতরু"-তে তার স্থান অনিবার্য হ'য়ে পড়েছে। চণ্ডীদাসের আমিত্ব-বিসর্জিত ক্ষোভহীন আত্মনিবেদনের পদের সাথে এই পদটি একই সমভূমিতে দাঁড়াবার স্পর্দ্ধা রাখে। অন্ততঃ এ পদটিকে শাশ্বত প্রেমিক-প্রেমিকার কণ্ঠ-ধ্বনি বলে চালান দুঃসাধ্য—এখানে কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি আরাধিকা শ্রীরাধার বিরল-শ্রুত কণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়েছে :

শ্যাম বঁধু, আমার পরাণ তুমি!
কোন্ শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাশরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদনে,
ধৈরয ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান্
দণ্ডে দশবার মরি॥

মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া

শুন শুন পরাণকানু।

কুল শীল সব ভাসাইনু জলে

না জীয়ব তুয়া বিনু॥

খণ্ডিতা নায়ক-নায়িকার কয়েকটি সুন্দর পদ পেয়েছি মুস্‌লিম পদকর্তাদের পদে। কৃষ্ণের জন্যে শয্যা এবং আহারাদি প্রস্তুত করে শ্রীরাধা ব্যাকুলপ্রতীক্ষা করেন কিন্তু কৃষ্ণের দেখা নেই। কৃষ্ণ অন্য সখীর কুঞ্জে রাত্রি যাপন করে পরদিন প্রভাতে যখন শ্রীরাধার সম্মুখে আসেন তখন অনুযোগে রাধার কণ্ঠ ক্রমোচ্চ হ'য়ে ওঠে জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা, অনুযোগের পর অনুযোগ :

সভাই বলে রাধার পরাণ কানাই।

তুমি রজনী বঞ্চিলে কেন ঠাঁই॥

কেমনে বনালে চূড়া শ্রবনে দুলিতেছে

মেলিতে নার দুটি আঁখি॥

কঙ্কুম কস্তুরী আর সুগন্ধি তাম্বুল

থুইয়াছিনু শিয়র উপরে।

হা হরি হা হরি করি জাগিয়া পোহানু নিশি

তুমি ছিলে কাহার মন্দিরে॥

বংশী বা মুরলী বৈষ্ণব সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এ প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা আমরা জ্ঞানদাসের পদালোচনায় করেছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বংশী রূপক—বংশী-ধ্বনি আর কিছুই নয় ভগবানের সাথে ভক্তের মহামিলন আহ্বান। ভগবানের এ ডাকে ভক্ত সাড়া না দিয়ে পারে না। পরমাত্মার সাথে জীবাত্মা মহামিলন ডোরে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'কালিনী-নই-কুল' হ'তে এ বংশী-ধ্বনি উত্থিত হ'য়েছে, মহাজন-পদাবলীর, সর্বত্রই তো সুরজ মুরলীর মোহন তান গুঞ্জিত, মুস্‌লিম পদকর্তারাও এ বংশীকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি—তাঁদেরও পদাবলীর নম্র-কোমল বক্ষ হ'তে এ মোহন তান বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে। কীর্তি-খ্যাত পদকর্তা আলী রাজার একটি পদ :

বনমালা শ্যাম তোমার মুরলী জগ-প্রাণ

জাতি ধর্ম কুল নীতি তেজি বন্ধু সব পতি

নিত্য শুনে মুরলীর গীত।

বংশী হেন শক্তি ধরে তনু রাখি প্রাণী হয়ে
বংশীমূলে জগতের চিত ॥

বংশী সম্পর্কে চাঁদ কাজির একটি বিখ্যাত পদ :

বাঁশী বাজান জান না।
অসময় বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না ॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার কাছে।
তুমি নাম ধইরা বাজাও বাঁশী, আর আমি মইরি লাজে ॥
ওপার হইতে বাজাও বাঁশী, এপার হইতে শুনি।
আর অভাগিয়া নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি ॥
যে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশী, সে ঝাড়ের লাগি পাঁও।
জড়ে-মূলে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাওঁ ॥

কোন নিষ্ঠাবান সমালোচক উল্লিখিত অংশটুকু সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এই "পদে রাধার ব্যাকুলতা আরও তীব্র এবং তাঁহার লজ্জাশীলা মূর্তিটি বড়ই মধুর। গুরুজনের নিকট যখন রাধা উপবিষ্টা তখন অকস্মাৎ বাঁশীর রব তাঁহার কানে পশিয়াছে—ইহাতে তিনি লজ্জায় বিব্রত। কিন্তু সে বংশী-ধ্বনি 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' তাঁহাকে এমনই ব্যাকুল করিয়াছে যে, তাঁহার অবরুদ্ধ আত্মা সীমার বাঁধ ভাঙ্গিয়া অসীমের সহিত মিলিত হইবার জন্য নিবিড় আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর বৈষ্ণব-কবিতাগুলি অধ্যাত্মরাজ্যের—এগুলি অতীন্দ্রিয় ভাবের দ্যোতক। ক্রমাগত সীমার বন্ধন অতিক্রম করিয়া অসীমের সহিত মিলিত হইবার ব্যাকুল প্রার্থনায় পরিপূর্ণ এই পদগুলি।" এ মন্তব্যের সার-কথা স্মরণ রেখেও আমরা পাঠককে আর একটু সতর্ক হতে বলব। একটু সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে দেখলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই-কূলে' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বংশীর যে অবিরাম ধ্বনি গুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে আলোচ্য পদটিতে সে ধ্বনি নেই। এপদে রাধা নামের অন্তরালে মিশেছে পূর্ববঙ্গের লোকগীতিকার নিজস্ব সুর-বৈশিষ্ট্য। এ পদের আধ্যাত্মিক অর্থ যাই থাক লৌকিক অর্থ সে অর্থকে ছাপিয়ে প্রধান হ'য়ে উঠেছে। এ পদের রাধিকাকে পদাবলীর রাধিকা বলতে আমাদের মন সঙ্কুচিত।

এই লৌকিক ভাব এবং পল্লীবালার সরল চিত্তটি একেবারে অনাবৃত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে নিম্নের পদটিতে :

বিনোদ আজু যাও ঘর।
তোমা খাইবে বাঘে সাপে কলঙ্ক আমার॥
উঠানেতে হাটু পানি সম্মুখে গড়খাই।
সোনাহেন বন্ধুয়া রাখিমু কোন ঠাঁই॥'

এ পদে আধ্যাত্মিকা খুঁজতে যাব কোন সাহসে? আমরা জানি বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলিম কবিদের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গবাসী। রাধা-কৃষ্ণ নাম দিয়ে পদ রচনা করলেও সে পদের অনুরাগিনীটি পল্লীবালারই অনুরাগিনীর সাথে বেজে উঠেছে, পূর্ববাংলার পল্লীচিত্রটিই সে পদে চিত্রিত। পদ সংকলয়িতা যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন এ পদের "বর্ণনায় বৃন্দাবনের চিত্র কতখানি ফুটিয়াছে তাহা বলিবার অধিকারী আমি নহি। কিন্তু এইরূপ চিত্র যে পূর্ববঙ্গে অহরহ চোখে পড়ে তাহা পূর্ববঙ্গবাসী মাত্রই স্বীকার করিবেন। পূর্ববঙ্গের কবি-রচিত পদাবলীসমূহের মধ্যে বঙ্গভূমির খণ্ডচিত্র সার্থকভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এই সকল কবিরা বাঙ্গালার জাতীয় কবি নামে অভিহিত হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকারী।"

অবশ্য এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন হ'তে পারে, এ প্রেম-গাথাগুলি যদি পল্লীবালার ব্যথা বেদনার সাথে জড়িত হয় তা' হ'লে রাধা-কৃষ্ণ নাম দিয়ে রচিত হ'ল কেন। উত্তরে বলা চলে মহাপ্রভুর আগমনে এবং তাঁর আজীবন আচরণের মধ্য দিয়ে রাধা-কৃষ্ণ হ'য়ে উঠেছিল শাশ্বত প্রেমিক-প্রেমিকা। সকল দ্বেষ, সকল হিংসা, সকল ধর্ম, সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে তাঁরা হ'য়ে উঠেছিলেন আদর্শ প্রেমিক-যুগল। মহাপ্রভুর আজীবন ধ্যান-সাধনার মধ্য দিয়ে এ রাধা-কৃষ্ণ হ'য়ে উঠেছিল সর্বজনীন। বাংলার শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত কবিগণ তাই প্রেমের কথা বল্‌তে গিয়ে রাধা-কৃষ্ণের আশ্রয়ই গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য এ রাধাকৃষ্ণ যে সর্বত্রই লৌকিক নায়ক-নায়িকা নয় আমাদের আলোচনার কোন কোন অংশে আমরা দেখেছি এঁরা বৃষভানু-নন্দিনী এবং যশোদা-নন্দন হ'য়ে উঠেছেন এবং এ সব অংশের কবিগণও আর ঠিক অবৈষ্ণব নন—বৈষ্ণবানুরাগী। কোন কোন পদের ভণিতাংশে এই অনুরাগ শতধারায় উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে। এমনি ধরণের কয়েকটি ভণিতার উল্লেখ করে আমরা এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি করব।

ক॥ চাঁদ কাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমুনা জীমুনা আমি না দেখিলে হরি॥

খ ॥ দুঃখ সব দিল—নিদয়াং কালায়।

ভাবিয়া ইরকানে কয় শ্যামের চরণ যেন পাই ॥

গ ॥ জন্ম নিয়া মুসলমানে বঞ্চিত হব শ্রীচরণে

আমি মনে ভাবিনা একবার।

এবার লাল মামুদে হ'রেকৃষ্ণ নাম করেছে সার ॥

ঘ। সৈয়দ মর্তুজা বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণী

ধনি ধনি তোমার জীবন

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর

সে তোমার কেবল শরণ ॥

ঙ। সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন মোর কথা।

মন মোর মজি রৈল বাঁশী পুরে যথা ॥

চ। সৈয়দ মর্তুজা ভণে কানুর চরণে নিবেদন শুন হরি।

সকল ছাড়িয়া রহিলু তুয়া পায়ে জীবন মরণ ভরি ॥

এসকল ভনিতা হ'তে নামগুলি তুলে চণ্ডীদাসাদির নাম বসিয়ে দিলে কোথাও কোন অশোভন হয় কি? এ সকল ভনিতায়—কবি মনের ব্যাকুলতা, কবি-মনের আবেগ-আকুতি অত্যুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। কৃষ্ণ-পদ-সেবাই এঁদের কাম্য। এখানে কোন জাতীয় সংকীর্ণতা, কোন ধর্মের বেড়াজাল কবির শুভ্র-কামনাকে আবিল করে তুল্‌তে পারেনি। সর্বসংস্কারমুক্ত উদার প্রাণ এবং বিপুল-বিস্তারী মন নিয়ে কৃষ্ণের শান্ত পদছায়া কামনা করেছেন। একেশ্বরবাদী মুস্‌লিম কবিদের পক্ষে এ যেন চূড়ান্ত বিদ্রোহ-ঘোষণা!

॥ তিন ॥

॥ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদির প্রভাব ॥

রাধা-কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক পদ রচনায় পরিধি খুব সীমিত। উপকরণ এক, উপস্থাপন ভংগীও একই পন্থানুসরি। একই ভাব, একই ভাষা; একই রূপ একই রেখা; তাই একের প্রভাব অপরের মধ্যে পড়তে বাধ্য। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস যে পদ রচনা করে গেছেন, যে সুরে আলাপন করেছেন—কমবেশী অন্যান্য সকল মহাজনদের পদে তার ছায়াপাত ঘটেছে। কেবল ছায়াপাত নয়—সময় সময় একই পদ দু'এক জায়গায় সামান্য অদল-বদল হ'য়ে অন্য পদকর্তার নামে প্রচলিত হ'য়েছে। বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের সৃষ্টিতে অনুরূপ পদ পরিলক্ষিত হয়। এঁরা কেবল মহাজনদের পদাবলীতে আকৃষ্ট

হননি।—অনুকরণ করেছেন। সেই অনুকরণের মধ্যেও 'কবি-ব্যক্তিত্বের' স্পর্শটুকু অনুভব করা যায়। মুসলিম কবিদের যে পদ সমূহে অন্যান্য মহাজনের পদের প্রভাব ব্যাপক—নিম্নে আমরা তার কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করছি।

আলাওলের এই পদটিতে—

চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী
খঞ্জনগমন শোভিতা॥

বিদ্যাপতির নিম্নোদ্ধৃত পদটির প্রভাব সুগভীর :

গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি'।

নাশীর মামুদের গোষ্ঠবিহারের একটি পদে গোবিন্দদাসের রাসের একটি পদের ভাষা, শব্দ-ঝংকার এবং সুর-বৈচিত্র্য অবিকল ধরা পড়েছে। যদিও একটি গোষ্ঠবিহারের আর অপরটি রাসের, একটির ভাবমাধুর্য অপরটি হ'তে ভিন্ন তথাপি মনে হয় নাশীর মামুদ গোবিন্দদাসের পদটি সম্মুখে রেখে আপন পদ রচনা করেছেন। উভয় পদের দুই পংতি। প্রথমে নশীর মামুদ :

বয়স কিশোর মোহন ভাঁতি
বদন ইন্দু জলদ-কাঁতি
চারু চন্দ্রি গুঞ্জা-হার
বদনে মদন ভাণরি।

এই সাথে গোবিন্দদাসের পদ :

হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত চোরণী।

মুসলিম পদকর্তাদের বহুপদে চণ্ডীদাসের পদাবলীর সুরঞ্ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে। বহুপদে ভাষার সারল্য, ছন্দের বাঁধুনি এবং ভাবের শান্ত শুভ্রগভীরতা যেন হুবহু চণ্ডীদাস হ'তে গ্রহণ করা। বস্তুতঃ পাঠের সময় আমরা চণ্ডীদাস পড়ছি না সেখলাল-সৈয়দ মর্তুজা পড়ছি বোঝা কষ্টকর। সেখলালের "শুন লো সজনি কিছুই না জানি কি বুধি করিব আমি" (পূর্বোদ্ধৃত) এবং সৈয়দ মর্তুজার "শ্যাম বঁধু, আমার পরাণ তুমি" (পূর্বোদ্ধৃত) ইত্যাদি পদগুলির সাথে চণ্ডীদাসের পদের কোনই পার্থক্য নেই। একে অপরের পরিপূরক না পাদপূরক—বলা মুস্কিল, বোঝা শক্ত।

বসন্তোৎসবের দু'টি পদ প্রায় এক বলেই মনে হয়। একটি কবীরের অপরটি জ্ঞানদাসের। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই কবীর এখানে জ্ঞানদাস অপেক্ষা অধিকতর সার্থক। কবীরের পদের অংশত এই :

বরজ কিশরী ফাগু খেলত রঙ্গে

চুয়া- চন্দন, আবীর গোলাব,

দেয়ত শ্যামের অঙ্গে ॥

আর জ্ঞানদাসের পদ :

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে

ব্রজ-বনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে।

অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। একের প্রভাব যে অপরের উপরে পড়েছে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। আর না পড়েও উপায় ছিল না। কেননা পথ একই—চলতে গেলে পদচিহ্নের ওপর পদচিহ্ন পড়বেই। পূর্ব-রাগোন্মত্ত রাধার ব্যাকুল ভাব, মেঘ-দর্শনে গৌর রাধার বিরহ-কাতর মূর্তি, দুর্যোগঘন বাদলঝরা নিশীথে অভিসারিকা রাধার দৃঢ় পদক্ষেপ, বংশী-ধ্বনিতে শ্রীমতীর শ্যাম-আকুলতা—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা একই সুর, একই ভাবের একই আলাপন। তবুও আনন্দের কথা এই একই পথে পদচারণা করেও আপন মানস-বিভিন্নতার জন্যে এই কবিকুলের পদরাজীতে এক একটি আশ্চর্য-মনোরম চিত্র ফুটেছে, ক্ষণ-সুন্দর মুহূর্তগুলি স্বর্ণচেলিতে আবদ্ধ। কেবল বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিদেরই না—সমগ্র বৈষ্ণব কবিকুলের সার্থকতা এখানেই। এই চির পুরাতনের মাঝে চির নতুনের সৃষ্টিতে।

॥ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥

॥ এক ॥

॥ ভূমিকা : চৈতন্যদেব ও জীবনী গ্রন্থ ॥

বহু প্রসঙ্গে, বহু স্থানে আমরা উল্লেখ করেছি যে মহাপ্রভুর আবির্ভাবে কেবল দেশ নয় দর্শন, সমাজ নয় সাহিত্যও নতুন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছিল। সর্বত্রই জেগেছিল একটা প্রাণের আভাস, জীবনাবেগ। প্রাক্-চৈতন্য যুগে বাংলা সাহিত্যের যে সকল ধারা আত্মবিকাশ করেছিল চৈতন্যোত্তর যুগে তাদের বলিষ্ঠ রূপ-সম্পূর্ণতা তো ঘটেছিল উপরন্তু বাংলা সাহিত্যের এমন একটি শাখার উৎসমূল খুলে গিয়েছিল যার পদধ্বনি বাংলা সাহিত্যের বুকে এই প্রথম শোনা গেল। এই শাখাটি হ'ল জীবনী-শাখা। মানুষের জীবনী এই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত হ'ল। মানুষের কথা-কাহিনী, তাঁর আচার-আচরণ, তাঁর বাসনা-কামনা এই সর্বপ্রথম সাহিত্যের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করল। পূর্বে যা' ছিল অসম্ভব পরে তাই হ'ল সম্ভব, পূর্বে যা' ছিল অলীক-অবিশ্বাস্য পরে তাই বিপুল বর্ণ-বিন্যাসে একান্ত বাস্তব-বিশ্বাস্য হ'য়ে উঠ্‌ল। এ প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ ফসল কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অসংখ্য চৈতন্য-জীবনী-গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক এবং প্রতিষ্ঠিত। গুণ এবং গুরুত্ব সকল দিক দিয়েই এর মূল্য অপরিসীম।

এ প্রসঙ্গে চৈতন্য-জীবনী-গ্রন্থের মূল-স্বরূপটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। চৈতন্য-জীবনী নিয়ে গ্রন্থ রচিত হ'তে পেরেছিল তার প্রধান কারণ মহাপ্রভুর জীবনই ছিল তাঁর বাণী। তিনি যে দেববাদ-নির্ভর-মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর জীবনাচরণই ছিল সে মতবাদের পরিপোষক এবং পূর্ণ অভিব্যক্তি। তিনি একাধারে মানুষ এবং দেবতা—এক বৃন্তে দুটি ফুল, নর এবং দেবতার যুগল প্রতীক। আধুনিক যুগে যে সকল জীবনী গ্রন্থ রচিত হ'চ্ছে তা'তে দোষ-গুণ, পাপ-পুণ্য সমন্বিত মানুষটির ছবি সুস্পষ্ট কিন্তু মধ্যযুগের ধর্মান্ধতার আমলে সেটি হ'বার উপায় ছিল না—মানুষ নয় দেবতার লীলা-খেলার উপরেই গণজীবনের আস্থা ছিল বেশী। নর-রূপীদেব শ্রীচৈতন্য আপন

জীবনাচরণের দ্বারা দৈবী কর্মের মত অসাধ্যসাধন করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর জীবনালেখ্য রচনায় অসংখ্য জীবনীকার উদ্বুদ্ধ হ'য়েছিলেন। তবে এ প্রসঙ্গে এটাও লক্ষণীয় মহাপ্রভুকে দেবতার আসনে বসিয়ে অনেক জীবনীকার তাঁর জীবনের সত্য ঘটনাকে পিছনে ফেলে অবাস্তব-অলৌকিক ঘটনা-বর্ণনায় মেতে উঠেছেন। তবে আমাদের সৌভাগ্য চৈতন্যচরিতামৃত এদিক দিয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ না হ'লেও প্রায়-নির্দোষ। অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ এ গ্রন্থে আছে —কিন্তু সত্য ঘটনার সাথে এই অলীক কাহিনীগুলি এমনভাবে মিশে আছে যে এগুলিকে চিনতে মোটেই বেগ পেতে হয় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কেবল জীবনী গ্রন্থই নয়—মহাপ্রভুর জীবনী বর্ণনা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্মের তত্ত্বকথাগুলির বিশ্লেষণে এই বিপুলায়তন গ্রন্থের বিরাট একটা অংশ ব্যয়িত হ'য়েছে। নিম্নে আমরা কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত মূল তত্ত্বকথাগুলির প্রধান কয়েকটির অন্তর্নিহিত সত্য-সার বুঝে নিতে চেষ্টা করব।

॥ দুই ॥

॥ গৌরতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব ॥

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর লোকোত্তর জীবন-লীলার মহাভাষ্যকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর সাহিত্য ও সাধন-জীবনের মহা-সৃষ্টি চৈতন্যচরিতামৃতের আদি-লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে গৌরতত্ত্ব ও রাধাবাদের জটিল স্বরূপটি অভিনব প্রজ্ঞার আলোকে সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। তত্ত্বের গহনারণ্যে প্রবেশ করার পূর্বে আমরা তত্ত্বের মূল জিজ্ঞাসাগুলির সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করবো। জিজ্ঞাসাগুলি এই ভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে :

শ্রীরাধ কে? শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি কী কারণে শ্রীরাধারূপে প্রকাশিত হন? কী কারণে এক বস্তু দুইরূপে আত্মপ্রকাশ করেন? এক বস্তু দুইরূপে প্রকাশিত হয়ে আবার একীভূত হন কেন? শ্রীগৌরাঙ্গ কে? 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিততনু'রূপে তাঁর অবতারের কারণ কি? ইত্যাদি।

ভগবানের স্বরূপ-শক্তি তিন রূপে প্রকাশিত—সৎ (সান্ধনী বা ইচ্ছাময়), চিৎ (সংবিৎ বা জ্ঞানময়) এবং আনন্দ (হ্লাদিনী বা আনন্দময়)। ত্রয়ীরূপে ভগবানের এই যে প্রকাশ—এ প্রকাশ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত—একে অপর

হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক বা বিচ্ছিন্ন নয়। সৎ, চিৎ, আনন্দ এরা প্রত্যেকেই একে অপরের ক্রম ঘনীভূত রূপ মাত্র। দুগ্ধের সারাংশ যেমন সর, সরের ঘনীভূত রূপ যেমন ক্ষীর তেমনি সৎ-এর ঘনীভূত রূপ চিৎ এবং চিৎ-এর ঘনীভূততর রূপ আনন্দ। সুতরাং আনন্দাংশেই হলো ভগবানের স্বরূপ-শক্তির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ-ক্ষেত্র। এখন যে আনন্দাংশকে আমরা ভগবানের স্বরূপ-শক্তি বিকাশের শ্রেষ্ঠতম অংশ রূপে আখ্যায়িত করলাম সেই আনন্দাংশেরও একটি সারতম অংশ আছে—যে অংশের জন্যেই আনন্দাংশ সজীব, যে অংশই আনন্দাংশের প্রাণ-স্পন্দন। এই সারতম শক্তিটির নাম হ্লাদিনী শক্তি। সুতরাং এই হ্লাদিনী শক্তিই হলো শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠতম শক্তি। হ্লাদিনী শক্তিই সকল শক্তির আবাস-স্থল। কবিরাজ গোস্বামী এই হ্লাদিনী শক্তির সারকে প্রেম, প্রেমের সারকে ভাব এবং ভাবের পরম-প্রকাশকে মহাভাব বলেছেন। শ্রীরাধা হলেন এই মহাভাবের মূর্ত প্রতীক :

> হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
> ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
> মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
> সর্বগুণ-খনি, কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি॥...॥ আদিলীলা : ৪র্থ পরিচ্ছেদ ॥

সুতরাং রাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির চরম বিকাশ—হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। রাধা-শ্রীকৃষ্ণ পৃথক নয়—এক, বিভিন্ন নয়—একাত্ম। শ্রীরাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের 'প্রণয়-বিকার'—শ্রীকৃষ্ণের এক শক্তিই শ্রীরাধায় রূপান্তরিত :

> রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
> অন্যোন্য বিলসে রস আস্বাদন করি ॥...॥ আদিলীলা : ৪র্থ পরিচ্ছেদ ॥

রাধা-কৃষ্ণ যদি একাত্মই হন তা' হলে তাঁদের দুই দেহ ধরার কারণ কী? সংক্ষিপ্ত ভাবে এর উত্তরে আমরা বল্‌তে পারি—এই দুই দেহ ধারণের মূলে রয়েছে ভগবানের আত্মোপলব্ধির তীব্র স্পৃহা। দুই দেহ ধারণ করে তিনি নিজেকেই নিজে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। বাহ্যতঃ কথাটা আপাতঃ বিরোধী মনে হ'তে পারে। কেননা রাধা যদি তাঁর অংশই হন তা' হ'লে রাধা তো তাঁর নিজের মধ্যেই বর্তমান—সুতরাং পৃথক দেহ ধারণ না করেও তো তিনি নিজের মধ্যেই নিজেকে উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু নিজের মধ্যে সকল উপাদান থাকা সত্ত্বেও নিজেই নিজেকে উপলব্ধি করা যায় না—রসাস্বাদনের জন্যে দ্বৈত সত্তার প্রয়োজন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা এই

মন্তব্যটির মর্মমূল হ'তে সার নিষ্কাষণ করার চেষ্টা করবো। আমরা গল্প-কবিতা রচনা করি কেন? গল্পের বিষয়বস্তু, কবিতার সকল উপাদান তো আমাদের মানসলোকে বর্তমান তবুও তার বহিঃপ্রকাশ অনিবার্য হয়ে পড়ে। কেন? ছবি যিনি আঁকেন তাঁর সম্পর্কে ঠিক এই একই প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে। ছবির সকল পরিকল্পনা শিল্পীর গহন-মনে বিরাজিত—তবুও সেই পরিকল্পনাকে রূপ-রেখায় তাঁকে বাইরে প্রকাশ করতে হয়। যতক্ষণ মূল পরিকল্পনাটি দ্বৈত সত্তায় আপন স্বরূপে প্রকাশিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কবি-শিল্পীর তৃপ্তি নেই—সমগ্র জীবন-জুড়ে চলে অতৃপ্তির দাহ। আপন গহণ মনে কল্পনাশ্রয়ী যে রূপ তাকে স্বরূপের মাঝে রূপায়িত করে, কবিতা বা চিত্রের মর্মমূলে সঞ্চারিত করে দিয়ে—যে দ্বৈত শিল্প-রূপ গড়ে ওঠে সেই শিল্পরূপের মাঝেই হয় শিল্পী মনের নব পরিচয়। এই শিল্পরূপ আর কিছুই নয় সেই অনাদি অতীত চির পুরাতনকে 'নূতন বিবাহে'র বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে নতুন করে পাওয়া। যতক্ষণ ভাবোদ্বেল চিন্তারাশি শিল্পীর মানসলোকে ছিল ততক্ষণ শিল্পীর পক্ষে সেই বিশেষ ধ্যান-চিন্তা হতে রসাস্বাদন করা সম্ভব হয় নি—কিন্তু সেই ধ্যান-কল্পনা যখন শিল্পী মনের মাধুরী-সংমিশ্রনে মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে বাইরে প্রকাশিত হলো তখন তার সাথে কবির হলো নতুন পরিচয়। শিল্পরূপ ও শিল্পীমন নির্জন মিলন-লীলায় আপন-হারা হয়ে গেল। নিজেকে বিভক্ত করে দেখ্‌তে না পারলে কখনো আত্মোপলব্ধি সম্ভব নয়। এই উপলব্ধির জন্যেই শ্রীকৃষ্ণ আপন শক্তির মর্ম-নির্যাস দিয়ে রাধাকে সৃষ্টি করলেন। রাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব (Image)—রাধার সাথে শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা এ নিজের সাথেই নিজের লীলা, নিজেকেই নিজে অনুভব করা। নিজের বিভক্ত রূপে এই যে রাধার সৃষ্টি এ হলো স্বভাবের সৃষ্টি, সৃষ্টির আবেগে ও আনন্দেই এ সৃষ্টি সুন্দর। সুতরাং স্বভাবানুগ রাধা-সৃষ্টির সাথে ভগবানের যে লীলা এ হলো আপনার অন্তরে আপনার আস্বাদন, এ হলো মনের মুকুরে আত্মোপলব্ধি—Self realisation.

ঠিক এই চিন্তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সুন্দর রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'বলাকা'র অনেকগুলি কবিতা তার প্রমাণ। যে দিন ভগবান একা ছিলেন সেদিন তাঁর আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয়নি :

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা।
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।

ভগবানের অখণ্ড সত্তার মধ্যে তাঁর সমুদয় কল্পনা-চিন্তা পঙ্গু ও মূক হয়েছিল কিন্তু এই অখণ্ড সত্তা ভেঙে যেদিন এল সৃষ্টির প্রবাহ সেদিন ভগবানের পক্ষে সম্ভব হলো তাঁর আত্মোপলব্ধি, সৃষ্টির মধ্য দিয়েই তিনি পেলেন আপনার পরশ :

আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

শ্রীভগবানের আত্মোপলব্ধির বিশাল ক্ষেত্র হলেন শ্রীরাধা। সাধারণের বিশ্বাস ভূ-ভার হরণের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ মর্তে অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের মতে ভূ-ভার হরণ হলো শ্রীকৃষ্ণের মর্তে অবতারের গৌণ কারণ—মুখ্য কারণ হলো রাধার অসীম প্রেমরসনির্যাস-আস্বাদন এবং এই আস্বাদনের মাধ্যমে আপনার স্বরূপ-উপলব্ধি।

এখন স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে রাধার প্রেমাস্বাদন যদি কৃষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তা' হলে কৃষ্ণাবতারের পর আবার গৌরাঙ্গাবতার কেন? কবিরাজ গোস্বামী তাঁর চরিতামৃতে গৌরাঙ্গ অবতারের তিনটি কারণ প্রদর্শন করেছেন এবং সেই তিনটি কারণকে অবলম্বন করেই তিনি শ্রীরাধার স্বর্গীয় প্রেম-সুষমার অভিনব ব্যাখ্যা দান করেছেন। কৃষ্ণাবতারে প্রেমাস্বাদনের পরও শ্রীরাধার প্রেমের কয়েকটি বিশেষ দিক আস্বাদনের উপর ভগবানের বিশেষ বাসনা ও আকাঙ্খা ছিল—সেই আকাঙ্খার পরিতৃপ্তির জন্যেই প্রয়োজন হয়েছিল গৌরাঙ্গাবতারের। গৌরাঙ্গাবতারে প্রেমাস্বাদনের পুষ্টি সর্বধিক। প্রেমাস্বা-দনের ব্যাপারে শ্রীভগবানের মনে যে সুপ্ত আকাঙ্খার কথা আমরা উল্লেখ করলাম সেই বাসনাগুলি স্বরূপদামোদরের কড়চায় সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েছে : 'যে প্রেমের দ্বারা রাধা আমার অদ্ভুত মাধুরিমা আস্বাদন করে সে প্রণয় মহিমাই বা কি রকম, আর রাধাপ্রেম কর্তৃক আস্বাদ্য যে আমার অদ্ভুত মাধুরিমা তাই বা কি রকম; আমাকে অনুভব করে রাধার যে সুখ হয় তাই বা কি রকম,—এরই লোভে রাধাভাবযুক্ত হ'য়ে শচীগর্ভরূপ সিন্ধুতে হরি (গৌরাঙ্গ) রূপ ইন্দু (চন্দ্র) জন্মগ্রহণ করেছেন।

এই কড়চায় ভগবানের যে তিনটি লোভের কথা বলা হয়েছে সেগুলি নিম্নলিখিত ভাবে প্রতিবিম্বিত করা যেতে পারে :

ক ॥ শ্রীরাধার অতলান্ত প্রেমের মহিমা কেমন?

খ ।। রাধা আস্বাদিত কৃষ্ণের অদ্ভুতমাধুরিমা কেমন ?
গ ।। কৃষ্ণ-প্রেমাস্বাদনে রাধায় যে সুখ হয় তা' কেমন ?

কৃষ্ণাবতারে রাধাপ্রেমের এই বিচিত্র দিক আস্বাদন করা ভগবানের পক্ষে সম্ভব হয়নি—কেননা উপরে যে তিনটি লোভের কথা বলা হয়েছে রাধা-ভাব ব্যতীত কৃষ্ণ-স্বরূপে এই তিনটির একটিও আস্বাদন করা সম্ভব নয়। তাই ভগবান 'রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিততনু' ধারণ করে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গৌরাঙ্গ কেননা বহিঃ প্রকৃতি গৌর (শ্রীরাধার বর্ণের ন্যায়) কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতি কৃষ্ণময় (শ্রীরাধার অন্তরও কৃষ্ণময়—তিনি কৃষ্ণগত প্রাণা)। রাধার দুর্লভ অলৌকিক প্রেম-বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন :

কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি-রাধা—ক্রীড়াব সহায় ।।

অন্যত্র :

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ।।

রাধা কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁর ধ্যেয় নয়। কৃষ্ণকে পরিতৃপ্ত করাই তাঁর জীবন-সাধনা। আপন-হারানো মাধুর্য ভাব দিয়েই রাধা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছেন। মাধুর্য ভাব আবার দ্বিবিধ—স্বকীয়া এবং পরকীয়া। পরকীয়া প্রেমে রসের স্ফুরণ সর্বধিক। ব্রজগোপীগণসহ শ্রীরাধা সেই পরকীয়া প্রেমের চরম প্রতীক। শ্রীরাধিকাকে 'কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমনি' বলা হয়েছে। শ্রীরাধিকা হতেই কৃষ্ণ-কান্তাগণের বিস্তার। এই কৃষ্ণ-কান্তাগণ ত্রিবিধ : বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ, দ্বারকায় মহিষীগণ এবং ব্রজধামে ললিতাদি ব্রজাঙ্গনাগণ। লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার বৈভববিলাস অংশ রূপ, মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ এবং ব্রজগোপীগণ তাঁর কায় ব্যূহরূপ। শ্রীরাধা হ'তেই এই সকল কান্তাগণের বিস্তার কিন্তু কেউই শ্রীরাধার অনুরূপ নন। শ্রীরাধাই একমাত্র মহাভাব স্বরূপা—অন্য কোন কান্তার মধ্যে এই মহাভাবের লক্ষণ নেই।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি সর্বান্তঃকরণে কৃষ্ণ-প্রীতিই শ্রীরাধার লক্ষ্য। বহু কান্তা ব্যতীত কৃষ্ণ-প্রীতি এবং প্রেমোল্লাস সর্বোচ্চ-সীমা (Climax) স্পর্শ করতে পারে না—তাই এক রাধিকাই এই ত্রিবিধ বহু কান্তায় পরিণত হয়ে কৃষ্ণকে অনন্ত প্রেম-সম্ভারের বহু বিচিত্র লীলারসাস্বাদন করান।

রাধার প্রেমে এক দুর্বার শক্তির আছে—যে অদৃশ্য শক্তি নিরন্তর প্রবল ভাবে কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। রাধার এই অতলান্ত প্রেমের মাধুর্য উপলব্ধির জন্য কৃষ্ণ

আকুল। এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্যে তাঁকে গৌর রূপে অবতীর্ণ হ'তে হয়েছে। রাধার সে দুর্বার দুর্জয় প্রেমের মহিমা কেমন—যে প্রেম গুরু-রূপে শিষ্য কৃষ্ণকে নাচায়, যে প্রেম শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তি অবশ করে?

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

শ্রীভগবান চিন্তার গহন গভীরে তলিয়ে যান। তিনি হলেন রাধার প্রেমের বিষয় এবং সে প্রেমের আশ্রয় স্বয়ং রাধা। বিষয় জাতীয় সুখ (অর্থাৎ কৃষ্ণের আনন্দানুভূতি অপেক্ষা আশ্রয়-আহ্লাদ (অর্থাৎ রাধার প্রেমানন্দ) কোটিগুণ বেশী। রাধার প্রেমে যে আনন্দ কৃষ্ণ পান তদপেক্ষা কোটিগুণ বেশী সুখলাভ করেন শ্রীরাধা। রাধার এই অতল-স্পর্শী সুখ-সম্ভার আস্বাদন করার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ লালায়িত হয়ে ওঠেন:

আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥

এই উপায় নির্ণয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে গৌর অবতারে পুনরায় ধরায় অবতীর্ণ হ'তে হয়েছে। কেননা রাধার আনন্দানুভূতি আস্বাদন করতে গেলে মনে প্রাণে রাধা ভাবে না ভাবিত হলে সে আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়।

গৌর অবতারের দ্বিতীয় কারণ হলো কৃষ্ণের মধ্যে যে 'অদ্ভুত মাধুরিমা' আছে—যে মাধুরিমায় রাধা উন্মাদিনী, যে মাধুরিমা রাধাকে তীব্র ভাবে আকৃষ্ট করে সেই মহান কৃষ্ণ-মাধুরীর আস্বাদন। এখানেও এই মাধুরিমাকে আপন হৃদয়-মূলে গ্রহণ করতে হলে রাধা-রূপ গ্রহণ ছাড়া অন্য পথ নেই। কেননা আপনার ভিতর যে মাধুর্য আছে তা' তো আপনি স্বয়ং আস্বাদন করা যায় না। এ মাধুরিমায়, এই নধর দেহ-কান্তিতে রাধাই আকৃষ্ট হয়েছেন, শ্যামল-যৌবন-বনে রাধাই মন হারিয়েছেন—সুতরাং এই মন হারানোর আবেগ ও আনন্দ গ্রহণ করতে হলে রাধা ভাবই একমাত্র এবং অব্যর্থ অবলম্বন:

দর্পনাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারী॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥

কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণের আপনার অদ্ভুত মাধুরিমা আস্বাদন করার আকুলতাকে অন্যত্র বলেছেন—'আপানি আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।' গৌর রূপে

অবতীর্ণ হয়ে শ্রীভগবান নিরন্তর আপনার অপূর্ব মাধুর্য আপনি বিভোর হয়ে সর্বদা আস্বাদন করেছেন। গৌর রূপের অন্তরালে কৃষ্ণ-মাধুর্য-আস্বাদনই শত ভাব-ব্যঞ্জনায় আভাসিত হয়েছে।

গৌর-অবতারের তৃতীয় কারণ হলো কৃষ্ণের লীলামৃতে অবগাহন করে শ্রীরাধার সর্ব দেহে মনে যে অনন্ত সুখানুভূতি জাগ্রত হয় সেই মিলন জনিত পরম সুখ আস্বাদন করা। রাধার যে প্রেম তা' প্রাকৃত নয়—অপ্রাকৃত, তা' সকাম নয়—নিষ্কাম, তা আত্মেন্দ্রিয় নয়—কৃষ্ণেন্দ্রিয়। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে রাধার প্রেমেও 'কাম' ছিল কেননা তাঁকে 'কামেশ্বরী' বলা হয়েছে কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত এ কাম ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় কলঙ্কিত নয়—এ কাম মহাভাব স্বরূপা, স্বর্গীয় সংগীত-সুষমায় ঝংকৃত। এ কাম সকল প্রাকৃত জগতের গণ্ডী বিদীর্ণ করে—নির্মল অসীম প্রেমের দিকেই ইংগিত করে। শ্রীরাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী 'চন্দ্রাবলী'র প্রেমের মধ্যে লেশমাত্র আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা থাকায় তা' রাধিকার প্রেম অপেক্ষা নিকৃষ্ট। গোপীগণের বিশুদ্ধ প্রেমের আবেদনের কাছে শ্রীকৃষ্ণকে বারবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। কেননা গোপীগণের যে প্রেম তা' সম্পূর্ণ রূপে কৃষ্ণেন্দ্রিয়। আপনার অঙ্গকে সুসজ্জিত রাখলে কৃষ্ণের আনন্দ বর্ধিত হয় সুতরাং গোপীগণ আপনাদের আপন আপন অঙ্গের প্রতি যত্নবান :

আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এত সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ।।

অন্যত্র :

এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমার্পণ।
তার ধন তার এই সম্ভোগ সাধন ।।
এ-দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তাষণ।
এই লাগি করে দেহে মার্জ্জন ভূষণ ॥

গোপীগণের এই প্রেমে স্বকীয় কোন দুঃখানুভূতি বা সুখানুভূতি নেই—সকল কিছু কৃষ্ণেন্দ্রিয়। অদ্ভুত এই গোপীগণের নিষ্কাম প্রেম! কিন্তু এর মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা হলেন অদ্ভুততম :

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপেগুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকা ॥

নিষ্কাম প্রেমের ক্ষেত্রে রাধা এক বিরল-ব্যতিক্রম। কৃষ্ণই তাঁর আজীবনের ধ্যান স্বপ্ন। কৃষ্ণের প্রেমাস্বাদনে রাধা যে আনন্দ পান তার প্রকৃষ্ট উপমাস্থল একমাত্র রাধাই—স্বয়ং কৃষ্ণেও নন :

পরস্পর বেণুগীতে হবয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
আমার সঙ্গমে বাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥

মিলন জনিত এই অন্তহীন সুখের আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের একান্ত কামনার ধন। এই প্রেমাস্বাদনের আকাঙ্খা ক্রমবর্ধমান হয়েই চলেছে—এ কামনাবেগের যেন সমাপ্তি নেই :

নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥

এবং শেষ পর্যন্ত এই ক্রমবর্ধমান লোভের পরিসমাপ্তি ঘটেছে 'রাধভাবদ্যুতি সুবলিততনু' গৌর-অবতারের মধ্যে :

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেম রস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥

সাধারণের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস—নাম সংকীর্তন প্রচারের জন্যেই কলি যুগে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাব কিন্তু 'এহ বাহ্য'—রাধাভাব এবং অঙ্গকান্তি ধারণ করে গৌর-অবতারের মূল উদ্দেশ্যই হলো ভগবানের বহু আকাঙ্খিত এই তিন বাসনা অর্থাৎ রাধার তুলনা-বিরল বিচিত্র প্রেমের ঐকান্তিক আস্বাদন। এই প্রেমাস্বাদনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণের গৌর-রূপে অবতারের গুহ্য-সংকেত।

॥ তিন ॥

॥ চৈতন্যচরিতামৃতের উপাদন সংগ্রহ, ঐতিহাসিকতা এবং তার বিচার॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাবসানের প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর বহু বিখ্যাত গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত রচনা সুরু করেন। তিরোভাবের দীর্ঘ দিন পরে গ্রন্থ রচনা সুরু হওয়ায় সাধারণত আমাদের মনে গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনা সমূহের সত্যতা ও তাদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। কেননা সাধারণতঃ কোন মহামানবের মৃত্যুর পর তাঁর অপূর্ব জীবন কাহিনী লোক-মুখ-পরম্পরায় এমন অলৌকিক ও কিংবদন্তী মিশ্রিত হয়ে পড়ে যা' থেকে সঠিক সত্য-সার নিষ্কাষণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। বিশেষ করে চৈতন্যদেবের মত একজন অতিমানবের জীবন-লীলা সেই কিংবদন্তীর যুগে

বহুবিকৃত হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। আমাদের এই স্বাভাবিক সন্দেহ চৈতন্য-চরিতামৃতের ঐতিহাসিকতা বিচারে বোধহয় তীব্র হয়ে উঠ্‌তে পারবে না—কেননা মহাপ্রভুর তিরোধানের দীর্ঘদিন পর গ্রন্থখানি রচিত হলেও গ্রন্থের মধ্য-স্থিত প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনা সমালোচনার কষ্টি পাথরে পরীক্ষিত। মহাপ্রভুর দিব্য-জীবন-লীলা নিয়ে যতগুলি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেই পুস্তকারণ্যের মধ্যে ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে বোধহয় চরিতামৃতের দান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কেননা কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য-জীবন-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং বহু অভিজ্ঞ পণ্ডিতকুলের সংস্পর্শ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন এবং এত অধিক পরিমাণে মহাপ্রভুর জীবন-লীলা সম্বন্ধে গোস্বামীগণের তার্কিক-তাত্ত্বিকতার গর্ভজাত খাঁটি সত্যের সন্ধান পেয়ে ছিলেন যে তা' অন্য কোন চৈতন্য-জীবনীকারের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় রচিত অসংখ্য চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থের মর্ম-নির্যাস গ্রন্থ রচনার পূর্বেই কবিরাজ গোস্বামী গ্রহণ করেছিলেন। এ সবের উপরেও স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামী ছিলেন একাধারে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী, অনন্যসাধারণ পণ্ডিত, তত্ত্বজ্ঞানী এবং নিষ্ঠাবান ভক্ত-বৈষ্ণব। ফলে অসীম পাণ্ডিত্য এবং অগাধ চিন্তাশীল মন নিয়ে পরিণত বয়সে তিনি যে মহাকাব্য রচনা করেছেন তাতে অপরিণত মনের অসংযমী উচ্ছ্বাস এবং ফেনিল বাষ্পময় অংশ নেই বল্‌লেই চলে। তবে সকল স্থানেই যে ঘটনার ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয়েছে এমনও বলা চলে না—মাঝে মাঝে অতিরঞ্জন এবং অলৌকিতার স্পর্শ লেগেছে—এ সবের পরিচয় আমরা যথা স্থানে পাব—কিন্তু এ সকল ছাড়াও মোটামুটি ভাবে গ্রন্থখানিকে ঐতিহাসিক সত্যাধার বলা চলে। চৈতন্যচরিতামৃতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে :

ক ॥ শ্রীচৈতন্যের লীলা-প্রবাহ বা জীবন-ঘটনা

খ ॥ শ্রীচৈতন্য কর্তৃক বিভিন্ন তত্ত্বের বিশ্লেষণ—কৃষ্ণ-তত্ত্ব, সাধ্য-সাধন নির্ণয় ইত্যাদি।

কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং গ্রন্থমধ্যে ঘটনাংশের উপাদন সংগ্রহের জন্য প্রধানত: চারজন গ্রন্থকারের গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছিলেন :

১ ॥ স্বরূপ দামোদরের কড়চা

২ ॥ মুরারী গুপ্তের কড়চা

৩ ॥ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত

৪ ॥ কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। বলাবাহুল্য এই চার জনই কবিরাজ গোস্বামীর পূর্বে চৈতন্য-জীবনী লিখে স্বনাম ধন্য হয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই চারজনের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ আপন গ্রন্থের মধ্যে কবি কর্ণপুরের নাম একবারও উল্লেখ করেন নি।

এখন মহাপ্রভুর জীবনের বহু বিচিত্র ঘটনার উপাদান সংগ্রহের জন্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সেগুলি কতটা সত্য তা' নির্ণয় করার প্রশ্ন এসে পড়ে। কেননা মূল গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাই যদি সত্য না হয় তা' হলে চরিতামৃতে বর্ণিত ঘটনাগুলি মিথ্যা হ'তে বাধ্য। এখন আমরা উল্লিখিত চারটি গ্রন্থের ঐতিহাসিক সত্য-বিচারের চেষ্টা করব।

স্বরূপ দামোদরের কড়চা: চৈতন্যচরিতামৃতে আদি লীলার প্রথম পরিচ্ছেদে দশটি শ্লোক (৫-১৪) "তথাহি শ্রীস্বরূপ গোস্বামীকড়চায়" বলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু অনেকে আবার মনে করেন শ্লোকগুলি স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামীরই রচনা কিন্তু এখানে শ্লোক রচয়িতাকে নিয়ে তর্ক উঠ্‌লেও ঐ শ্লোকগুলির অতর্নিহিত তত্ত্বগুলি যে স্বরূপ দামোদর কর্তৃক নির্ণীত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ ছাড়া চৈতন্যচরিতামৃতের সেই বহুবিখ্যাত 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু' বা রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত মূর্তির লীলা বা তত্ত্ব স্বরূপ-দামোদর কর্তৃক লিখিত। প্রভুর অন্তলীলা সম্পর্কে স্বরূপদামোদরের উক্তি এবং মন্তব্য একান্ত ভাবে নির্ভরযোগ্য। কেননা শ্রীমন্‌মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ সমাপ্ত করে নীলাচলে ফিরে এলে স্বরূপ দামোদর তাঁর ঘনিষ্টতম সংস্পর্শে আসেন। তিনি মহাপ্রভুর বদনমণ্ডল অবলোকন করেই তাঁর গহন মনের জাগ্রত ভাব-ধারার পরিচয় পেতেন। অন্তলীলায় যখন মহাপ্রভুর উন্মাদ অবস্থা তখন তিনি স্বরূপেরই গলা ধরে ক্রন্দন করতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তো স্বরূপকে 'মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। যা হোক স্বরূপ ছিলেন বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, পরম ভক্ত-বৈষ্ণব আবার নিরপেক্ষ সমালোচকও। কেহ কোন পুস্তক রচনা করে আন্‌লে "স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু" শ্রবন করতেন। সুতরাং স্বরূপ এবং মহাপ্রভু যে কতটা একাত্ম ছিলেন তা' সহজেই অনুমেয়। দাক্ষিণাত্য হ'তে প্রত্যাবর্তনের পর মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থার

সময় স্বরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে ঘুরেছেন এবং চোখে চোখে রেখেছেন। সুতরাং মহাপ্রভুর অন্তলীলা সম্পর্কে স্বরূপের মত অভিজ্ঞ এবং প্রামাণিক ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নেই। এই স্বরূপ দমোদরই তাঁর গ্রন্থে অন্তলীলার যে ঘটনা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাই ছিল কবিরাজ গোস্বামীর প্রধান অবলম্বন—ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে স্বরূপ দামোদরে বর্ণিত ঘটনাসমূহ বহুমূল্য কহিনুর—এই ঘটনাপুঞ্জে কোন প্রকারের সন্দেহে-কালিমা লেপন করা চলে না।

মুরারী গুপ্তের কড়চা: চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামী আপন গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের জন্যে মুরারী গুপ্তের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। মুরারীগুপ্ত ছিলেন নবদ্বীপবাসী এবং মহাপ্রভুর সমসাময়িক। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত গৌরাঙ্গ-লীলার প্রায় সকল ঘটনার সাথে তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ পরিচিত—সুতরাং আদি লীলার ঘটনা বর্ণনায় মুরারী গুপ্তের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। তাঁর 'কড়চা'য় আদি লীলা সম্পর্কে তিনি যে বর্ণনা রেখে গেছেন তার বাস্তবতা সম্বন্ধে তাই কারো কোন সন্দেহ নেই। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আদিলীলার বহু ঘটনার উৎস-স্থল এই 'কড়চা'—সুতরাং সে সকল ঘটনারও ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোন ক্রমে উপেক্ষণীয় নয়।

বৃন্দাবন দাস: আপন গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের জন্যে চৈতন্য চরিতামৃতকার যে সকল ব্যক্তির নিকট বিশেষ রূপে ঋণী তাঁদের মধ্যে বৃন্দাবন দাসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের আদিলীলা এবং মধ্যলীলা বহু বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। কবিরাজ গোস্বামী 'চৈতন্য ভাগবতে' যে সকল ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে সেই ঘটনাগুলি বিস্তৃত ভাবে লিখেছেন এবং যে ঘটনাগুলি বিস্তৃত ভাবে আছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ দান করেছেন। মাঝে মাঝে বৃন্দবেন দাস বর্ণিত ঘটনা সমূহ কবিরাজ গোস্বামী নতুন রূপে বর্ণনা করেছেন। বলাবাহুল্য বৃন্দাবনের অসংখ্য পণ্ডিত গোস্বামীগণের সংস্পর্শে এসে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাস বর্ণিত যে সকল ঘটনাকে ভ্রম বলে মনে করে ছিলেন সেই গুলিকেই নতুন রূপে উপস্থাপিত করেছেন। সুতরাং এই নব উপস্থাপিত ঘটনা-সমূহ ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলি বৃন্দাবন দাসের ভ্রম সংশোধন ছাড়া আর কিছুই নয়। যে সকল ঘটনাকে কবি নতুন রূপে উপস্থাপিত করেছেন সেগুলির মধ্যে প্রধান হলো

কাজী দলন, চৈতন্যের পুরী গমন, সার্বভৌম উদ্ধার, প্রতাপ রুদ্রের প্রতি কৃপা ইত্যাদি—কাজী দলন প্রসঙ্গটিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ একেবারে ভেঙ্গে চুরে নতুন রূপ দান করেছেন।

কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' হ'তেও কবিরাজ গোস্বামী বহুতর ঘটনা গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থের এক স্থানে তিনি লিখেছেন:

দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ মিলন-লীলা করি যে প্রচারে॥

এই উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় কবিরাজ গোস্বামী রামানন্দ মিলন-লীলা স্বরূপ দামোদরের কড়চা-বর্ণিত ঘটনা হতে গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিমান বিহারী মজুমদার স্পষ্টই দেখিয়েছেন যে কবি কর্ণপুরের রচিত গ্রন্থ হ'তে ইংগিত পেয়েই কৃষ্ণদাস কবিরাজ রামানন্দ-চৈতন্য মিলন-লীলা বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গের মূল ঘটনা আন্তরিকতার গুণে যে ঐতিহাসিক রূপলাভ করেছে তা' কবিরাজ গোস্বামীর আপন সংযোজনা।

উল্লিখিত গ্রন্থকারের বিবিধ গ্রন্থ হ'তে কবিরাজ গোস্বামী যে আপন গ্রন্থের জন্যে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন সে বিষয়ে আর কোন প্রমাণ-পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে এমন অনেক ঘটনা আছে যা' অন্যত্র কোথাও উল্লিখিত হয় নি। এই অনুল্লিখিত ঘটনাগুলির ওপর অনৈতিহাসিকতা দোষ আরোপ করা ঠিক হ'বে না—কেনন! এগুলি যদিও পূর্বে কোথাও উল্লিখিত হয়নি তথাপি এগুলি অসত্য নয়—এগুলি হলো কবিরাজ গোস্বামীর তীব্র অনুসন্ধিৎসার অমৃতময় ফল!

কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা হ'তে জানা যায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁর স্ব-গৃহেই কেটেছে। স্ব-গৃহে থাকাকালীন তিনি মহাপ্রভুর জীবনের অনেক ঘটনা জান্‌তে পেরেছিলেন। তারপর তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশে বৃন্দাবনে আগমন করেন। বৃন্দাবনে আগমনের পর হতেই তাঁর সম্মুখে জ্ঞান সমুদ্রের আবরণ উন্মোচিত হয়ে গেল—এখানে এসেই তিনি লাভ করলেন শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট ইত্যাদি মনীষীগণের মহৎ সঙ্গ। এই মনীষীগণের অনেকেই মহাপ্রভুর জীবনের কোন কোন লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। এঁরা সকলেই বৃন্দাবনে সম্মিলিত ভাবে বসবাস করতেন এবং প্রত্যহ সমবেত ভাবে মহাপ্রভুর জীবনকথা

আলোচনা করতেন। কবিরাজ গোস্বামী ছিলেন সেই ভাব-সভার নীরব-শ্রোতা। বৃন্দাবনবাসী নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবগণের প্রতিদিনের আলাপ-আলোচনায় মহাপ্রভুর দিব্যজীবনের বহু অজ্ঞাত ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়তো। এ ছাড়াও কারো কোন ঘটনা বর্ণনার মধ্যে অতিরঞ্জন বা অমূলক কিছু থাকলে তাঁ' সমবেত শ্রোতামণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতো আর তার সংশোধন হওয়ার সুযোগ ঘটতো। এইভাবে প্রতিদিনের নিষ্ঠাপূর্ণ আলাপচারণায় সত্যানুসন্ধিৎসু বৈষ্ণবগণের মধ্য হ'তে গৌর-লীলার অন্তর্নিহিত পরীক্ষিত সত্য-স্বরূপটি প্রকাশিত হ'তো। কবিরাজ গোস্বামীর বিশালায়তন গ্রন্থে গৌরাঙ্গাবতারের যে মহান চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা' সত্যের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত এবং পরিমার্জিত বিচক্ষণ বৈষ্ণবগণের সেই খাঁটি রূপ-নির্যাস। সুতরাং কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের ঐতিহাসিক বিশুদ্ধি শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ-যোগ্য।

তথাপি গ্রন্থের মধ্যে এমন অনেক ঘটনা আছে যেগুলি ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে গ্রহণ করতে বিশেষ আপত্তিকর বলেই মনে হয়। এই ধরণের কয়েকটি ঘটনা আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি :

১॥ কবিকর্ণপুর আপন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তের মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন—কৃষ্ণদাসও আপন গ্রন্থে এই তের মাসের কথাই উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে মুরারী গুপ্ত এবং বৃন্দাবন দাস দশ মাসের কথাই উল্লেখ করেছেন এবং এটাই যে স্বাভাবিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

২॥ কবি কর্ণপুর এবং বৃন্দাবন দাস ছ' সাত বছরের শিশু নিমাইয়ের মুখ দিয়ে শুচি-অশুচির তত্ত্বের উল্লেখ করিয়েছেন। চৈতন্যচরিতামৃতেও দেখি কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখ দিয়ে সৎ-অসৎবাদ তত্ত্ব প্রচার করিয়েছেন এমন কি গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীর সাথে হাস্যপরিহাসের সময় 'বাল্য ভাব ছলে' ভাগবতের শ্লোক উচ্চারিত করিয়েছেন—"শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈল।" এ ঘটনাগুলি মহামানবের দোহাই দিলেও একটু অস্বাভাবিক মনে হয়।

৩॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা বহুবার পেয়েছি শ্রীচৈতন্যের 'গঙ্গা দেখে ভাবাবেশে যমুনা ভ্রম' হয়েছে। বৃন্দাবন দাস আপন কাব্যে কোথাও এই ভ্রমের কথা স্বীকার করেন নি। এবং তিনি এ উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট থেকে। সুতরাং বৃন্দাবন দাসের নিরবতাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

৪॥ গোপীনাথ মন্দিরে শ্রীচৈতন্যের কোন অলৌকিক কীর্তি-কলাপের কথা বৃন্দাবন দাস বলেন নি কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী এই প্রসঙ্গে অলৌকিকতার অবতারণা করেছেন।

৫॥ বৃন্দাবন দাস সাক্ষী গোপালের কাহিনী লেখেন নি—কৃষ্ণদাস গোস্বামী এটা গ্রহণ করেছেন কবি কর্ণপুরের নাটক হ'তে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা অনুযায়ী জানা যায় পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চিকাবেরী বিজয়কালে সাক্ষী গোপালকে নিয়ে এসে সত্য বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৬॥ আধুনিক সমালোচকের মন্তব্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে বলে মনে হয় এখানে আমরা উক্তিটির কিয়দংশ উদ্ধৃতি করছি: "কৃষ্ণদাসের অলৌকিক ঘটনার প্রতি ঝোঁক অত্যন্ত বেশী। তিনি পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থ অনুসরণ করিতে করিতে সহসা তাহার আনুগত্য ছাড়িয়া অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ করিয়াছেন। যথা—আদিলীলায় আম্র ভক্ষণলীলা, মধ্যলীলায় বৌদ্ধ পণ্ডিতের মাথা কাটা যাওয়া ও পুনরুজ্জীবন, কাশী মিত্র ও প্রতাপ রুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্তি বা ঐশ্বর্য্য দেখানো, রথাগ্রে কীর্তন করিতে করিতে এককালে সাতটি সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত, যে রথ মত্ত হস্তী টানিতে পারিত না তাহা শ্রীচৈতন্য কর্তৃক চালানো, আবির্ভাবরূপে শচীর অন্নখাওয়া, বৃন্দাবনের পথে যাইতে যাইতে বাঘ হরিণকে একসঙ্গে হরিনাম বলান, অন্তলীলায় ভাবাবেশে চৈতন্যের এক একখানি হাত দেড়গজ দীর্ঘ হওয়া, তিন দ্বারে কপাট লাগানো সত্বেও প্রভুর বাহির হইয়া যাওয়া ইত্যাদি। দিগ্বিজয়ী, পরাভব, প্রকাশানন্দ, উদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার ও তাঁহাদিগকে পরাভব করার ঐতিহাসিক ভিত্তি নিতান্ত দুর্বল। এইগুলি ছাড়া আদি ও মধ্যলীলায় বর্ণিত ঘটনাসমূহের মধ্যে অতি অল্প অংশই কবিরাজ গোস্বামীর মৌলিক অনুসন্ধানের ফল।

সমালোচকের এই মন্তব্যের একটিও হয় তো অসত্য নয়—কিন্তু চরিতামৃত্যের ঐতিহাসিকতা এইটুকু দিয়েই খণ্ডিত করা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে না। পণ্ডিতগণের পরাজয় সম্পর্কে সমালোচক যে কথা বলেছেন তার বিরুদ্ধ প্রমাণে আমরা এখানে সার্বভৌম পরাজয়-প্রসঙ্গটি উত্থাপন করছি। চৈতন্য-ভাগবতকার শ্রীবৃন্দাবনদাস এক দিনেই সার্বভৌম উদ্ধারপর্ব শেষ করেছেন কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই উদ্ধার পর্বটিকে বার দিন দীর্ঘায়িত করেছেন।

সার্বভৌমের মত একজন তৎকালীন ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিতকে একদিনেই মতান্তরিত করার পিছনে যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল—কতকটা অলৌকিক বলেই মনে হয়। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ সুদীর্ঘ বারদিন সময় নিয়ে ধীরে ধীরে গর্বোদ্ধত সার্বভৌমের উন্নত মস্তককে মহাপ্রভুর চরণতলে লুটিয়ে দিয়েছেন—এখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য।

এই গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন: "বাস্তব লীলার বর্ণনায় যিনি ঐতিহাসিকের ন্যায় প্রায় প্রতি-ক্ষেত্রে উৎস-উদ্ধার (Authority Quote) করেছেন, নৈয়ায়িকের মত তর্ক করেছেন, বৈদান্তিকের মত করেছেন তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা, ভক্তি-নিষ্ঠ বিশ্বাসে তিনিই অলৌকিক কাহিনীর পর কাহিনীর জাল বুনে গেছেন। এই ভক্তি-নিষ্ঠার প্রভাবেই অলৌকিক কাহিনী লৌকিক কাহিনীর সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যুক্তি তথ্য-সংবদ্ধ ইতিহাস-দর্শন ভক্তি-রসোত্তীর্ণ হয়েছে। চৈতন্য-চরিতামৃত বাংলা ভাষায় লিখিত বাঙালীর ঐতিহাসিক-দর্শনিক চেতনার প্রথম সার্থক প্রকাশ।" ডাঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য: "চৈতন্য-চরিত হিসাবে কি ঐতিহাসিকতত্ত্ব, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তত্ত্ববিচার সব দিক দিয়াই চৈতন্যচরিতামৃত শ্রেষ্ঠ।"

বস্তুতঃ গ্রন্থের মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিকতা থাকলেও ঐতিহাসিকতার কিছু অপলাপ লক্ষ্য করা গেলেও যে মহান সত্যানুসন্ধিৎসু এবং সত্যনিষ্ঠাএই গ্রন্থ রচনার অন্তরালে বেগ সঞ্চার করেছে তাকে তো অস্বীকার করা যায় না কোন মতেই। এবং এই সত্যনিষ্ঠার জন্যেই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক ভিত্তিতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন-বেদ হয়ে উঠেছে।

॥ চার ॥

॥ চৈতন্য-রামানন্দ আলোচনা এবং কান্তাপ্রেম বা রাগানুগাভক্তি ॥

বিপুল-বিস্তারী চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভু এবং রায় রামানন্দের আলাপচারণার মাধ্যমে বৈষ্ণবীয় সাধন-তত্ত্বে উজ্জ্বল বা মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব অভিনব রূপে প্রতিপন্ন করেছেন। ভারতীয় সাধন-তত্ত্বে ভাগবত সাধনার তিনটি পথ—জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তির পথ। জ্ঞানের পথে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বরাশি বিদীর্ণ করে শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠা করেছেন অদ্বৈতবাদের। অদ্বৈতবাদের মূল কথা হলো জীবএবং ভগবানের

মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। জীব এবং ভগবান এক এবং অভিন্ন। 'সোঽহং' অর্থাৎ আমিই সেই। বলাবাহুল্য জ্ঞানের পথ হলো বিচার বিশ্লেষণের পথ। গীতা হলো কর্ম-পথের নির্দেশশিকা। কর্মমার্গের সকল তত্ত্বকথাই গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। গীতার ধর্ম নিষ্কাম ধর্ম—অর্থাৎ কোন কিছু আমার নয়—সব সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার। তিনি করান আমরা করি—কর্ম আমাদের করণীয় কিন্তু ফললাভে আকাঙ্ক্ষিত নই। কর্মের সকল ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করাই হলো গীতার নিষ্কাম ধর্ম। কিন্তু বৈষ্ণব-সাধকেরা এই জ্ঞান বা কর্মের কোন সাধন-পথে পদচারণা করেন নি—তাঁদের যাত্রা ভক্তির পথে, তাঁরা প্রেমের পথে প্রেমোন্মত্ত পাগল পথিক। প্রেমের অভিনব রহস্যময় আলোকে আপন হৃদয়মূলে তাঁরা পেতে চেয়েছেন ভগবানের লীলা-স্পর্শ। জ্ঞান বা কর্ম দিয়ে ভগবানকে পাওয়া গেলেও সে পাওয়ার মধ্যে 'পরম পাওয়া'র ভাব নেই। প্রেমের পেলব-মসৃণ পথে পদচারণা করে এই 'পরম-পাওয়া' হলো বৈষ্ণব সাধকের লক্ষ্য। রায়রামানন্দের সাথে 'মহাপ্রভুর কথোপকথনের মাঝে মাধুর্যরসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই 'পরম পাওয়ার' কথা নতুন আলোকে ঝলকিত হয়ে উঠেছে।

রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্যে মহাপ্রভু সাধ্যের সাধনতত্ত্ব জানতে চান: 'প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।' উত্তরে রামানন্দ জানান যে স্বধর্মাচারণের মাধ্যমেই বিষ্ণুভক্তি হয়। কিন্তু মহাপ্রভু 'এহ বাহ্য' বলে রামানন্দের এই মন্তব্যে কোন গুরুত্ব দান করেন নি। এর পরেই রামানন্দ গীতার কর্মবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। কিন্তু এই কর্মবাদের মধ্যেও ভগবানের সাথে ভক্তের আন্তরিক ভক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হয় না বলেই:

প্রভু বলে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্মত্যাগ ভক্তিসাধ্য সার॥

এই ভাবে মহাপ্রভু কর্তৃক পর পর স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্র ভক্তি উপেক্ষিত হওয়ার পর যখন রায় জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা উল্লেখ করেন তখন মহাপ্রভু 'এহ বাহ্য' বলে উড়িয়ে না দিয়ে 'এহ হয়' বলে এই ভক্তির উপর কিঞ্চিৎ গুরুত্ব আরোপ করেন। কেননা জ্ঞানশূন্য ভক্তি শ্রদ্ধাভক্তিরই অন্তর্গত। এরপর রামানন্দ শান্ত, দাস্য প্রভৃতি ভক্তির কথা উল্লেখ করে সখ্য এবং বাৎসল্য প্রেমের কথা উত্থাপন করেন তখন মহাপ্রভু 'এহোত্তম' বলে সখ্য

এবং বাৎসল্য প্রেম ভজনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু 'আগে কহ আর' কথাটি এখনো মহাপ্রভুর মুখনিস্থত বাণী হয়ে রয়েছে। অবশেষে যখন রামানন্দ কান্তা প্রেমের কথা উল্লেখ করেন তখন মহাপ্রভুর বদন হ'তে এই বাণীটিও অবলুপ্ত হয়—অর্থাৎ কান্তাপ্রেমই হলো 'সর্বসাধ্য সার' কৃষ্ণপ্রাপ্তির শেষতম উপায়। এখন আমাদের বিচার করে দেখ্‌তে হবে এই কান্তাপ্রেম কেমন ভাবে এবং কেন সকল প্রেম হতে শ্রেষ্ঠ।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বৈষ্ণব সাধকেরা জ্ঞান এবং কর্মের পথে পদচারণা করেন নি—অদ্বয় তত্ত্বও তাই বৈষ্ণব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। অদ্বয়-তত্ত্বের অন্তর্নিহিত মর্ম-বাণী হলো জীব এবং ভগবান এক—উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই কিন্তু বৈষ্ণব সাধকের মতে "জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে, ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে সর্বদাই একটা প্রচ্ছন্ন ভেদাভেদ সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। জ্ঞেয় বস্তু যতক্ষণ জ্ঞাতার সঙ্গে এক না হয় ততক্ষণ জ্ঞান পূর্ণ হয় না, আবার ভিন্ন না হইলেও জ্ঞান সম্ভব হয় না।" ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কিছু ব্যবধান না থাক্‌লে মিলন কখনো সর্বসুখের হতে পারে না। পৃথক সত্বার সাথে মিলিত হয়ে যে এক যুগল অদ্বয় মধুর মূর্তি গড়ে ওঠে—প্রেমের উল্লাস, মিলনের পরিপূর্ণতা তো সেখানেই। কিন্তু অদ্বয়বাদীরা ভক্ত ও ভগবানকে এক করে এই মহান মিলনের পথ রুদ্ধ করেছেন। বৈষ্ণব-সাধকেরা এখানেই জ্ঞানমার্গের অদ্বয়তত্ত্ব হ'তে সরে এসে ভিন্ন পথে পদচারণা করে কল্পনা করেছেন অচিন্ত্য-ভেদাভেদের—অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবান এক নয় আবার এক, ভিন্ন নয় আবার ভিন্ন। জ্ঞান ও কর্মের সাধনায় কোন আবেগ নেই, কোন অন্তর্গূঢ় আকর্ষণও ভিতর হতে তীব্র হয়ে ওঠে না—কিন্তু বৈষ্ণব-সাধকগণ যে প্রেমের পথে পদচারণা করেছেন সেই প্রেম-সাধনার মধ্যে আছে এক দুর্বার মিলনাকাঙ্ক্ষা আছে এক অসীম প্রণয়াবেগ। অজানিতে সমগ্র মন-প্রাণ এক অন্তহীন বিপুল আকর্ষণে উদ্বেল হয়ে ওঠে। এক অজানা রহস্যময় আকুল আবেদনই এই প্রেম সাধনার ধারাটিকে রোমাঞ্চ রঙীন করে তোলে। এবং এই পথের চরম সীমায় যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি তা' সেই মধুরতম মিলন। লৌকিক প্রেমের বসে যখন 'প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর বন্ধু আপনার সার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে" তখন এই লৌকিক

প্রেমের বুকেই সীমাতিক্রমীলোকাতীত এক বিপুল স্বর্গীয় ঐশ্বর্য ধ্বনিত হয়ে ওঠে। প্রেমের চরম সার্থকতা তো এখানেই।

বৈষ্ণব সাধকেরা প্রেম-সাধনায় ক্রম-পরিণতির স্তরে প্রেমকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর।

শান্ত প্রেমের উপাসনায় কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় এবং এ প্রেমে ঐকান্তিক নিষ্ঠাও আছে—কিন্তু এ প্রেম হলো মমতাগন্ধহীন—ঐশ্বর্য-শিথিল। সর্বান্তকরণে কৃষ্ণকে আপনার ভাবা কিংবা কৃষ্ণ-বিরহে আপনার বক্ষে হাহাকার ধ্বনির তীব্রবেগ অনুভব করা এসব কোন কিছুই শান্ত রতিতে নেই।

দাস্য প্রেমে শান্তের ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে সম্মিলিত হয় মমতাবুদ্ধি বা সেবা। নিজেকে দাস ভেবে কৃষ্ণের সেবা করাই হলো দাস্য প্রেমের মুখ্য উদ্দেশ্য। কৃষ্ণ প্রভু আমি দাস, সুতরাং দাস্য প্রেমে আছে ভগবান ভক্তের প্রভু দাসের সম্পর্ক। শান্ত রতি কেবল ঐকান্তিক নিষ্ঠায় পর্যবসিত—কিন্তু দাস্যে শান্তের ঐকান্তিকী নিষ্ঠার সাথে ঐকান্তিকী সেবা মিলিত হওয়া শান্ত রতি অপেক্ষা দাস্য রতি উচ্চতর। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই শান্ত দাস্য এই উভয় প্রেমই ঐশ্বর্য-শিথিল। ভগবান বলেন 'ঈশ্বর্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীতি'। শান্ত এবং দাস্য রতি গাঢ় হয়ে প্রেমে পরিণতি লাভ করতে পারে কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান প্রেমের বিভিন্ন স্তরে যে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহা-ভাবের সৃষ্টি হয়—শান্ত এবং দাস্য রতিতে প্রেমের সেই উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।

দাস্যে নিজেকে দাস ভেবে সর্বদা প্রভু অপেক্ষা নিজেকে ছোট করে রাখা হয়—কিন্তু সখ্য প্রেমে ভক্ত এবং ভগবান সমান। সেখানে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণ ও সুবলের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না—পণ রেখে খেলায় সুবল হেরে গেলে কৃষ্ণকে আপনার স্কন্ধে বহন করে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করেছেন আবার কৃষ্ণ হেরে গেলে আপনার স্কন্ধে সুবলকে নিয়ে অনুরূপে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে পণ রক্ষা করেছেন। সুবলের পদযুগলের স্পর্শ হয়তো শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে লেগেছে কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি নেই—এখানে যে সুবল কৃষ্ণ সমান, ভক্ত-ভগবান অভিন্ন। তাই এই প্রেমকে তো আর 'এহ্ হয়' বলে বিশেষ গুরুত্ব না নিয়ে উপেক্ষা করা যায় না—মহাপ্রভুর মুখে তাই তো এ প্রেম 'এহোত্তম' হয়ে উঠেছে। এ প্রেম শান্ত

এবং দাস্য থেকে উন্নত কেন না শান্তের ঐকান্তিকী নিষ্ঠা এবং দাস্যের সেবার সাথে মিলিত হয়েছে সখ্যের সংকোচহীনতা। দাসপ্রভুর মধ্যেকার সম্বন্ধ দূরে সরিয়ে ভগবান ভক্তের নিকট এক সমভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাইতো শুনি সখ্য রতিতে ভগবানের বশ্যতা স্বীকারের ঘোষণা ঃ

মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান।।

বাৎসল্য প্রেম সখ্য প্রেম অপেক্ষা অধিকতর উচ্চস্তরের। এখানে আর ভক্ত ভগবান সমান নয়—ভগবানকে নিয়ে ফেলে ভক্ত উচ্চাসনে আসীন হয়েছেন। বাৎসল্য রতিতে প্রেমের আধিক্য হেতু মমতার সাথে এসেছে তাড়ন এবং ভর্ৎসনা-জ্ঞান।

ভক্ত এখানে পালক ভগবান পাল্য—সুতরাং তাড়ন ভর্ৎসন বিচিত্র নয়। বাৎসল্যে শান্ত, সখ্য, দাস্য এবং বাৎসল্য এই চার রসের মিলন হওয়ায় 'চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান' হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বাৎসল্য প্রেমও প্রেমসাধনায় প্রান্ত-সীমা স্পর্শ করতে পারে না। বাৎসল্য রতি বর্ধিত হয়ে রাগ পর্যন্ত উঠ্‌তে পারে কিন্তু প্রেমের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ-ক্ষেত্র ভাব এবং মহাভাব পর্যন্ত ওঠার সামর্থ এ প্রেমের নেই। কেবলমাত্র কান্তাপ্রেমের পথ বেয়েই প্রেমের শেষতম পর্যায় সমাভাবে ওঠা সম্ভব। কান্তা-প্রেম তাই 'সর্বোত্তম' বা 'সবসাধ্যসার'। কান্তা প্রেমের অসীমলোকে আপনপর সকল ভেদাভেদ দূরীভূত হয়—বেদধর্ম, লোকধর্ম, কুলধর্ম, দেহ, গেহ, স্বজন সকল কিছুই ত্যাজ্য হয়ে কৃষ্ণপ্রাপ্তি পরম আকাঙ্খার হয়ে ওঠে। কান্তা প্রেমে শান্তের ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সংকোচ-হীনতা, বাৎসল্যের লালন-পালন সকলই আছে উপরন্ত আছে এক দুর্লভ আত্মদান যা' আর কোন রতিতে নেই। আপনার কান্তি দিয়ে অর্থাৎ অঙ্গ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা একমাত্র কান্তাপ্রেমেই বর্তমান এখানে ভক্ত ও ভগবান চরম আকর্ষণে পরম পুলকে 'বিপুল নীড়ে' মিলিত হন—এ মিলন জ্ঞান ও কর্মের তার্কিক-তাত্ত্বিকতার কষ্টসাধ্য মিলন নয়,—এ মিলন হৃদয়াবেগের রসলোকে। তাই তো ঃ

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।"

এ পথ সাধন-ভজনের নয়, এ পথ কষ্ট-সাধ্য নয়,—ভক্তের অঙ্গ-কান্তিতে ভগবান আপনি এসে সম্মিলিত হ'তে বাধ্য ঃ

আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন
সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥

কিন্তু ভক্ত যখন ভগবানকে বড় মনে করেন :

আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥

কান্তাপ্রেমের চরম প্রাপ্তি মহাভাব—রাধা হলেন সেই মহাভাবরূপা। এই মহাভাব আর অন্য কারো পক্ষে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। 'রাধাভাবের' সাধনাই কৃষ্ণপ্রাপ্তির চরম উপায়। রাধাকৃষ্ণ সেবার মানস হ'তেই রাধার ভাবের জন্ম। সখীগণও আপনার অঙ্গ দিয়ে কৃষ্ণ-পরিতুষ্টি করেছেন—তাঁরাও কান্তা প্রেমের অভিসারিকা। বাংলার বৈষ্ণব-কবিগণ যুগযুগান্তর ধরে কান্তাপ্রেমের অভিসারিকা হয়ে ছুটে চলেছেন অনন্তের পথে—আপনার মানস-বৃন্দাবনে তাঁরা সখীত্বের শঙ্কিত আবেদন নিয়ে নিয়োজিত হয়েছেন কৃষ্ণ-লীলা আস্বাদনে। ভক্তের আকুল আহ্বানে ভগবানও মিলনোন্মুখ। কান্তাপ্রেমের মাধুর্য আস্বাদনের জন্যে ভগবান কাঙালের মত ছুটে এসেছেন বৈকুণ্ঠধাম ছেড়ে মর্তের ধূলি-মালিন্যের মাঝে, গৌরাঙ্গাবতারের মূল প্রয়োজন তো এই কান্ত প্রেমের সুকোমল মহিমাময় আস্বাদন। এই কান্তাপ্রেম বা রাগানুগা ভক্তির বৈষ্ণব ধর্মকে মহিমাময়, রসান্বিত এবং চিরন্তন করে তুলেছেন। কান্তাপ্রেম বা রাগানুগা ভক্তির সাধনায় শ্রীরাধা অদ্বিতীয় আর গৌরাঙ্গ হলেন এই প্রেম-সাধনার বিশাল সাম্রাজ্যে অতৃতীয়।

॥ পাঁচ ॥

॥ দর্শন, কাব্য এবং চরিত-গ্রন্থ হিসাবে চরিতামৃত : চরিতাংশ অপেক্ষা অমৃতাংশের প্রাধান্য ॥

বিশালায়তন চৈতন্যচরিতামৃতকে নিয়ে ভিন্ন মহলে অসংখ্য মতবাদ গড়ে উঠেছে। তথ্য জিজ্ঞাসু পাঠকেরা চৈতন্যচরিত গ্রন্থ হিসেবে চৈতন্যচরিতামৃতকে উচ্চাসন দান করেছেন, তত্ত্বপিপাসু পাঠকেরা নিকট গ্রন্থখানির দার্শনিক মূল্য অসীম আবার রসলিপ্সু পাঠকেরা গ্রন্থের মর্মমূলে কাব্যের অভিনব স্পন্দনে চমৎকৃত হয়েছেন। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন আমাকে যে যেভাবে উপাসনা করে সে সেই-ভাবে পায়। আমরাও বলি চৈতন্যচরিতামৃত এমনি একখানি গ্রন্থ একে যিনি যে দৃষ্টিতে দেখেন সেইভাবে উপভোগ করতে পারেন।

চৈতন্যচরিতামৃত যেন জীবনী, দর্শন, এবং কাব্যের মূলধনে গঠিত যৌথ-শিল্প। এককভাবে চরিতামৃত 'কারো খাস দখলে নেই—চরিতামৃত সর্ব-সাধারণের। কিন্তু বিরূপ মন্তব্যও বিরল নয়। এ প্রসঙ্গে বাংলার একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদের কথা মনে পড়েছে: 'সাজার মা গঙ্গা পায় না'—অর্থাৎ যে জিনিষটি সর্ব-সাধারণের হয়ে ওঠে সেটি পরিপূর্ণরূপে কাকেও তৃপ্তি দিতে পারে না। ফলে তার সকল আবেদন ব্যর্থ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কেউ বলেছেন চরিতামৃত খাঁটি জীবনী-গ্রন্থ হ'তে পারেনি, পূর্ণতত্ত্ব-গ্রন্থও নয়, কাব্য তো নয়-ই। আবার কেউ কেউ গ্রন্থে সন্নিবেশিত তত্ত্ব-প্রচারের বহুল-প্রয়াস লক্ষ্য করে—চরিতাংশ অপেক্ষা অমৃতাংশের গুরুভারে গ্রন্থখানি পীড়িত—এরূপ মন্তব্যও করেছেন। এখন এই আপাতবিরোধী অসংখ্য বিরূপ-মতবাদের কঠিন-ব্যূহ-বিদীর্ণ করে সত্য-স্বরূপ আমাদের উদ্ধার করতে হবে।

চরিতাংশ: এই বিশালায়তন গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী যে একজন বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি সে বিষয়ে কাহার দ্বিমত নেই। বস্তুতঃ কবিরাজ গোস্বামীর দৃষ্টি ছিল তত্ত্ব পিপাসুর আর তথ্য-লিপ্সু হলো ঐতিহাসিকের। গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা বিচারে আমরা কবিরাজ গোস্বামীর তথ্য-পিপাসু দৃষ্টির সম্যক পরিচয় লাভ করেছি। ভাবাবেগে তিনি গ্রন্থের মধ্যে বাষ্পময় অংশের প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র দেননি—বৃন্দাবনের অসংখ্য নিষ্ঠাবান ভক্ত-বৈষ্ণব গোস্বামীগণের সদাজাগ্রত দৃষ্টিতে পরীক্ষিত খাঁটি সত্যের মর্ম-নির্যাসেই তিনি আপনার গ্রন্থখানিকে সুরভিত করেছেন।

জীবনী গ্রন্থের প্রধান লক্ষণ হলো জীবনের প্রবহমান ঘটনাপুঞ্জের সার-সংকলন। এই দৃষ্টি ভংগীতেও চৈতন্য-চরিতামৃত উৎকৃষ্ট জীবনী-গ্রন্থ। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর জীবন-লীলাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য চরিত-গ্রন্থই রচিত হয়েছে কিন্তু বল্‌তে বাধা নেই একটি গ্রন্থও জীবনী-গ্রন্থ হিসেবে পূর্ণাঙ্গ নয়। চৈতন্য চরিতামৃতের পূর্বে মহাপ্রভুর বহিরঙ্গ জীবনের অসীম ঘটনা প্রবাহকে একত্রিত করে কোন সুসংবদ্ধ পুস্তক লিখিত বা সংকলিত হয়নি—পূর্বসুরীগণের প্রতিটি পুস্তক ছিল অসম্পূর্ণ। মুরারিগুপ্তের কড়চা, রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর স্তবাবলী, রূপগোস্বামীর স্তবমালা, কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি অসংখ্য গ্রন্থের একটিও

মহাপ্রভুর দিব্য-জীবনের পূর্ণ চিত্রন নয়—প্রতিটি গ্রন্থই অখণ্ড জীবন-লীলার খণ্ডরূপ মাত্র। কবিরাজ গোস্বামী এই সমস্ত গ্রন্থ হতে অসংখ্য উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সুতরাং এ সকল গ্রন্থে যা আছে চরিতামৃতে তো তা আছেই উপরন্তু তিনি আপন গ্রন্থে মহাপ্রভুর জীবনের এমন অনেক ঘটনা সংযোজনা করেছেন যা' অন্য কোন গ্রন্থে নেই। ঘটনা প্রবাহের ভিতর দিয়ে সমগ্র চৈতন্য-জীবনের স্বরূপটি একমাত্র আমরা চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যেই দেখ্‌তে পাই। মহাপ্রভুর বাল্যলীলার বিবাহ, সন্ন্যাস, তীর্থ পর্যটন, নীলাচলে স্থিতি, নিখিল ভারতে প্রেম ধর্মের প্রচার এবং সর্বোপরি শেষ জীবনের দিব্যোন্মাদ অবস্থা প্রভৃতি অসংখ্য ঘটনার ভিতর দিয়ে মহাপ্রভুর সমগ্র জীবনটি যেন অনবদ্য হয়ে উঠেছে। তথ্য-সংগ্রহ হিসেবে চরিতামৃতের অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা কোন দিনই ক্ষুণ্ণ হবার নয়॥

তত্ত্বাংশ : চৈতন্যচরিতামৃতকে জীবনী বা রচিত কাব্য বলার বিপক্ষে সর্বপেক্ষা বড় যুক্তি হলো অলৌকিকতা এবং তত্ত্ব প্রচার। গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই তত্ত্বের এমন বহুল প্রচার হয়েছে যে গ্রন্থখানিকে জীবনী-কাব্য বল্‌তে আমাদের মন যেন কোন মতেই সায় দেয় না। বাস্তবিক পক্ষে জীবনীর মধ্যে যদি তত্ত্বের বাহুল্য এসে পড়ে জীবনী কাব্য হিসেবে তার মূল্য অনেকখানি ন্যুন হয়ে পড়ে। কিন্তু তত্ত্বের এই বাহুল্যে শ্রীচৈতন্যের জীবন-মহিমা ম্লান হয়ে গেছে যদি এমন মনে করি তা হলে বোধহয় আমাদের ভুল করা হবে। কেননা ধর্মোন্মাদ মহাপুরুষদের জীবনই তাঁদের বাণী। জীবন ও বাণী পৃথক নয়—এক এবং অভিন্ন। সাধারণ লোকের ক্ষেত্র জীবন এবং বাণী তেল-জলের মত পৃথক—একত্রে অবস্থান করেও তাদের পৃথক সত্তা বিঘোষিত হয় কিন্তু মহামানবদের ক্ষেত্রে জীবন এবং বাণী দুধ জলের মত অবিচ্ছেদ্য—সেখানে জীবন এবং বাণী, তথ্য এবং তত্ত্ব একাত্মরূপে অনন্যসুন্দর হয়ে ওঠে। যীশু-খৃষ্টের জীবন ও বাণীতে পার্থক্য রচনা করবে কে ? হজরত মোহাম্মদের বাণী ও কর্মকে পৃথকরূপে চিন্তা করার শক্তি আমাদের নেই। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর জীবন এবং বাণীও তাই অবিচ্ছেদ্য—তথ্য এবং তত্ত্ব এক। তত্ত্বের মধ্যেই তথ্যের উজ্জ্বল প্রকাশ। সেইজন্য জীবন-বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে নিয়তির মত অনিবার্য রূপে তত্ত্ব-রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। বৈষ্ণবধর্মের পরিপোষক অসংখ্য শ্লোক কবিরাজ আপন গ্রন্থ মধ্যে উদ্ধৃত করেছেন। রাধা-কৃষ্ণকে

অবলম্বন করে যে বৈষ্ণবীয় প্রেম-ধর্মের উদ্ভব সেই রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব কবিরাজ গোস্বামী অনবদ্যরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। গৌরাঙ্গ-অবতারের মূল তত্ত্বটি তিনি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে সেখানে তত্ত্ব-পিপাসুদের চঞ্চল মনের চাঞ্চল্য স্তম্ভিত হয়ে যায়, সেই অভিনব তত্ত্ব-ব্যাখ্যার অনন্ত রসাস্বাদন করে তাঁরা নীরব হয়ে পড়েন। বৈদান্তিকের মত খণ্ডনের সময় সার্বভৌমের সাথে মহাপ্রভুর কথাবার্তায় প্রেম-ধর্মের যে অনন্য সুন্দর তত্ত্ব রূপটি ফুটে উঠেছে সেখানে সাধারণ পাঠক পর্যন্তও বিস্ময়ে নির্বাক হয়। কান্তা-প্রেম-তত্ত্ব, রূপ-সনাতনের শিক্ষাদানের সময় সে সকল অন্তর্গূঢ় তত্ত্বকথা প্রকাশিত হয়েছে সে সকল একাধারে যেমন গৌরাঙ্গ জীবন মহিমাকে সুন্দর করেছে তেমনি আলোড়ন-স্পন্দনে উদ্বেলিত করেছে তত্ত্ব-লিপ্সু পাঠক-চিত্তকে। সুতরাং এই তত্ত্ব-প্রকাশ জীবন-মহিমাকে তো ক্ষুণ্ণ করেই নি বরং গৌরাঙ্গ প্রভুর অপরিসীম জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়ে তাঁর মহান স্বরূপটি আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছে। অবশ্য মাঝে মাঝে তত্ত্বের দুরূহ চাপে এবং দীর্ঘায়িত ব্যাখ্যায় জীবন-চিত্রের সাবলীল রেখাঙ্কন যেন দীর্ঘ সময় স্তব্ধ হয়ে থাকে, তত্ত্বালোচনার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান জীবন-প্রবাহ যেন রুদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য এদিক দিয়ে বিচার করলে অর্থাৎ জীবনী এবং তত্ত্বকে পৃথক ভাবে দেখলে চরিতাংশ অপেক্ষা অমৃতাংশের প্রাধান্যই সূচিত হবে। বিশালায়তান চরিতামৃতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশই তত্ত্ব-ব্যাখ্যা।

কাব্যাংশঃ কবিরাজ গোস্বামী যে কত বড় প্রতিভাবন কবি ছিলেন চৈতন্যচরিতামৃতই তার একমাত্র প্রমাণ। এর মধ্যে তিনি বহুবিধ তথ্য এবং তত্ত্বের আলোচনা করেছেন কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে সকল তথ্য ও তত্ত্বকথার—উপরে আছে চৈতন্যচরিতামৃতকারের সদাজাগ্রত মহান কবি-প্রতিভা। "প্রেম যে পুরুষার্থ শিরোমণি, নরলীলাই যে শ্রেষ্ঠলীলা, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা যে কাম নয়—প্রেম, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছাই যে কাম, রাগানুগা অহৈতুকী ভক্তিই যে সাধক-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য, জ্ঞানের চেয়ে প্রেমই যে ঢের বড়, কেবলা রতি যে ঐশ্বর্যহীন, ভুক্তি-স্পৃহার মত মুক্তি-স্পৃহাও যে যে বর্জনীয়" ইত্যাদি অসংখ্য জটিল তত্ত্বের মধ্য হ'তে কাব্য-প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক-স্পর্শে তিনি সকল জটিলতাকে দূরে সরিয়ে সাবলীল ও সহজ করে তুলেছেন। এই দুরূহ তত্ত্বকথাকে তিনি সজীব-প্রায় করে গণচিত্তের

কাছে আবেদনশীল করে তুলেছেন উপমা-অলংকারের অভিনব প্রয়োগে। কাব্যের রস নিষ্পত্তির ব্যাপারে এই উপমা অলংকারের প্রয়োগ মন্ত্রের মত কাজ করেছে। ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধের প্রকাশে কবিরাজ-গোস্বামী বলেছেন ঃ

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস অস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

ভক্ত ও ভগবানের মধ্যকার সম্বন্ধ এত অল্প কথায় অথচ এত সুন্দরভাবে আর কে বলেছেন? মৃগনাভি এবং তার গন্ধ, অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি এই দুই উপমার ভিতর দিয়ে ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধটি অনবদ্য হয়ে উঠেছে।
সাংকেতিক ভাষণ এই কাব্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ। একটু মাত্র আভাস, একটুমাত্র ইংগিত দিয়েই কবি অখণ্ড ধ্যান-চিন্তাকে প্রকাশ করেছেন। কাম এবং প্রেমের চিরন্তন পার্থক্যটিকে বোধহয় কৃষ্ণদাসের মত সংকেত-তীর্যক ভাবণে আর কেউ প্রকাশ করতে পারেননি ঃ

আত্মেন্দ্রিয় প্রাতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রাতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

কাব্যের বহুস্থানেই এমন সাংকেতিক অর্থ-গূঢ় ভাষণ অনবদ্য হয়ে উঠেছে।
কাব্যের প্রাণ যে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা তা একাব্যে বিরল নয়—ব্যঞ্জন-গর্ভ অভিনব প্রকাশ এ কাব্যের আপাতঃ-রূঢ় অঙ্গকে লাবণ্য-দীপ্ত করে তুলেছে। মহাভাবস্বরূপা রাধা ঠাকুরাণীর অভিনব চিত্র বাস্তবে অঙ্কিত করা কথনো সম্ভব নয়—সে তো এই ব্যঞ্জন-দীপ্ত রেখাঙ্কনে সীমিত।
মহাপ্রভুর বাল্য-লীলাঙ্কনে কবিরাজ গোস্বামী উচ্চস্তরের কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। 'ভাগীরথীর তীরে দুরন্ত নিমাই বালিকাদের পূজাতে বাধা দিয়ে নিজেই পূজাগ্রহণে উৎসুক হয়ে উঠেছেন আর বালিকাদের কাকেও বর দিয়েছেন—'তোমা সবার ভর্তা হবে পরম সুন্দর' বা

যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপানী।
বুড়ো ভর্ত্তা হবে আর চারি চারি সতিনী॥

এক্ষেত্রে চপল দুষ্টু বালকটিকে যেন আমরা প্রত্যক্ষ দেখি।' মহাপ্রভুর ভাব-বিহ্বল চিত্রাঙ্কনেও কবিরাজ গোস্বামী কাব্যোৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর বৃন্দাবন দর্শনের চিত্রটিও কাব্যে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি-বর্ণনাতে প্রকাশ পেয়েছে কবিরাজ গোস্বামীর সৌন্দর্য-বোধ। বৃন্দাবন যাত্রার পথে গহন-গভীর অরণ্যের মধ্যে বনচারী পশুপাখীকে কবি আপনার চমৎকার বাক্-ভংগীর দ্বারা অভিনব রূপ দান করেছেন।

পয়ার এবং ত্রিপদীতে চৈতন্যচরিতামৃতের বিশাল বপু পূর্ণ। পয়ার অংশে উচ্ছ্বাস একেবারেই নেই—যখন তাঁর গহন মনে কোন আবেগের সঞ্চার হয়েছে তখনই তিনি ত্রিপদীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাই সাধারণতঃ ত্রিপদী-অংশই কাব্যগুণে সরল, সজীব এবং প্রাণবন্ত :

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল। যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু
নির্ম্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।

রসনিষ্পত্তির ব্যাপারে এ সকল অংশ যেন যাদুকরের মোহন মন্ত্রোচ্চারণ। তাই তো সমালোচকের কণ্ঠে শুনি : "তত্ত্বালোচনার দুস্তর সাগরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে কিরূপ অবলীলাক্রমে পয়ার-ত্রিপদীর পাড়ী জমাইয়াছেন তাহা চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ না করিলে অনুমান করিতে পারা যায় না। যথাসম্ভব সংক্ষেপে অথচ কবিত্বের সহিত তথ্য ও তত্ত্ব ব্যাখ্যান কার্যে কৃষ্ণদাসের সফলতা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কার্তিরূপে চিরকাল বিরাজ করিবে।"
অবশ্য সুবিপুল কাব্যের কোথাও যে দুর্বলতা নেই তা নয়—অন্ত্যানুপ্রাস অনেক ক্ষেত্রে সুশ্রাব্য নয়, অনেকস্থলে পয়ারের অক্ষর সমতা রক্ষিত হয়নি, ছন্দ-নির্মাণ যে সবক্ষেত্রে নির্দোষ হয়েছে এ কথাও বলা চলে না তথাপি আন্তরিকতার গুণে, কবি-হৃদয়ের 'মাধুরী'-স্পর্শে চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যের রসলোকে উন্নীত হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কি ঐতিহাসিক তথ্য-সম্ভারে, কি বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে, কি কাব্যরূপের বর্ণ-বিন্যাসে কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত একটি অনবদ্য গ্রন্থ। ঐতিহাসিক তথ্য এবং তত্ত্ব-সাগর মন্থন করে তিনি যে বিরল কবি-প্রতিভায় এই বিপুলায়তন কাব্য-সৌধটি নির্মাণ করেছেন এর দোসর বাংলা সাহিত্যে নেই।

॥ ছয় ॥

॥ চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত : একে অপরের পরিপূরক ॥

চৈতন্যচরিতামৃত এবং চৈতন্যভাগবত মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দুই পরমাশ্চর্য গ্রন্থ। কেবল আয়তনে নয়, বিষয়বস্তু নির্বাচনে, বর্ণনায় এবং বিস্তারে কাব্য দু'টি মহাকাব্যের প্রান্ত-সীমা-লগ্নী হয়ে উঠেছে। উৎকর্ষের ক্রম-পার্থক্য থাকলেও গ্রন্থ দু'খানি যেন 'একই বৃন্তে দুটি ফুলের' মত - দু'টোই বর্ণোজ্জ্বল, দু'টোই সুগন্ধী এবং সুন্দর। দুই কাব্যের রচয়িতা দুই ভক্ত বৈষ্ণব, নিষ্ঠাবান সাধক-কবি। একই মহাপুরুষের অনন্ত জীবন-মহিমার মহান-চিত্রণ উভয় গ্রন্থের লক্ষ্য। একই ভাব-সম্পদ উভয় গ্রন্থের সৃজন-শিল্পের অন্তরালে বেগ সঞ্চার করেছে এবং একই প্রেরণায় উভয়ে প্রাণময় এবং পরিপুষ্ট। তবুও গ্রন্থ দু'টি এক নয়। সমজাতীয় হলেও সমান নয়! এখানেই উভয়ের পার্থক্য, এখানেই উভয়ের মাঝে দুরতিক্রমী ব্যবধান। গ্রন্থদ্বয়ের উৎস-মূল অনুসন্ধান করলে উভয়ে মধ্যকার ব্যবধানী সম্পর্ক বিধৃত হবে।

চৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর যে জীবন-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা' অপূর্ণ এবং খণ্ডিত। গ্রন্থখানি আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদি খণ্ডে পাই মহাপ্রভুর বাল্য জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা—গয়া গমন পর্যন্ত এ খণ্ডের সীমা। মধ্য খণ্ডে পাই মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা আর অন্ত্যখণ্ডে সূত্রাকারে স্থান পেয়েছে মহাপ্রভুর নীলাচলে গমন এবং তথাকার লীলাংশ। সুতরাং অন্ত্যখণ্ডে আকস্মিক ছেদ-চিহ্ন পড়ায় গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ এবং খণ্ডিত হয়েছে। এ গ্রন্থে গৌর লীলা বর্ণিত হয়েছে কিন্তু চৈতন্যের প্রেম-ধর্মের মহাবাণী ব্যাখাত হয়নি, নিখিল ভারতে প্রেমধর্ম প্রচারের কথাও বাদ পড়েছে, সর্বোপরি অন্তরালে রয়ে গেছে মহাপ্রভুর জীবন-লীলার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর ভাবোন্মত্ত ধ্যান-সর্গ। চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ড যে অসম্পূর্ণ ছিল তার প্রমাণ পাই স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বাণীতে :

নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হৈল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥

এই অসম্পূর্ণ কাজের সমাপ্তি-সাধনের ভার পড়েছিল কবিরাজ গোস্বামীর উপর। মহাপ্রভুর শেষলীলা জানার জন্যে সবাই ছিল উন্মুখ—অথচ জানার উপায়

নেই। ষড়্‌গোস্বামিগণ এই অজ্ঞাত তথ্য জানানোর ভার দিয়েছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের ওপর। মহাভার ন্যস্ত হয়েছিল মহান ব্যক্তির উপরেই।

যে অন্ত্যলীলার অমৃত আস্বাদনের অসীম পিয়াসা ছিল নিষ্ঠাবান ভক্তগণের হৃদয়-মূলে—চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হওয়ায় সে পিয়াসা মিটেছে বৈষ্ণব-সাধকগণের। চৈতন্যভাগবতের আদি ও মধ্যলীলা পাঠের পর চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার অসীমামৃত পান—সুতরাং এদিক দিয়ে চৈতন্য-চরিতামৃত নিঃসন্দেহে চৈতন্যভাগবতের পরিপূরক। চৈতন্য ভাগবতে যা অপূর্ণ চৈতন্য চরিতামৃতে তাই সম্পূর্ণ।

কিন্তু এছাড়াও আরো অনেক কারণ আছে।

বৃন্দাবন দাসের কাব্যে আমরা শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর একটা স্থানিক রূপ পাই—তা' মহাপ্রভুর জীবনের এক ভগ্নাংশ মাত্র। এ চৈতন্য দেব একান্তভাবেই যেন গৌড়ের সম্পদ—কিন্তু গৌড়ের বাহিরে বিশাল ভারতবর্ষ ব্যাপী যে মহাপ্রভুর চলেছিল প্রেমলীলা সে সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস নীরব। কিন্তু কৃষ্ণদাসের দৃষ্টি ছিল বিপুল বিস্তারী। উদার দৃষ্টি-ভংগীতে তিনি মহাপ্রভুর উদার জীবন-লীলাই লিপিবদ্ধ করেছেন। নিখিল ভারতের বৃহত্তর পটভূমিকায় তিনি মহাপ্রভুকে স্থাপন করে তাঁর সমগ্র জীবন-রূপ এবং জীবন-বাণীর মর্মনির্যাস গ্রহণ করেছেন। বৃন্দাবন দাসে পাই গৌড়ীর চৈতন্যদেবকে আর কৃষ্ণদাসে অবলোকন করি ভারতের মহাপ্রভুকে। সুতরাং এদিক দিয়েও চৈতন্য-চরিতামৃত চৈতন্যভাগবতের পরিপূরক—অবশ্য ব্যাপক এবং উদার অর্থে।

বৃন্দাবনদাস ছিলেন প্রায় চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তখন কৃষ্ণ-বিরহী মহাপ্রভুর ন্যায় মহাপ্রভুর নামে সব পাগল। মানুষের বিচারশীল মন তখন বোবা। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের দৃষ্টিভংগীর সীমাবদ্ধতা প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁর গ্রন্থের মধ্যে দেখি অলৌকিকতার আন্দোলন এবং সে আন্দলনের যত্রতত্র প্রবেশ। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই অলৌকিকতা লেখকের স্ব-কল্পিত। কিন্তু কৃষ্ণদাস গ্রন্থ রচনা সুরু করেছেন মহাপ্রভুর তিরোধানের দীর্ঘদিন পর। এ সময় মানুষের, বিশেষ করে লেখকের মন ছিল বিচার-বিবেচনার পক্ষপাতী। অবশ্য তিনি যে চৈতন্য-প্রিয় ছিলেন না তা' নয়—হয়তো বা অন্ধ ভক্তই। তথাপি বিভিন্ন গোস্বামীগণের সাথে আলোচনায় পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি সকল বিষয়কে বিচার-বিবেচনার দ্বারা গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এবং

এই জন্যেই তাঁর বিশালায়তন গ্রন্থে অলৌকিকতা মাত্র কয়েকবার আত্মপ্রকাশ করেছে। আবেগ-বশে বৃন্দাবন দাস অনেক ঘটনা অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থিত করেছেন কোন ঘটনা অপলাপ-প্রায় হয়ে উঠেছে—কৃষ্ণদাসকবিরাজ সেই সকল ঘটনাকে যতদুর সম্ভব অবিকৃত রেখে আপন গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। কোন কোন স্থানে বৃন্দাবন দাস বর্ণিত ঘটনা কবিরাজ গোস্বামী নতুন ভাবে উপস্থাপিত করেছেন অবশ্য এই নতুন উপস্থাপনা বৃন্দাবনদাসের ভ্রম সংশোধন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই নতুন উপস্থাপনা ছাড়াও বৃন্দাবন দাস যে ঘটনাগুলি সূত্রাকারে বলেছেন কৃষ্ণদাস সেগুলির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন আবার বৃন্দাবন দাসে যেগুলির বর্ণনা বিস্তারিত কৃষ্ণদাসে সেগুলি সংক্ষিপ্ত। সুতরাং গ্রন্থ দু'টি এক সাথে মিলিয়ে পড়লে মহাপ্রভুর জীবন-লীলার সম্পূর্ণ এবং সত্যতম অংশটি গ্রহণ করা সহজ হবে। এদিক দিয়েও উভয় গ্রন্থ উভয়ের পরিপূরক।

বৃন্দাবনদাসে গৌরলীলার বর্ণনা আছে কিন্তু যে মহান সাধন-তত্ত্বের ওপর সমগ্র বৈষ্ণবধর্ম দাঁড়িয়ে আছে তার কোন দার্শনিক ভিত্তি দান করতে পারেননি। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তা' করেছেন। মহাপ্রভুর সমগ্র জীবন-ধর্ম সম্পূর্ণ রূপে 'হৃদয়াবেগের মিষ্টিক্ অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয় তাকেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ সর্বজনগ্রাহ্য মনস্তত্ত্ব-সম্মত দার্শনিক ভিত্তি ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চৈতন্য-জীবন ও ধর্ম-দর্শনের যে সকল অভিনব রত্নভাণ্ডার সংস্কৃত-কাব্যের জঠোরাভ্যান্তরে আত্মসাৎ করা ছিল কবিরাজ গোস্বামী বীর-বিক্রমে বিরামহীন মল্ল-যুদ্ধের পর তা' উদ্ধার করে এনেছেন। এজন্যেই তো বৈষ্ণব সাধকের কাছে চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যের নব-জীবন-বেদ।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে যে সকল ঘটনা বিবৃত করেছেন সেগুলির কোন ঐতিহাসিক ক্রম অনুবর্তন নেই। তিনি নিজেই বলেছেন: 'এসব কথার আমি নাহি জানি ক্রম'। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের সমুদয় ঘটনা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় গ্রথিত করেছেন।

বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের দিক থেকে উভয় গ্রন্থ উভয়ের পরিপূরকের সমর্থনে আর একটি যুক্তি দেখানো যেতে পারে। বৃন্দাবনদাসের কাব্য একান্ত রূপেই ঐশ্বর্যভাবের প্রতীক। কিন্তু চরিতামৃতে প্রধান হয়ে উঠেছে মধুর ভাব।

অবশ্য ঐশ্বর্যভাব যে এগ্রন্থে একেবারেই নেই তা' নয়—কিন্তু তার পরিমাণ সামান্যই। এদিক থেকেও উভয়গ্রন্থ উভয়ের পরিপূরক।

স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজও গ্রন্থ রচনায় বারবার বিভিন্ন স্থানে কৃতজ্ঞচিত্তে বৃন্দাবনের নাম উল্লেখ করেছেন:

> কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কেহ বেদব্যাস।
> চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥

অন্যত্র:

> মানুষে রচিতে পারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য
> বৃন্দাবন দাসমুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥

এবং এত নম্রতা স্বীকারের পর তিনি আপনার গ্রন্থকে দীনভাবে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের পরিপূরক বলেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এ নিছক বিনীত বৈষ্ণবোক্তি মাত্র। আসলে চৈতন্যচরিতামৃত নতুন গ্রন্থ। উপরের কারণগুলি গভীরভাবে বিবেচনা করলে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারবো চৈতন্যচরিতামৃতকে চৈতন্যভাগবতের পরিপূরক গ্রন্থ বলা অপেক্ষা—নতুন চৈতন্য-জীবন-বেদ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। বাস্তবিক কি ঐতিহাসিক সত্য নিষ্ঠায়, কি দার্শনিক তত্ত্ববিশ্লেষণে কি জীবন চরিতের স্বরূপ-বর্ণনায়, কি কাব্য রচনায় সকল দিক দিয়েই চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যভাগবত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অভিনব। চৈতন্য ভাগবত বাল্য কৈশোরের কাব্য, চরিতামৃত যৌবন প্রৌঢ়ত্বের বাণীঅর্ঘ্য। বৃন্দাবন দাসের কাব্য বয়ঃসন্ধি-উন্মাদনার, কৃষ্ণদাসের কাব্য যৌবন-বিরহের। একটি ভাসমান অপরটি অতলান্ত। 'বৃন্দাবনদাসের অকৃতকার্যই কৃষ্ণদাসের আরাদ্ধ।' সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যভাগবতের পরিপূরক গ্রন্থ হয়েও নতুন মহাকাব্য।

॥ সাত ॥

॥ নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন: ধর্মমত ॥

আজকাল চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃত এই দু'টি গ্রন্থকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপ এবং বৃন্দাবনের ধর্মমতের মধ্যে পার্থক্য রচনার চেষ্টা করা হয়। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ভাষায় উভয় স্থানের ধর্মমতের মধ্যকার ব্যবধান সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েছে: "নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীচৈতন্য আরাধ্য, উপেয়। আর বৃন্দাবনের আদর্শে তিনি উপায়। অবশ্য বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ উভয়ত্র তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত। তথাপি নবদ্বীপে তিনি

মূলতঃ কৃষ্ণভাবে পূজিত হইবেন 'বৃন্দাবনের ভক্তেরা তাঁহাকে শ্রীরাধার ভাব আস্বাদনের জন্য অবতীর্ণ কৃষ্ণরূপে মানিতেন, এবং নরহরি শিবানন্দ বাসুঘোষ প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার কৃষ্ণভাবকে অবলম্বন করিয়া ও নিজেরা গৌরনাগরী-ভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেন। আর বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ তাঁহার রাধাভাবকে অবলম্বন করিয়া ও আপনাদিগকে মঞ্জরিভাবে ভাবিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন।"

ধীর ভাবে বিবেচনা করলে শেষ পর্যন্ত এই বিরোধের অস্তিত্ব থাকে না। নবদ্বীপ এবং বৃন্দাবনের আদর্শের মধ্যে ভেদ-কল্পনা শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়। যাঁরা এই উভয় ধামের ধর্মের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে উপায় এবং উপেয় রূপে কল্পনা করেছেন তাঁদের নিজেদেরই যুক্তি 'কিন্তু', 'যে', 'যদি' ইত্যাদি সন্দেহাত্মক শব্দের প্রয়োগে দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত তাঁদের সামান্য মত উল্লেখ করা যেতে পারে "গৌড়ভক্তেরা যে শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবের বিরহ স্বীকার করিতেন না, তাহা নয়… নীলাচলে শ্রীচৈতন্য কখনো কৃষ্ণভাবে, কখনো রাধাভাবে পূজিত হইতেন" ইত্যাদি।

নবদ্বীপে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে উপেয় বলা হয়েছে—অর্থাৎ তিনিই স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁকে পেলেই ভক্তের আকুল আবেদনের চরম শান্তি। কিন্তু চৈতন্য এবং চৈতন্যোত্তর যুগে নবদ্বীপে ধর্মসাধনার বিষয় লক্ষ্য করলে দেখা যায় শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে পূজিত হয়েছেন।

চৈতন্য ভাগবতের কাহিনী হ'তে জানা যায় গয়া হতে ফেরার পর কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ণলীলার প্রাণোন্মাদিনী আবেশেই মহাপ্রভুর দিন কেটেছে। গয়াতীর্থে ঈশ্বরপুরীর নিকট আলাপচারনায় মহাপ্রভুর জীবনে অভিনব ভাবাবেগ এবং পরিবর্তন দেখা যায়। ঈশ্বরপুরী স্থানান্তরে গমন করলে মহাপ্রভুর মধ্যে ভাবাবেগ তীব্র হয়ে ওঠে এবং কৃষ্ণের নাম ধরে কেঁদে ওঠেন : 'কোথা মোর বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া আমারে।' এই মাত্র সুরু। এর পর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে আত্মহারা হয়ে যান এবং তিনি নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে আদেশ করেন :

> প্রতি ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
> বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা।। চৈতন্য ভাগবত ॥

এখানে আমরা স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছি শ্রীচৈতন্যের সময়ে নবদ্বীপে কৃষ্ণ পূজিত হতেন। প্রভু নিত্যানন্দও স্বয়ং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণচৈতন্য উভয়ের পূজা করতেন।

মুকুন্দ, শ্রীবাসাদি প্রথমে কৃষ্ণ পূজা করতেন—পারে মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু কৃষ্ণ-অন্ত প্রাণ মহাপ্রভুর সংস্পর্শে এসেও তাঁরা কৃষ্ণপূজা পরিত্যাগ করেন নি। সুতরাং এখানে শ্রীচৈতন্য কখনো উপায় কখনো উপেয়। এছাড়াও নবদ্বীপের নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ চৈতন্যকে উপেয় জেনে কেবলমাত্র গৌরলীলাই আস্বাদন করেন না—গৌরলীলার সাথে ব্রজলীলাও আস্বাদন করেছেন। অনুরূপ বিষয় পরিলক্ষিত হয়-নবদ্বীপের পদ-কর্তাগণের মধ্যে। তাঁরাও শ্রীচৈতন্যকে অবতার জেনে মুখ্যতঃ গৌরলীলা বিষয়ক পদরচনা করেননি বরং মুখ্যতঃ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ রচনা করে প্রসঙ্গত প্রথমে কয়েকটি গৌরলীলা বিষয়ক পদ যোজনা করে দিতেন মাত্র। উল্লিখিত প্রমাণ সমূহের মধ্য হ'তে নবদ্বীপে যে শ্রীচৈতন্য কেবল মাত্র উপেয় অর্থাৎ স্বয়ং কৃষ্ণরূপে পূজিত হতেন এ কথা কোন মতেই বলা চলে না। এ ছাড়া নবদ্বীপে অধিবাসীদিগের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের রাধাভাব কল্পনাও বিরল নয়।

এখন আমাদের মূল সমস্যার বিপরীত দিকটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে—অর্থাৎ বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য কেবল উপায় রূপে পূজিত হ'তেন কি না। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য হ'তে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে সহজেই দেখান যায় যে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণই—কেবল লীলা আস্বাদনের জন্যেই তিনি গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যই যে স্বয়ং কৃষ্ণ এটা প্রমাণ করার জন্যেই কৃষ্ণদাসের বহুল শ্রম ব্যয়িত হয়েছে গৌরাঙ্গ ভজনের কথা তো আমরা বহু স্থানেই পাই। সুতরাং বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য কেবলমাত্র উপায় নন—উপেয়ও।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু আর একটি সুন্দর যুক্তি উত্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষাতেই বলি, "শ্রীচৈতন্যকে উপায় হিসেবে গ্রহণ করিলে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে—কৃষ্ণ সাধনার একটি মাত্র পথ থাকে—রাধাভাবে সাধনা। কিন্তু মহাপ্রভু ছাড়া অন্য কাহারো পক্ষে যে রাধাভাবে কৃষ্ণসাধনা সম্ভব, তাহা গোস্বামীগণ বিশ্বাস করিতেন না। অতএব তাঁহাদের নিকটে শ্রীচৈতন্য নিছক উপায় হন কিরূপে? উপায় অর্থে যদি অনুপ্রেরণা ধরা যায়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণপূজায় প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন মানিতে হইবে। কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীবৃন্দ শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তত্ত্ব বিশ্বাস করিতেন। অতএব

তাঁহাদের পক্ষে নিছক অনুপ্রেরণা দাতা বলিয়া মহাপ্রভুকে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তাঁহারা যে তাহা করিতেনও না, চৈতন্যচরিতামৃতে তাহার উল্লেখ আছে। চরিতামৃত হইতে জানা যায়, রঘুনাথ দাস প্রত্যহ "প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন" করিতেন; এবং রূপসনাতনাদির দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের অন্তর্গত ছিল চৈতন্যকথা শ্রবণ ও চৈতন্য-চিন্তন—প্রত্যহ "চৈতন্যকথা শুনে করে চৈতন্য-চিন্তন।" ভক্তিরত্নাকরে আছে, বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ শ্রীচৈতন্যের অষ্টকালীন নিত্যলীলার চিন্তাও করিতেন: "চৈতন্যচন্দ্রের নিত্যলীলা রসায়ণ। নিশান্ত নিশা পর্যন্ত চিন্তে বিজ্ঞজন ॥"

এ ছাড়াও রূপ, সনাতন ও রঘুনাথের স্তবস্তোত্রে এবং নরোত্তম দাস ইত্যাদির প্রার্থনা পদসমূহে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে স্পষ্ট অবতাররূপে স্বীকার করা হয়েছে। ব্রজলীলা এবং নবদ্বীপ লীলা উভয়ের সম্মিলিত আস্বাদনজনিত মাধুর্যই যে চরম মাধুর্য সে সম্পর্কে বৃন্দাবন গোস্বামীগণের কোন সন্দেহ ছিল না। সুতরাং মহাপ্রভু বৃন্দাবনে কেবল উপায় রূপে পূজিত হতেন এমন মন্তব্য প্রকাশের পিছনে বিশেষ কোন যুক্তি নেই—ভিত্তি অনেকখানি দুর্বল।

॥ আট ॥

॥ সার্বভৌম জয়: বেদান্ত বিচার ॥

সীমাতিক্রমী প্রেম-পারাবারের কল্লোল-গানে মধ্যযুগের গাথা-বাহী বাংলা-সাহিত্য উতরোল হয়ে উঠেছিল। প্রেমের বাঁধন-ভাঙা দুর্বার স্রোতে বাঙালী মানস হয়ে উঠেছিল বিষয়-বিলোপী অসীম-অভিসারী। এই প্রেম-ধর্ম-প্রচারই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর জীবন-রূপের শ্রেষ্ঠতম রূপ। কিন্তু এই প্রেম-মন্ত্রোচ্চারণের অন্তরালে ফুটে উঠেছে মহাপ্রভুর আর এক রূপ—সে রূপ গৌণ। মহাপ্রভুর মধ্যে আমরা দেখেছি সেই যুগ-মানসের বিপ্লবাত্মক এক বহ্নি-স্ফুরণ। প্রেম বিতরণের সময় তিনি কুসুম-কোমল—চন্দ্রালোকিত সিক্ত বেলাভূমির পেলব-মসৃণতার রূপই তাঁর আজীবন আচারণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু এই লাবণ্য-কোমলতার অন্তরালে আমরা আর এক রূপ দেখেছি—সে রূপ কঠোর, ভয়াল-ভীষণ না হলেও তেজ-দীপ্ত। মহাপ্রভুর দ্বি-মুখী সত্তার একটি যেমন 'মৃদূনি কুসুমাদপি' অন্যটি তেমনি 'বজ্রাদপি কঠোরাণি'।[১] চৈতন্যচরিতামৃত হতে পাই:

মহানুভবের স্বভাব এই মত হয়।
পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময় ॥

এই বজ্রস্ফুলিঙ্গের দীপ্তিময় প্রকাশ ঘটেছে পাণ্ডিত্য-গর্বোদ্ধত কুতার্কিক-কুলের পাণ্ডিত্য-নিধনের সময়। সেখানে মহাপ্রভু কমল নন—কঠোর, নিরাহঙ্কার নন—বোধহয় কিছু অহংকারীও। আত্মগর্বী বৈদান্তিক পণ্ডিত সার্বভৌমের পাণ্ডিত্য-বিনাশনের সময় মহাপ্রভুর এই বজ্র-সুন্দর রূপের অভিনব প্রকাশ ঘটেছে। কাশীর প্রকাশানন্দের ন্যায় সার্বভৌম ছিলেন নীলাচলের বহুখ্যাত বেদান্ত বিশারদ। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা অসংখ্য সন্ন্যাসীকে তিনি বেদান্ত শিক্ষা দিতেন। এই বেদান্ত-গর্বী কুতার্কিক পণ্ডিত শেষ পর্যন্ত মহা-প্রভুর বজ্র-দীপ্ত মণীষায় এবং তীক্ষ্ণ-ধার পাণ্ডিত্যে একেবারে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছেন। মহাপ্রভুর চরণতলে এই বৈদান্তিক পণ্ডিতের বেদান্ত-বিস্ফারিত উর্ধোত্থিত মস্তক অবনত হয়ে পড়েছে। আপন ক্ষুর-ধার প্রতিভা-বলে মহাপ্রভু বেদান্তের সকল ভ্রান্ত মত খণ্ডন করে আপনার ন্যায় ও চিরন্তন সত্যানুগ মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বৌদ্ধধর্মের করাল-গ্রাসে যখন ভারতবর্ষ হতে বেদান্ত-ধর্ম লুপ্তপ্রায় হায় উঠেছিল সে সময় আবির্ভাব হয়েছিল বেদান্তের বহুখ্যাত ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্যের। তিনি এসে বেদান্তের এক নতুন ভাষ্যে মায়াবাদ-প্রতিষ্ঠা করলেন। মহাপ্রভুর-আগমণের পূর্ব পর্যন্ত বেদান্তের এই ভাষ্যই সর্বজন গ্রাহ্য ছিল এবং প্রকাশানন্দ-সার্বভৌম ইত্যাদি পণ্ডিতগণ সেই ভাষ্যেরই যথার্থ উত্তারাধিকারী।

শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত ভাষ্যগুলি ভ্রমাত্মক হওয়ার প্রধান কারণ হলো শঙ্করাচার্য শ্রুতির ব্যাখ্যায় লক্ষণা বৃত্তির দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কোন বাক্য বা শব্দের অর্থ করার দুটি প্রণালী আছে—একটি মুখ্যা বা অভিধাবৃত্তি এবং দ্বিতীয়টি লক্ষণা বা গৌনী বৃত্তি। মুখ্যাবৃত্তিতে শব্দের বাচ্যার্থই প্রধান, শ্রবণমাত্রই যে অর্থ আমাদের গহন মঁনে ভেসে ওঠে তাই মুখ্যার্থ—এখানে কল্পনার কোন স্থান নেই। কিন্তু লক্ষণাবৃত্তিতে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যাঙ্গার্থই প্রধান হয়ে ওঠে। শ্রবণমাত্রই যে অর্থ হৃদয়-দ্বারে আঘাত হানে তাকে পরিত্যাগ করে কল্পনার আশ্রয়ে শব্দের নতুন অর্থ করার প্রবণতাই হলো লক্ষণাবৃত্তি। শঙ্করাচার্য শ্রুতির যে সকল ভাষ্য রচনা করেছিলেন এই লক্ষণাবৃত্তিই হলো সেগুলির সূতিকাগার। শ্রীশঙ্করাচার্য শ্রুতির সরল সহজ অর্থ পরিত্যাগ করে লক্ষণা-বৃত্তিতে অর্থ করেছিলেন বলেই সেগুলি ভ্রমাত্মক হয়ে উঠেছিল। সুদীর্ঘ সাতদিন বেদান্ত পড়ার পর তাই সার্বভৌম যখন মহাপ্রভুকে কিছু বুঝেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন তখন মহাপ্রভুর কণ্ঠ হ'তে শোনা যায়ঃ

প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়তো বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥

কেন না :

সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থ তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥

মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করে কল্পনার্থে জোর দেওয়ায় সার্বভোম তথা শঙ্করাচার্যের সকল ভাষ্য ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। এই ভ্রান্ত ভাষ্যের যেগুলি মহাপ্রভু যেভাবে খণ্ডন করে আপন মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিম্নে আমরা সেগুলিই উত্থাপন করার চেষ্টা কববো :

ক॥ সবিশেষ নির্বিশেষ তত্ত্ব : মায়াবাদী শঙ্করাচার্যের প্রথম এবং প্রধান মত হলো ঈশ্বর নির্বিশেষ। ভগবানের এই নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদন এবং প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর কত না আকুল আগ্রহ। নির্বিশেষ কথার অর্থ হলো নিঃশক্তি। মায়াবাদীদের মতে ভগবানের কোন নিজস্ব শক্তি নেই এবং তিনি নিরাকার। ভগবানের কোন শক্তির কথা স্বীকার করলে তিনি আর নির্বিশেষ থাকেন না। কেন না শক্তির জন্যে আধার চাই—সুতরাং শক্তির কথা স্বীকার করে নিলেই আধারের কথা স্বীকার করতে হয়। তখন ভগবান সবিশেষ হয়ে ওঠেন। তাই মায়াবাদীগণ ভগবানের নির্বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যেই তাঁর সকল শক্তিকে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু প্রমাণ করেছেন ব্রহ্ম সবিশেষ—তাঁর বুকেই নিহিত আছে অনন্ত শক্তির লীলা-প্রবাহ। প্রথমতঃ ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থই হলো বৃহদ্বস্তু—সর্বশক্তিময়। সুতরাং এই সর্বশক্তিই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব দান করেছে। দ্বিতীয়তঃ শ্রুতির ভাষ্য রচনা করে শঙ্করাচার্য ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব প্রতিপন্ন করেছেন সেই শ্রুতিতেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকৃত হয়েছে ব্রহ্মের অসংখ্য শক্তির কথা। এই শক্তিপুঞ্জ সততঃ ক্রিয়াশীল এবং এরা ব্রহ্মের স্বাভাবিক অংশ হ'তে অবিচ্ছেদ্য। ব্রহ্মের এই অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান—চিচ্ছক্তি (অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তি), মায়াশক্তি (বহিরঙ্গা) এবং তটস্থা (জীবশক্তি)। প্রাকৃত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মায়াশক্তির লীলানিকেতন, গণনাতীত অনন্ত লক্ষ-কোটি জীব তাঁর তটস্থা শক্তির বহিঃপ্রকাশ, এবং ঐশ্বর্য-মাধুর্য গুণাবলী তাঁর চিচ্ছক্তির মহান বিকাশ। শ্রুতিবাক্যের আর এক স্থানে

ব্রহ্মের অনন্ত শক্তিসমূহের কথা সুন্দররূপে বিধৃত হয়েছে। ব্রহ্মাকে বলা হয়েছে অপাদান, করণ এবং অধিকরণের কারক। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি হতে বিশ্বের সৃষ্টি—অপাদান, ব্রহ্মের দ্বারাই জগৎ-জীবের প্রাণ-প্রবাহ চালিত—করণ, এবং অন্তিমে সকল কিছুই ব্রহ্মতে বিলীন হয়ে যাবে—অধিকরণ। শ্রুতির এই বাক্যে নিহিত রয়েছে ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির বিজয় ঘোষণা। সুতরাং ব্রহ্ম স্ব-শক্তিতে অধিষ্ঠিত, সবিশেষ। তৃতীয়তঃ কোন কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলায় শঙ্করাচার্য সেই সকল শ্রুতিসমূহ দিয়ে ব্রহ্মের যে নির্বিশেষত্ব প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তাও ভ্রান্ত। মহাপ্রভু প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে ঐ সমস্ত শ্রুতির মূল তাৎপর্য হলো ব্রহ্মের অপ্রাকৃত শক্তিসমূহের (প্রাকৃত শক্তি নয়) অস্তিত্ব স্বীকার করা। যেমন শ্রুতিতেই আমরা পাই সৃষ্টির প্রারম্ভে এক ব্রহ্ম বহু হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং তখন তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন প্রাকৃত শক্তির দিকে :

> ভগবান বহু হৈতে যবে কৈল মন।
> প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন ॥…॥ চৈ, চ, মধ্য, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই বাক্যে ভগবানের চিন্তা করার শক্তি হ'তে মনের এবং দৃষ্টিপাত করার শক্তি হতে চক্ষুর অস্তিত্ব স্বীকৃত। কিন্তু তখনো প্রাকৃত নয়ন মনের সৃষ্টি হয়নি—মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর হতে প্রাকৃত নয়ন মনের সৃষ্টি। কিন্তু প্রাকৃত নয়ন মন না থাক্‌লে ভগবানের এই দর্শন এবং চিন্তা শক্তি কোথা হতে এল ? শঙ্করাচার্য এখানে এসেই ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন কিন্তু মহাপ্রভু বলেছেন প্রাকৃত নয়ন মন না থাক্‌লেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত নয়নমন ছিল এবং এই অপ্রাকৃত নয়ন মন দিয়ে তিনি চিন্তার এবং দর্শনের কার্যাবলী সুসম্পন্ন করছেন। অন্য আর এক শ্রুতি হ'তে আমরা ব্রহ্মের কর এবং চরণ না থাক্‌লেও তাঁর ধৃ এবং চলৎ শক্তির ইংগিত পাই। এখানেও ব্রহ্মের এই কর-চরণ প্রাকৃত নয়—অপ্রাকৃত। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি এবং অপ্রাকৃত বিশেষত্বে সন্দেহ স্থাপন করার কোন কারণ নেই। ব্রহ্ম চিদ্‌ঘন, জ্ঞানঘন এবং আনন্দঘন বিগ্রহ—তিনি ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণানন্দের প্রতিমূর্তি। চতুর্থতঃ শঙ্করাচার্য 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ নির্ণয়ে মুখ্যাবৃত্তি ছেড়ে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন ফলে ব্রহ্ম নির্বিশেষ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হয়েছে যে ব্রহ্ম হলেন শক্তি-প্রবল আনন্দ। তা' ছাড়াও এই শব্দটি মহাবাক্য নয়—খণ্ডিত একটা

প্রাদেশিক রূপের প্রতীক মাত্র—'প্রণব'-ই হলো অখণ্ড মহাকাব্য এবং 'প্রণব' বাক্যই ব্রহ্মের সৃজনী, পালিনী, সংহারিণী শক্তিপুঞ্জের বাস্তবালেখ্য। সুতরাং ব্রহ্ম নির্বিশেষ হন কিরূপে? পঞ্চমতঃ ব্রহ্ম শব্দের অর্থে দুটি অংশ বর্তমান—একটি বৃংহতি এবং অপরটি বৃংহয়তি। এই উভয়ের সম্মিলিত অর্থে ব্রহ্ম পূর্ণ। কিন্তু শক্তির কথা অস্বীকার করলে 'বৃংহয়তি' অংশই বাদ পড়ে যায় এবং ব্রহ্মের পূর্ণ-স্বরূপের হানি হ'তে বাধ্য। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তিকে অস্বীকার করবে কে?

মহাপ্রভুর এই তীক্ষ্ণধার যুক্তি-বাণে মায়াবাদীদের নির্বিশেষত্ব নিমিষে নিশ্চহ্ন হয়ে গেছে এবং নির্বিশেষত্বের ধ্বংস-স্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সবিশেষত্বের অটল বৈভব।

খ॥ জীবতত্ত্ব: জীবের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেছেন যে মায়াকবলিত ব্রহ্মই জীব—জীব হ'তে এই মায়া বিদূরীত হলে জীবই ব্রাহ্ম হয়ে ওঠে। তখন জীব-ব্রহ্মে কোন পার্থক্য থাকে না। বলাবাহুল্য শঙ্করের এই মত শ্রুতির লক্ষণার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল লক্ষনার্থই নয় লক্ষণার্থের সাথে মিলিত হয়েছে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভংগী। ফলে শ্রুতির মূল অর্থ সম্পূর্ণ কাল-কবলিত। শ্রুতির মুখ্যার্থানুযায়ী জীব হলো ব্রহ্মেরই অংশ—তাঁরই শক্তির অনন্ত বিকাশ। ব্রহ্ম মায়াধীশ আর জীব মায়াবশ। জীব ব্রহ্মেরই নিত্যদাস।

গ॥ সম্পদ-সম্বন্ধতত্ত্ব: শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের মতানুযায়ী নির্বিশেষ ব্রহ্মই সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য সম্পদ তত্ত্ব কিন্তু শ্রুতি মুখ্যার্থ অনুযায়ী মহাপ্রভু প্রমাণ করেছেন সবিশেষ ব্রহ্মাই বেদের প্রতিপাদ্য এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্বের ও রস স্বরূপত্বের বিকাশ বলেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধতত্ত্ব।

ঘ॥ সাধনতত্ত্ব: বৈদান্তিক-বিশারদ শঙ্করাচার্যের মতে জ্ঞানমার্গের সাধনই মায়াকবলিত জীব-মুক্তির শ্রেষ্ঠপন্থা কিন্তু মহাপ্রভুর প্রমাণ করেছেন বেদের প্রতিপাদিত অভিধেয় তত্ত্ব হলো ভক্তি। ভক্তিমার্গের সাধনাই সর্বোত্তম।

ঙ॥ শঙ্করাচার্যের মতে সাযুজ্য মুক্তিই হলো একমাত্র সাধ্যবস্তু। মায়াকবলিত জীবরূপ ব্রহ্মের পক্ষে মায়ার নিষ্ঠুর কবল হ'তে মুক্তি পাওয়াই হলো সাযুজ্য মুক্তি। কিন্তু এই সাযুজ্যমুক্তির মধ্যে একটি বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করার আছে। প্রথমতঃ বলা হয়েছে জীব মায়াকবলিত ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের নিজের

প্রতিরোধ করার কোন শক্তি না থাকায় তিনি মায়ার বশ হয়েছেন। সুতরাং জীব মুক্তি পেয়ে যখন ব্রহ্ম হ'য়ে যাবে সেই মুক্তিপ্রাপ্ত ব্রহ্মের নিজস্ব প্রতিরোধের কোন শক্তি না থাকায় আবার মায়ার কবলে পড়ে জীবে পরিণত হবে। এই দুর্ঘটনা যদি চিরকালের মত চল্‌তে থাকে তা' হলে জীবের পক্ষে মুক্তি পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। সুতরাং সাযুজ্য মুক্তিতে মোক্ষ লাভ অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে মহাপ্রভু সাযুজ্য মুক্তির কথা না বলে বলেছেন জীব কৃষ্ণের শক্তির অংশ, সুতরাং কৃষ্ণের দাস। ফলে সর্বান্তকরণে কৃষ্ণসেবাই তার লক্ষ্য। আর কৃষ্ণ সেবায় তুষ্টির শ্রেষ্ঠতম উপায় হলো প্রেম। সুতরাং মহাপ্রভুর মতে প্রেমই একমাত্র কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ—প্রেমের পথ চেয়েই একমাত্র রসলোকের স্বর্ণপ্রাসাদে পৌঁছানো সম্ভব। সাযুজ্য মুক্তি নয়, কৃষ্ণ-প্রাপ্তিই জীবের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

চ॥ পরিবর্তন-বিবর্তনবাদ : বিশ্ব এবং ব্রহ্মের মধ্যকার কার্যকরণ সম্পর্ক নির্ণয় হতেই বিবর্তন ও পরিবর্তনবাদের উৎপত্তি। বিবর্তনবাদীরা বলেন জগৎ সম্পূর্ণ অলীক, মিথ্যা কিন্তু পরিণামবাদীরা বলেন জগৎ মিথ্যা নয়—নশ্বর মাত্র। বিবর্ত শব্দের অর্থ ভ্রম। বিবর্তনবাদীদের মতে পৃথিবী হলো ভ্রম-সাধনের স্থান—এখানে নানাভাবে মানুষ ভ্রম-কবলিত হয়। মরুর উত্তপ্ত বুকে মরীচিকা দেখে পিপাসা নিবারণার্থে মানুষ ভ্রম-পথে ধাবিত হয়, রজ্জুকে সর্প ভ্রমে মানুষ আতঙ্কিত, শুক্তির ঔজ্জ্বল্যকে সে অনুরূপ ভ্রম বশতঃ মুক্তা মনে করে অনুরূপে অজ্ঞান মানবকুল অজ্ঞানবশে ব্রহ্ম পরিদৃশ্যমান জগৎকে সত্য বলে জেনে ভ্রমে পতিত হয়। দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছায়া যেমন অসত্য—কায়াটাই সত্য, তেমনি পরিদৃশ্যমান জগৎ ছায়া—সে ছায়ার মতই অসত্য। আসল সত্য কায়া—তিনি ব্রহ্ম। সুতরাং জগৎ মিথ্যা—ভ্রম-কেন্দ্র। বিবর্তনবাদীদের আর একটি মূল সিদ্ধান্ত হলো ঈশ্বর জগতের কারণ নন—তিনি জগৎরূপে পরিণত হননি। দুগ্ধ দধিতে পরিণত হলে যেমন দুগ্ধের আর কোন আস্বাদ থাকে না তেমনি ঈশ্বর জগৎরূপে পরিবর্তিত হলে—ঈশ্বরের সকল স্বরূপই ধংসপ্রাপ্ত হয়—অন্ততঃ ঈশ্বরের রূপ বিকৃত হয়ে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। সুতরাং ঈশ্বর হতে জগৎ সৃষ্ট হয় নি—তিনি জগতের কারণ নন।

বিবর্তনবাদীদের এই যুক্তিগুলি এতই ক্ষীণ ও দুর্বল যে মহাপ্রভু এগুলিকে অতি সহজেই খণ্ডন করতে পেরেছিলেন। প্রথম ভ্রমের উত্তরে মহাপ্রভু বলেছেন সাধারণত সমবস্তুতেই আমাদের ভ্রম হয়। রজ্জু ও সর্প একই আকারের,

শুক্তি ও মুক্তা একই ঔজ্জ্বল্যের প্রতীক—সুতরাং এখানে রজ্জুকে সর্প ও শুক্তিকে মুক্তা বলে ভ্রম হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কিন্তু জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে এমন কোন সাদৃশ্য-সম্বন্ধ নেই—সুতরাং এখানে ভ্রম কল্পনা করা অনর্থক। তা' ছাড়া আর এক দিক হ'তে বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। বিবর্তন বাদীদের মতে ব্রহ্ম হতেই জীবের সৃষ্টি—ব্রহ্ম ও জীব এক, সুতরাং জগৎ প্রপঞ্চের মধ্যে যদি জীবের ভ্রম হয় তা' হলে সে ভ্রম ব্রহ্মেরই কেননা জীবই ব্রহ্ম। এখন ব্রহ্মেরই যদি ভ্রম হয় তা' হলে ব্রহ্মের অংশ জীবের পক্ষে তো কোন কালেই অজ্ঞানতা হ'তে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। অনন্তকাল ধরে জীবকে ভ্রম-মরীচিকার পিছু পিছু দুর্দমনীয় পিপাসা নিবারণার্থে কাতর-ক্লান্ত হয়ে ছুটে বেড়াতে হবে। বিবর্তনবাদীদের ভ্রমতত্ত্ব যে কত দুর্বল তা' এখানেই লক্ষিতব্য।

বিবর্তনবাদীদের দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের কারণ নয়—এর উত্তরে পরিবর্তনবাদীরা বলেন যে ঈশ্বর জগতের কারণ নয় এটি সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা বরং ঈশ্বর হ'তেই জগতের সৃষ্টি, তিনি জগতের কারণ। শাস্ত্র, শ্রুতি ইত্যাদিও বহুস্থানে, বহুভাবে এ কথা উল্লিখিত হয়েছে। দুগ্ধদধির উপমা দিয়ে জগৎরূপে পরিণত হলে ঈশ্বরের রূপ বিকৃত হওয়ার যে কথা বিবর্তনবাদীরা বলেছেন তাও সত্য নয় কেননা ঈশ্বর অচিন্ত্যশক্তির অনন্ত আধার। এই অসীম অচিন্ত্য-শক্তির বলেই তিনি জগৎরূপে পরিণত হয়েও নিজে অবিকৃত অবস্থায় থাকেন। সুতরাং ঈশ্বরই জগতের কারণ। এখানে বিবর্তনবাদীদের 'জগৎ মিথ্যা' বলার পিছনে সকল অলীক এবং দুর্বল যুক্তির অপমৃত্যু প্রাপ্ত হ'লো। জগৎ মিথ্যা নয় সত্য, ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা—তিনিই জগৎ ও জীবের পালক ও সংহারক।

মহাপ্রভুর এই অনল তেজস্বী প্রতিভায়, দীপ্তোজ্জ্বল মণীষায় বৈদান্তিক বিশারদ সার্বভৌম সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন, স্বীয় ভ্রান্তি উপলব্ধি করে মহাপ্রভুর চরণতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। এই মহান প্রতিভার বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণালোকে প্রকাশানান্দেরও সকল পাণ্ডিত্য গর্ব বিলীন হয়ে গিয়েছিল। সার্বভৌমকে জয় করে আনন্দে মহাপ্রভু নৃত্য করে বলেছিলেন, আজ আমার বিশ্বনিখিল জয় সম্পন্ন হলো। বস্তুতঃ বিশ্বনিখিল না হোক সমগ্র উড়িষ্যা যে তাঁর করতলগত হয়েছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

॥ নয় ॥

॥ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য ॥

১॥ ব্রহ্ম নির্বিশেষ নন—সবিশেষ। তিনি ষড়ৈশ্বর্যময় পূর্ণানন্দ। অপাদান, করণ এবং অধিকরণের কর্তা একমাত্র তিনিই।

২॥ যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-তপস্যা নয়—একমাত্র প্রেমাবেশে নাম সংকীর্তনই কলিযুগের ধর্ম।

৩॥ যে নামসংকীর্তন কলিযুগের ধর্ম তা' সহজ সাধ্য নয়। নামসংকীর্তন করতে হলে নিজেকে তৃণ অপেক্ষা নীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হ'তে হবে। তা' ছাড়া আপনার দেহমন হ'তে মানকে বিদূরীত করে অপরকে মান দান করতে হবে। মান বা গর্বের এতটুকু স্পর্শ যদি মনের অলিগলিতে বিরাজিত থাকে তা' হলে নামসংকীর্তনে শ্রীভগবানের সান্নিধ্যলাভ সম্ভব নয়।

৪॥ ঈশ্বর এবং জীব অভিন্ন নয় আবার ভিন্নও নয়। উভয়ে এক নয় আবার কোন পার্থক্যও নেই। উভয়ই চৈতন্যময় কিন্তু ভগবান বিভুচৈতন্যময় এবং জীব অনু চৈতন্যময় অদ্বৈত তত্ত্ব নয়—অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বেই উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণীত।

৫॥ জ্ঞান, কর্ম এবং যোগ সাধনায় ভগবানকে পাওয়া যায় না—ভগবানকে আপন করে পেতে হলে চাই 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়' প্রেম —ভগবান একমাত্র ভক্তি এবং প্রেমেই বশীভূত।

৬॥ ভগবানের সীমাহীন কৃপাংশ ব্যতীত কোন ক্রমেই ভক্তিলাভ করা সম্ভব নয়—এবং এই কৃপালাভ করতে হলে দীনতা এবং আর্তির মাধ্যমে বিগলিত দেহমনে ভগবানের স্মরণ করতে হবে।

৭॥ ভক্তির মধ্যে রাগানুগা ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ—সুতরাং রাগানুগা ভক্তির মাধ্যমে যিনি শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণের অসীম লীলা-রস-আস্বাদনের উপযুক্ত পাত্র।

৮॥ শ্রীকৃষ্ণের ভজনার মধ্যেও অধিকার ভেদ আছে। ভক্তির তারতম্য অনুযায়ী এই ভেদ-স্তর গঠিত—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ—এই মধুর রসের মধ্যেই শান্ত, দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্যের গুণাবলী বর্তমান। এ ছাড়াও আছে মধুরের নিজস্ব রূপ-মাধুর্য।

৯॥ মোক্ষবাঞ্ছা বা মুক্তি লাভই ভক্তের বা সাধ্যের কাম্য হওয়া উচিত নয়—কেন না মোক্ষবাঞ্ছা প্রবল হলে অন্তর হ'তে কৃষ্ণভক্তি দূর হয়।

॥ চট্টগ্রাম-রোসাঙের মুসলিম কবি ও কাব্য ॥

॥ এক ॥

॥ মুসলিম কবিগণের কাব্য-পটভূমি ও বাংলা কাব্যে নতুন-ধারার প্রবর্ত্তনা ॥

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য যখন একান্তভাবে দেব-দেবীর লীলা-ভূমি হ'য়ে উঠেছিল, দৈবী বিলাস-চিত্রনের উৎস-ক্ষেত্রে পরিণত ঠিক সেই সময় বাংলার সুদূর সীমান্তে চট্টগ্রাম-আরাকানের (রোসাঙের) মুসলিম কবিগণের কাব্য-সাধনার মধ্যে শোনা গিয়েছিল আর এক নতুন সুরালাপন, ফুটে উঠেছিল দেব-বিনির্ভর বলিষ্ঠ লৌকিক প্রেম-কাহিনীর বর্ণ-সুষম চিত্র-সম্পদ। এ চিত্র-সম্পদ একান্তভাবে মানবীয় জীবনায়নেরই প্রতীক। এখানে দেব-দেবীর কোন স্থান ছিল না, তাঁদের বিলাস-লীলায় এ কাহিনী সমাচ্ছন্ন নয়—এ কাহিনী একান্তভাবে বিশুদ্ধ মানব-প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেমের পথে মানব-জীবনে যে রোমান্স, যে যৌবন চাঞ্চল্য, যে ব্যাকুল-আবেগ, যে বিরহ-বেদনা ফুটে ওঠে এ কাহিনী প্রেমের সেই বিচিত্র গতিভংগীর জীবন-রসটুকু পান করে শত ধারায় বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। এইভাবে চট্টগ্রাম রোসাঙের (আরাকানের) মুসলিম কবিগণের কাব্য-সাধনার মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের আর এক নতুন দিগন্তের আবরণ উন্মোচিত হয়। বৈষ্ণব কাব্য, মঙ্গল কাব্য কিংবা চরিত-সাহিত্যের দেবতা অথবা দেবোত্তম নরের চরিত্রাঙ্কনে নয়—মাটির মানুষের মনের কথা, প্রাণের ব্যথা নিয়েই এসব কাব্য মানবীয় সুরাল্পনায় সার্থক সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি করেছে। দেব-নির্ভর গাথা কাব্যের বুকে এ যেন দেব-বিনির্ভর মানবতার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। চট্টগ্রাম-রোসাঙের মুসলিম কবিদের শিল্প-প্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্যটুকু এখানে। যে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বসে এই উভয় দেশের মুসলিম কবিগণ কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এ প্রসঙ্গে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু জেনে নিলে কাব্যের মূল সুর অনুধাবন করা সহজ হ'বে। ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় বৃহত্তর বাংলা দেশের সাথে প্রত্যন্ত এই প্রদেশের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিল না। "এই অঞ্চল তখন

আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। আরাকান পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী ব্রহ্মদেশের নিম্নাঞ্চলের একটি বিভাগ।" এই আরাকানীরা ছিলেন বর্মী। কিন্তু বর্মী হ'য়েও সাংস্কৃতিক মানের দিক দিয়ে এঁরা ঠিক খাঁটি বর্মী ছিলেন না। ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কার, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন দিক দিয়ে এঁদের স্বাতন্ত্র্য লক্ষিতব্য। আবার চট্টোগ্রাম বাংলার সাথে যুক্ত হ'লেও বৃহত্তর বঙ্গের সংস্কৃতির সাথে তার বিশেষ কোন যোগ ছিল না—বঙ্গ-সংস্কৃতি অপেক্ষা আরাকানী সংস্কৃতির সাথে তার ছিল ঘনিষ্ঠতা। সুতরাং চট্টগ্রাম আরাকানের সংস্কৃতিতে যুগ্মভাবে মিশেছে বর্মী ও বাঙালী সংস্কৃতি। তা' ছাড়া আরাকানের বৌদ্ধ-রাজারা বুদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বলেই নিতান্ত ধর্মের খাতিরে পালি-প্রাকৃত ভাষাব চর্চা তাঁদের করতেই হ'তো। এই পালী ও প্রাকৃত ভাষার পথ বেয়ে আরাকানে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়েছিল বৃহত্তর ভারতবর্ষের আর্য-সংস্কৃতি। এই আর্য-বর্মী বাঙালী সংস্কৃতির সাথে মিশেছিল মুসলিম সংস্কৃতি। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সংস্কৃতি ছিল এদেশের সংস্কৃতির প্রধান এবং প্রবল অংশ। দিল্লীর সিংহাসনে তখন মোঘল রাজ—উন্নতির স্বর্ণশিখরে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত। আর তাঁদের জীবনাচরণ হ'ল তাঁদের সংস্কৃতিরই প্রতিবিম্ব। মোঘল বাদশা'দের বিলাস-ব্যসনের পথ বেয়ে মুসলিম সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয় নি এমন জনসংখ্যা সে সময় নিখিল ভারতবর্ষ-ব্যাপী একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। আরাকানীরাও এ সংস্কৃতিতে বিশেষরূপে প্রলুব্ধ হ'য়েছিলেন। তা' ছাড়াও বর্তমান কালের মত তখনও এই বঙ্গ-প্রত্যন্ত প্রদেশের অধিবাসীর প্রধান অংশ ছিল বাংলাভাষী মুসলমান। ফরাসী চর্চা তাদের মধ্যে ছিল ব্যাপক। তাই নিয়তির মত অনিবার্য কারণে এদেশে মুসলিম সংস্কৃতির ব্যাপক এবং বহুল প্রসার ঘটে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে যুগপৎ ছিল ভারতীয় আর্য এবং মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা এবং চর্যা। এই উভয় সংস্কৃতির পরিচয় নিবিড় হ'য়ে ধরা পড়েছে এখানকার মুসলিম কবিকুলের কাব্যরচনায়। একদিকে আছে পৌরাণিক সংস্কৃতি (চৈতন্য-সংস্কৃতি নয়) অন্যদিকে মুসলিম সংস্কৃতি—এই উভয় সংস্কৃতি হ'তে বেগ নিয়ে মুসলিম কবিগণ তাঁদের লৌকিক প্রেম-কাব্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কাব্যের আলোচনায় এ কথা সুন্দররূপে প্রতীয়মান হ'বে।

আরাকান বা রোসাঙে বসে যাঁরা কাব্য রচনায় ব্যাপৃত হ'য়েছিলেন আজ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে আমরা এই পাঁচজনের নাম জান্‌তে পেরেছি: ক ॥ দৌলত কাজী খ ॥ মরদন গ ॥ কোরেশী মাগন ঠাকুর ঘ ॥ মহাকবি আলাওল ঙ ॥ আবদুল করীম খোন্দাকার। আর চট্টোগ্রামের অসংখ্য কবিকুলের মধ্যে এই ক'জন প্রধান: ক ॥ সৈয়দ সুলতান খ ॥ শৈখ পরাণ গ ॥ হাজী মুহম্মদ ঘ ॥ নসরুল্লাহ্ খাঁ ঙ ॥ মহম্মদ খান চ ॥ শেখ মুত্তলিব ছ ॥ নওয়াজিশ খাঁ জ ॥ করম আলী ঝ ॥ আবদুল নবী ঞ ॥ শেখ মনসুর ট ॥ মুহম্মদ উজীর আলী ইত্যাদি। নিম্নে আমরা এই কবিগণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

॥ দুই ॥

॥ আরাকান বা রোসাঙের কবিকুলের কাব্যালোচনা ॥

ক ॥ দৌলত কাজী—(আনুমানিক ১৬০০-১৬৩৮): দৌলত কাজীর সৌভাগ্যে ঈর্ষা হয়। ঈর্ষা হওয়ারই কথা। মাত্র একখানি অসম্পূর্ণ কাব্য রচনা করে তিনি বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী গৌরবোজ্জ্বল আসন লাভ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আর কোন কবি এমন সৌভাগ্যবান বলে আমাদের জানা নেই। কবির এই কীর্তি-সমুজ্জ্বল কাব্যটির পূর্ণ নাম সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী—সংক্ষেপে 'সতীময়না' অথবা 'লোর-চন্দ্রানী'।

দৌলত কাজীর বাল্যজীবন বৈচিত্র্যময়। তাঁর জন্মস্থান নিয়ে পণ্ডিতকুলে সংশয় আছে কিন্তু "মুস্‌লিম বাংলা সাহিত্যের" ঐতিহাসিক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেব স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন "তিনি (কবি) চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামের কাজী বংশে জন্মগ্রহণ করেন"। কবি অল্প বয়সেই বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন কিন্তু স্বদেশে তাঁর সমাদর না হওয়ায় তিনি আরাকান রাজদরবারে আসেন। আরাকানের রাজা তখন শ্রীসুধর্ম (১৬২২-১৬৩৮ খৃঃ)। এই সুধর্মের 'সমর-সচিব' এবং 'ধর্মপাত্র' ছিলেন আশরাফ খান। দৌলত কাজী এই আশরাফ খানের স্নেহচ্ছায়া ও অনুগ্রহ লাভ করেন। এঁরই নির্দেশ এবং প্রেরণায় কবি 'সতী ময়না' কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ—বিধি নির্দয়।

কাব্য অর্ধ সমাপ্ত রেখেই নিয়তির অনিবার্য আহ্বানে পরপারে যাত্রা করেন। এই অসম্পূর্ণ কাব্যটি সমাপ্ত করেন রোসাঙের আর এক মহাকবি আলাওল —সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পরে। এই কাব্যের কাহিনীও কবির মৌলিক কল্পনা প্রসূত নয় ঠেঠ্ হিন্দী ভাষায় চৌপদী ও দোহার ছন্দে বিরচিত 'সাধন' নামক কোন হিন্দী কবির 'সতী ময়না' কাহিনী শুনতে শুনতে আশরাফ খান এটাকে দেশীয় ভাষায় রূপ দিতে বলেন দৌলত কাজীকে। কাহিনী আপন কল্পনা-প্রসূত নয় এমন কি কাব্যটিও অসম্পূর্ণ তা' সত্ত্বেও কেবল রোসাঙের মুসলিম কবিদের মধ্যে নন সমগ্র বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন শক্তিশালী কবির মধ্যে তিনি অন্যতম। যে বিরল কবিত্ব শক্তির জন্যে তিনি দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন এবার আমরা সেই শক্তির মূল স্বরূপটির সাথে পরিচিত হ'তে চেষ্টা করব।

আমরা পূর্বেই বলেছি রোসাঙের মুসলিম কবিগণের লৌকিক প্রেম-গীতিগুলি মানবতার বিজয় গানে মুখর। কবি দৌলত কাজীর কাব্যের মূল কাহিনীর মধ্য দিয়ে তো বটেই উপরন্তু গ্রন্থারম্ভের মধ্য দিয়ে দেব-বিনির্ভর মানবতার সুরটি সুন্দর হয়ে ফুটেছে। এখানে ত্রিভুবনের প্রভুর স্তুতিগানের উপরে উঠেছে নর-সুন্দরের জয়গাথা:

> নিরঞ্জন-সৃষ্টি নর অমূল্য রতন। ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান॥
> নর বিনে চিন নাহি কেহ কিতাব কোরান। নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান॥
> নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর। নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর॥
> তারাগণ শোভা দিল আকাশ মণ্ডল। নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জ্বল॥

মানব-মহিমার এমন অকুণ্ঠ বিজয়গাথা বহুদিন পর দেখি রবীন্দ্রনাথের কবিতায়:

> তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
> মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
> শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
> হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
> দিয়েছ আমার পরে ভার,
> তোমার স্বর্গটি রচিবার।
>
> ॥ বলাকা ॥

কাব্যের কাহিনী আলোচনা করলেও এই মানব-প্রীতি সুন্দর হয়ে ধরা

পড়বে। কাব্যটি তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক কাব্যের প্রথম খণ্ডকে 'পরিচয় খণ্ড', দ্বিতীয় খণ্ডকে 'বিরহ খণ্ড' এবং তৃতীয় খণ্ডকে বলেছেন 'মিলন খণ্ড'।

প্রথম খণ্ডে কবি দিয়েছেন কাব্যের নায়ক-নায়িকাদের পরিচয়, এঁকেছেন দাম্পত্য জীবনের ছবি। নায়ক লোর অপূর্ব সুন্দরী ময়নাকে বিয়ে করে সুখে জীবন যাপন করেন। হঠাৎ একদিন রাণী ময়না ও বৃদ্ধ পাত্রদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে তিনি বনে গমন করলেন। বনে এক যোগীর কাছে গোহারী রাজ-কন্যা চন্দ্রানীর প্রতিকৃতি দেখে লোর প্রলুব্ধ হন এবং রাজ-কন্যার সাথে মিলনের জন্যে গোহারী রাজ্যে গমন করেন। কিন্তু চন্দ্রানীর বিয়ে হয়েছিল অমিত বীর্যবান এক বামুনের সাথে। এ বামুন ছিল নপুংসক। ফলে যৌন অতৃপ্তির জন্যে চন্দ্রানী লোরের সাথে পালিয়ে আসেন। বামুনও পিছু নেয় কিন্তু গভীর জঙ্গলে লোরের সাথে সংগ্রামে বামুন নিহত হন। ইতিমধ্যে চন্দ্রানীর পিতা এসে উভয়কে আপন রাজ্যে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেন এবং রাজ্য শাসনের সমুদয় ভার লোর-চন্দ্রানীর হাতে অর্পণ করেন। এখানে প্রথম খণ্ড শেষ।

দ্বিতীয় খণ্ডের সুরু ময়নার অতলান্ত বিরহ-বর্ণনা দিয়ে। এই বিরহ-বর্ণনা শতধারায় উৎসারিত হয়েছে বারমাস্যার মধ্য দিয়ে। মাসে মাসে ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির পট পরিবর্তন চলে—সেই পরিবর্তনের সাথে সাথে বয়ে চলে ময়নার বিরহের ফল্গুপ্রবাহ। বিরহ-কাতরা ময়নার দেহকান্তিতে প্রলুব্ধ হয় রাজপুত্র ছাতনা। রতনা মালিনীকে হাত করে ছাতনা তার কুৎসিত কামনা প্রকাশ করে ময়নার কাছে। ময়নার তখন বারমাসী দুঃখ বর্ণনা চল্‌ছে। একাদশ মাসের দুঃখ বর্ণনা শেষ হয়েছে (আষাঢ় হতে বৈশাখ) কেবল জ্যৈষ্ঠ মাসে পড়েছে এমন সময় দৌলতকাজীর কবিধর্ম স্তব্ধ হয়ে যায়। এরপর হতে অবশিষ্টাংশ রচনা করেন কবি আলাওল। ছাতনার দূতী রতনা মালিনী লাঞ্ছিতা হয়ে ফিরে আসেন সতী ময়নার নিকট হতে।

এরপর তৃতীয় খণ্ডের সুরু। এক সখীর পরামর্শে ময়না একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের হাতে একটি শুক পাখী দিয়ে রাজা লোরের কাছে পাঠান। ব্রাহ্মণ কৌশলে শুকপাখীর ইংগিতে লোরের হৃদয়ে ময়নার কথা জাগ্রত করতে

সমর্থ হন। ইতিমধ্যে চন্দ্রানীর একটি পুত্র হয়েছিল। সেই পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে চন্দ্রানীকে নিয়ে ময়নার কাছে ফিরে আসেন লোর এবং সুখে কাল যাপন করতে থাকে সকলে। এখানেই কাব্যের পরিসমাপ্তি। অনেকে এ কাব্যের উপাখ্যান ভাগকে চমকপ্রদ মনে করেন না—কিন্তু এমন না মনে করার হেতু দেখি না। আমাদের মতে এ কাব্যের কাহিনী নিরন্ধ্র না হ'লেও জমাট। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই আলাওল যেখান হ'তে হস্তক্ষেপ করেছেন সেখান হতে এ কাব্যের কাহিনী অনেকখানি শিথিল হ'য়ে গেছে। অন্ততঃ এ কাব্যে আলাওলের কবি-প্রতিভা দৌলৎ কাজীর প্রতিভার সমকক্ষ নয়। আলাওল দৌলত কাজী অপেক্ষা অধিকতর পণ্ডিত ব্যক্তি কিন্তু অনুভবের গভীরতায় আলাওলের মনোভংগী দৌলত কাজীর নিম্নেই। তাই কাব্যের শেষাংশে কেবল বাক্য-জাল বিস্তার করে আলাওল যখন কাব্যের গতিকে শিথিল-স্রোতা করেছেন—অনুভূতির গভীরতায় এবং সরল অন্তস্পর্শী বাক্-বিন্যাসে দৌলত কাজী তখন সমগ্র কাব্যখানিকে করে তুলেছেন নাটকীয় সংঘাতে দ্বন্দ্ব-সংকুল। তা' ছাড়া টুক্‌রো টুক্‌রো বর্ণনার মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ চিত্রকে পাঠক-চিত্তে সঞ্চারিত করে দেওয়ার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল দৌলত কাজীর—এই চিত্রাঙ্কনে আলাওল কাজী-কবির প্রতিভা-সীমাকে স্পর্শ করতে পারেননি। কাজী-কবির অনুভূতি-গুণের সাথে মিশেছিল তাঁর প্রকাশ-ভংগীর রিজুতা। রিজু ভাষণেই তাঁর বক্তব্য পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে গিয়েছে। কাব্যের মধ্যে ব্রজবুলির ব্যবহারে কাজী-কবি যে বিরল-বৈশিষ্ট্যের ও মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন আলাওলের পদে তা' নেই। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার বাইরেও ব্রজবুলির সার্থক প্রয়োগ এবং প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে আপনার অলোক-সামান্য প্রতিভা-বলে কাজী-কবি তা' আমাদের দেখিয়েছেন। শ্রাবণ মাসের দুঃখ বর্ণনার সামান্য অংশ আমরা এখানে তুলে দিলাম। এই বারামাস্যার সাথে প্রতি-দ্বন্দ্বীতায় দাঁড়াবার মত বারমাস্যা বাংলা সাহিত্যে বোধহয় আর কোথাও নেই—এমন কি মুকুন্দরামের বারমাস্যাও যেন এর পাশে অনেকখানি নির্জীব বলেই মনে হয়। শ্রাবণের অবিরল বারিধারা সাথে নায়িকা হৃদয়ের বেদনার্তিটুকু যেন অভিনব রূপাল্পনায় বিধৃত। মেঘলা' শাঙন-গগণ যেন সতী ময়নার বিরহ-ম্লান প্রাণ-প্রদেশের প্রতিবিম্ব ঃ

মালিনী কি কহব বেদন-ওর
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর।
শাঙন-গগণ সঘন ঝরে নীর
তবে মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর।
মদন-অসিক জিনি বিজলীর রেহা
থরক এ যামিনী কম্পয় দেহা।

এ প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-কবির 'রজনী শাঙণ ঘন ঘন দেওয়া গরজন' পদটির কথা মনে পড়বেই। রাধা-কৃষ্ণ-লীলা-চিত্রণের বাইরে ব্রজবুলির এমন সার্থক প্রয়োগ অন্যত্র বিরল।

আমরা পূর্বেই বলেছি সামান্য কথায় কাজী কবি একটি সম্পূর্ণ চিত্রকে পাঠক-চিত্তে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন। নিম্নের সামান্য কয়েকটি পংক্তির মধ্যে ময়নার সতীত্ব এবং দুর্লভ স্বামী-প্রেমকে কি অদ্ভুত ভাবেই না তুলে ধরেছেন:

না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল
আন পুরুষ নহে লোর সমতুল।
লাখ পুরুষ নহে লোরের স্বরূপ
কোথায় গোময় কীট কোথায় মধুপ।

এই তো দৌলত কাজীর স্বরূপ—তাঁর বৈশিষ্ট্য। সরল, অনাড়ম্বর ভাষা অথচ কি বিপুল তার বেগ!

বহুক্ষেত্রে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা সুন্দর রূপ পেয়েছে। বৃদ্ধা নারীর পরিণতি:

বৃদ্ধ হৈলে নারী যুবকের বৈরী
ফিরি তাকে না পুছারি
যাইব যৌবন নিশির স্বপন
জীবন দিবস চারি।

কবি সুফী মতাবলম্বী ছিলেন—মাঝে মাঝে সুফী মতেরও প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এসব একান্ত গৌণ—চলতি পথে কুড়িয়ে পাওয়া বনফুল। লৌকিক গাথা-কাব্যে মানবীর সুরটি কোথাও সমাচ্ছন্ন হয়নি। লোর চন্দ্রাণীর লীলা-চাপল্য ও কেলি-বিলাসকে অতিক্রম করে প্রধান হ'য়ে উঠেছে সতী-ময়নার জীবনচারণার চিত্র-সম্পদ। মানবীয় অবদানটিই এ কাব্যের মুখ্য রাগিণী। দৌলত কাজীর বীণা-যন্ত্রে সে রাগিণী অপূর্ব মীড় রচনা করেছে

খ ॥ মরদন (আনুমানিক ১৬০০-১৬৪৫): রোসাঙের দ্বিতীয় লৌকিক প্রেম-গাথার কবি মরদন দৌলত কাজীর সমসাময়িক ছিলেন। এর একটি মাত্র কাব্য "নাসীরা-নামা" রাজা সুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়। এঁর কাহিনীটি মৌলিক। 'অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়'—এই কথাই কাব্যটির প্রতিপাদ্য বিষয়। আবদুল করীম ও আবদুল নবী নামক দুই বণিক-বন্ধু পরস্পর বৈবাহিক বা বেয়াই হইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। আবদুল করীমের কন্যার নাম নসীরা বিবি এবং আবদুল নবীর পুত্রের নাম আবদুল সবীর। ঘটনাক্রমে দুই হবু বৈবাহিকের মধ্যে আবদুল করীমের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে এবং নাসীরার সাথে সবীরের বিবাহ প্রস্তাব ভেঙে যায়। এতে আবদুল করীম অপমানিত মনে করে। তার স্ত্রী স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে 'অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়' এই কথাটি গল্পের সাহায্যে অবতারণা করে। এইভাবে কাব্যটি গড়ে উঠলেও পরে আবদুল করীমের ভাগ্য ফিরে যায় এবং নসীরার সাথে সবীরের বিয়ে হয়।' এই হল কাহিনীর বক্তব্য। বলিষ্ঠ কোন কবি-ব্যক্তিত্বের পরিচয় এতে নেই, প্রকাশ-ভংগীতেও কোন বিশিষ্টতা ফুটে ওঠেনি। তবে লক্ষ্য করা উচিত কাহিনীটি সম্পূর্ণ লৌকিক ধারার অনুগামী। লৌকিক প্রেমই এ কাহিনীর গতিপথে তীব্র বেগ-সঞ্চার করেছে।

গ ॥ কোরেশী মাগন ঠাকুর (আনুমানিক ১৬০০-১৬৬০):

রোমাঙের তৃতীয় মুসলিম কবি। নামের শেষে "ঠাকুর" শব্দটি যুক্ত থাকায় ডক্টর সুকুমার সেন এঁকে অমুসলিম বলে সন্দেহ করেছেন কিন্তু ডক্টর এনামুল হক স্পষ্ট প্রমাণ করেছেন যে ইনি মুসলমান। ডক্টর হকের ভাষায় "মহাকবি আলাওলের আশ্রয়দাতা 'মাগন ঠাকুর' এবং 'চন্দ্রাবতী' কাব্য-প্রণেতা 'মাগন' বা 'কোরেশী মাগন' এক ব্যক্তি। তিনি আরাকানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কোরেশ বংশজাত সিদ্দীকী গোত্রভুক্ত মুসলমান ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল জানা যায় না। 'মাগন' তাঁহার ডাক নাম মাত্র। তাঁহার নিঃসন্তান মাতাপিতা আল্লার নিকট বহু আরাধনা করিয়া, আল্লার কাছ হইতে মাগিয়া তাঁহাকে লাভ করেন, এই জন্য তিনি 'মাগন' নামে অভিহিত হইতেন। স্বয়ং আলাওল মাগন ঠাকুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাঁহার ন্যায় নানা গুণশালী মনীষী তৎকালে রোসাঙে ছিলেন

না তিনি আরবী, ফরাসী, বর্মী ও সংস্কৃত ভাষা জানিতেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার কতখানি অধিকার ছিল 'চন্দ্রাবতী' কাব্যই তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি সংগীত, নাট্য, কাব্য ও অলংকার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে আরাকানেই পরিণত বয়:সে তাঁর মৃত্যু হয় এবং তিনি তথায় সমাহিত হ'ন।"

মাগনের একটি মাত্র কাব্য 'চন্দ্রাবতী'। কিন্তু এ কাব্যটিতে লৌকিক কাহিনীর আবরণে রূপকথার গল্প বিন্যাস করা হ'য়েছে। ভদ্রাবতী নগরের রাজপুত্র বীরভান এবং সিংহলদ্বীপের রাজকন্যা চন্দ্রাবতী এ কাব্যের নায়ক-নায়িকা। রূপ এবং বীর্যের কথা শুনে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে নায়ক 'জালিয়া', 'গোবার', 'ডিঙ্গা', ইত্যাদি সহস্র নৌকাসহ সিংহল-যাত্রা করেন। এবং তথায় বহু দুর্বিপাকের ভিতর দিয়ে অবশেষে চন্দ্রাবতীকে বিয়ে করেন।

এ কাব্যটিরও কোন বিশিষ্টতা নেই। রূপকথা সুলভ কয়েকটি অসম্ভব ঘটনা কাব্যটিকে অবাস্তব করে ফেলেছে। লক্ষ্মীর বিষয় এ কাব্যেও উদ্ভব কিন্তু লৌকিক প্রেমের পটভূমিতেই।

ঘ॥ মহাকবি আলাওল (আনুমানিক ১৬০৭-১৬৮০): এই সুপণ্ডিত বর্ষীয়ান কবি সমগ্র বাংলা সাহিত্যের কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রোসাঙের মুসলিম কবিদের মধ্যে তো বটেই, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মুসলিম কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তিনি একাধারে পণ্ডিত এবং প্রবীণ, বর্ষীয়ান এবং বিদ্বান। তিনি বহু ভাষাবিদ্ এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতাও। এত অধিক পরিমাণ গ্রন্থ প্রাচীন বাংলার আর কোন কবিই প্রণয়ন করেননি। কাব্যের বিষয়-বস্তুও তাঁর বহু বিচিত্র। তিনি কেবল লৌকিক প্রেম-গাথা রচনায় আপনার বিপুল কাব্য-প্রতিভাকে আবদ্ধ রাখেননি—লৌকিক প্রেম-কাব্যের সাথে লিখেছেন ধর্মীয় গ্রন্থ। ইস্‌লামী সংস্কৃতির সাথে রচনা করেছেন রাধাকৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক পদাবলী। সুতরাং এই বহু বিচিত্র প্রতিভার সাথে বাংলার খুব কম কবিই প্রতিযোগিতায় নামার স্পর্ধা রাখে।

কবির জীবন-কাহিনী বৈচিত্র্যময় এবং ঘটনাবহুল। সংক্ষেপে তাঁর জীবনের ঘটনা-পঞ্জীকে এইভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে: ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার 'জোবরা' নামক

গ্রামে আলাওলের জন্ম হয়—ডক্টর এনামুল হকের সংশয়হীন এই মত কতটুকু সত্য সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈতার সম্ভাবনা আছে। যা' হোক সন তারিখ আর জন্মস্থান নিয়ে বিবাদে আমাদের কোন লাভ নেই। আমরা অতি সংক্ষেপে কবির ঘটনা-বহুল জীবনটি জেনে নিতে চেষ্টা করব। কোন সময় ঘটনা উপলক্ষে কবি এবং তাঁর পিতা ফতেয়াবাদ হ'তে জলপথে কোথাও যাচ্ছিলেন—পথিমধ্যে ফিরিঙ্গী জলদস্যু কর্তৃক তাঁরা আক্রান্ত হন এবং কবির পিতা শহীদ হন। কবি কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে আরাকান রাজদরবারে আসেন এবং রাজ আসোয়ার (Royal Body Guard বা রাজ-দেহরক্ষী অশ্বারোহী দলে ভর্তি হন। এখানে "মুখ্যপাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন" পণ্ডিত মাগন ঠাকুরের অযাচিত অনুগ্রহ লাভ ক'রে কবি তাঁরই নির্দেশে পদ্মাবতী' রচনা করেন। কবির দ্বিতীয় কাব্য 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল'। এটিরও রচনা আরম্ভ হয় মাগন ঠাকুরের নির্দেশে কিন্তু গ্রন্থ সমাপ্তির পূর্বে মাগনের দেহান্তর ঘটে। তারপর কবি সোলেমানের অনুগ্রহে তাঁর আশ্রমে থেকে এবং তাঁর নির্দেশে দৌলত কাজীর 'সতী ময়না' বা লোর-চন্দ্রানী'র উত্তরাংশের রচনা সমাপ্ত করেন। 'হপ্তপয়কর' কাব্যটিও রচিত হয় এই সময় সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদ-এর অনুরোধে। এরপর আলাওলের জীবনে আসে নতুন দুর্যোগ। এ সময় ঔরঙ্গজেবের ভয়ে শাহসুজা আসেন রোসাঙে কিন্তু কিছুদিন আনন্দে বসবাস করার পর শাহ-সুজা রোসাঙ-রাজের বিরাগ-ভাজন হ'য়ে কষ্টের মধ্যে পড়েন। 'মৃজা' নামে কোন লোক আলাওলের বিরুদ্ধে রোসাঙ-রাজের নিকট বলেন ফলে কবিকে পঞ্চাশ দিন "গর্ভবাস" যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়। অবশেষে আলাওলের নির্দোষিতা প্রমাণিত হয় এবং সৈয়দ মামুদ শাহার অনুগ্রহ লাভ করে তাঁরই নির্দেশে "সয়ফুল্‌মুলুক্ বদিউজ্জমাল" এর উত্তরাংশ রচনা করে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন। এরপর স্বয়ং রাজা চন্দ্রসুধর্মার আদেশে কবি আর একটি নূতন কাব্য "সিকন্দার নামা" রচনা করেন। অতএব কবির গ্রন্থ সংখ্যা দাঁড়াল মোট ছয়খানা। যথা: ক ॥ পদ্মাবতী খ ॥ সতী ময়না বা লোর চন্দ্রানী (উত্তরাংশ) গ ॥ হপ্ত-পয়কর ঘ ॥ তোহফা, ঙ ॥ সয়ফুল্‌-মুলুক্ বদিউজ্জমাল্‌, চ ॥ সিকান্দর নামা।

ক ॥ পদ্মাবতী: এটি কবির মৌলিক রচনা নয়। বিখ্যাত হিন্দী কবি মহম্মদ্ জায়সীর 'পত্নমাবৎ' কাব্যকে অবলম্বন করেই কবি এ কাব্য রচনা করেন।

ইটি রূপক-কাব্য কিন্তু এর কেন্দ্রিয় ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক সত্য। চিতোরের রাণী পদ্মাবতী এবং দিল্লী-সম্রাট আলাউদ্দীনের প্রেম-কাহিনী এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের ওপর কাব্যটি গড়ে উঠেছে। এ কাব্যটি 'পদুমাবৎ'-এর অনুকরণে রচিত হ'লেও এর মধ্যে কবির কল্পনাও মিশে আছে যথেষ্ট। প্রয়োজন মত তিনি মূল গ্রন্থের কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন আবার কোন অংশ বা নতুনরূপে সংযোজিত করেছেন আবার মূলগ্রন্থের কোন সংক্ষিপ্ত অংশকে তিনি আপনার অলোকসামান্য প্রতিভাবলে অপূর্ব ব্যঞ্জনালোকে তুলে ধরেছেন। বলাবাহুল্য এই পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনে কাব্যের তো কোন অঙ্গহানি হয়নি বরং রূপ-লাবণ্যে অধিকতর ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায় "সাতসমুদ্র খণ্ড" এবং "স্ত্রী-ভেদবর্ণন-খণ্ড" দুটি আপন গ্রন্থ হ'তে বর্জন করে কবি ভালই করেছেন। পদ্মাবতী যখন সখীদের নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে স্বামীগৃহে যাত্রা করছেন সে সময়কার বর্ণনায় পরিবর্ধনের মাধ্যমে কবি আলাওল যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এ অংশটি আন্তরিকতার গুণে বাস্তব এবং ক্রন্দন-সিক্ত হ'য়ে উঠেছে—মূল হ'তে তো উত্তম বটেই। পদ্মাবতীর সখীদের নিকট বিদায় প্রার্থনা :

গমনের কাল যদি নিকট হইল। পদ্মাবতী সব সখীগণ আনাইল॥···
একে একে গলে ধরি কান্দে বারবালা। সকল ছাড়িয়া আমি যাইব একেলা॥
তোমরা সবেরে কোন মতে পাশরিব। স্মরণ হইলে মনে জ্বলিয়া মরিব॥
শুন প্রাণ সখী আমি চলি যাব যথা। তথা গেলে পুনি ফিরি না আসিব এথা॥
যেই দিন লাগি সখী মনে ছিল ভীত। সেই দিন আসি আজি হৈল উপস্থিত॥
পরদেশী হৈল বলি দয়া না ছাড়িও। অবশ্য বারেক মোরে স্মরণ করিও॥
তুমি সব ভাগ্যবতী রহিলা স্বদেশে। মোর মনে রহিলেক এ জনম ক্লেশে॥

এখানে কবির স্বদেশ প্রীতিটুকুও লক্ষ্য করার মত। এ অংশটুকু পাঠ করতে করতে শকুন্তলার বিদায়-দৃশ্যের কথা মনে পড়বেই।

কাব্যের সমাপ্তিতে কবি এ কাব্যের রূপক-ব্যঞ্জনার আধ্যাত্মিকতাটুকু সুন্দর রূপে তুলে ধরেছেন : "চৌদ্দ ভুবনের সব কিছু আছে মানুষের ঘটে। চিতোর হইতেছে মানব-দেহ, রাজা রত্নসেন মন, সিংহল হৃদয়, পদ্মাবতী বুদ্ধি, শুক পথ নির্দেশকারী গুরু, রত্নসেনের প্রথম পত্নী নাগমতী দুনিয়া-ধান্ধা, রাঘবচেতন শয়তান, আলাউদ্দীন-সুলতান মায়া"। কিন্তু এ রূপকটুকু দেওয়াতেও লৌকিক

প্রেমের অবদান ক্ষুণ্ণ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এ কাব্যের একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ লৌকিক আবেদন আছে। নায়ক-নায়িকা নামে মাত্র রাজা অথবা রাণী কিন্তু বর্ণনার সর্বত্রই মাটির মানুষের কথা বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি কবি ছিলেন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত। এ গ্রন্থের বাংলার সাথে বর্মী, আরবী, ফার্সী, জ্ঞান তো বটেই উপরন্তু আছে সংস্কৃতে রচিত ধর্ম-অলংকার-পুরাণ-শাস্ত্রাদির ওপর কবির গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয়। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় এ কাব্যে মুস্‌লিম-সংস্কৃতির সাথে হিন্দু-সংস্কৃতিটুকু যেন সুন্দর ভাবে মিলে গেছে। এক বৃন্তে দুই পুষ্পের মত এ'কে অপরের পরিপূরক হ'য়ে উঠেছে। এটি কবির হিন্দু-মুস্‌লিম মিলনাকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ।

প্রেমকেই কবি এ কাব্যের মূলীভূত শক্তিরূপে ধরেছেন। প্রেমের ওপর কবির আছে গভীর আস্থা—প্রেমই সব। গ্রন্থারম্ভেই প্রেমের ওপর এই নিশ্চল-নিষ্ঠার পরিচয়টুকু সুন্দররূপে তুলে ধরেছেন কবি :

যার ভাব রস দেশ সূক্ষ্ম মোক্ষ কাম॥
প্রেম হন্তে সকল যতেক হৈল নাম॥
প্রেম হন্তে পুত্রদারা প্রেম গৃহবাস॥
প্রেমেতে ধৈর্যতারূপ প্রেমেতে উদাস॥
প্রেম মূল ত্রিভুবন যত চরাচর।
প্রেম তুল্য বস্তু নাই পৃথিবী ভিতর॥
প্রেম কবি আলাওল প্রভুর ভাবক।
অন্তরে প্রবল পুণ্য প্রভুর আসোক॥…
প্রেমপুথি পদ্মাবতী রচিতে আশায়।
অসাধ্য সাধন মোর গুরু কৃপায়॥

কাব্যটি প্রেম-কাব্য তো বটেই, প্রেমের পবিত্রা পরিস্ফুটনের সাথে সাথে প্রতি পদে পদে ফুটে উঠেছে কবির কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, অদ্ভুত মনীষা ও ধীশক্তির পরিচয়। কাব্যটি নিঃসন্দেহে কবির শ্রেষ্ঠ রচনা। সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ।

খ॥ সতী ময়না বা লোর-চন্দ্রাণী : পূর্বেই বলেছি এ কাব্যটি সম্পূর্ণ কবির নিজস্ব নয়—দৌলত কাজীর অবরুদ্ধ কাজই আলাওলের আরদ্ধ। মূল কাব্য রচনার সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পর কবি উত্তরাংশ রচনা করে গ্রন্থটির পূর্ণাবয়ব দান করেন। এ কাব্যে আলাওলের বিশেষ কোন কলা-কৃতির পরিচয় নেই।

পাণ্ডিত্যে নয় কিন্তু কলা-কৃতির দিক দিয়ে আলাওল অপেক্ষা দৌলত কাজী নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

গ ॥ হপ্ত-পয়কর : এ কাব্যের উপাদান কবি সংগ্রহ করেছেন ফারসী কাব্য হ'তে। ফারসীতে কবি নিজামী রচিত 'হপ্ত পৈকর' কাব্যটিই কবির কাব্যের উৎস-ভূমি। হপ্ত-পয়করে আছে হপ্ত বা সপ্ত পয়কর। পয়কর অর্থে গল্প। সাত রাজকন্যার মুখ দিয়ে এ সাতটি গল্প বর্ণিত হ'য়েছে। এক সপ্তাহের শনিবার হ'তে আরম্ভ করে অপর সপ্তাহের শুক্রবার এই সাত দিনে মোট সাতটি গল্প সমাপ্ত হ'য়েছে। গল্পগুলির কোন মৌলিক বিশিষ্টতা নেই। নিছক আনন্দদানই বোধহয় এর উদ্দেশ্য। অবশ্য প্রাসঙ্গিক রূপে নীতিকথা ও উপদেশ আছে যথেষ্ট।

ঘ ॥ তোহ্ফা : এটি গাথা-কাহিনী কাব্য নয়—ধর্মীয় উপদেশের গ্রন্থ। এটিরও ভাব-উৎস ফারসী কাব্য। ফারসী ভাষায় "তোহ্ফা" লেখেন কবি ইউসুফ গদা। আলাওল ২৭৮ বৎসর পর কাব্যটির ভাষানুবাদ করেন।

ঙ ॥ সায়ফুল-মূলক বদিউজ্জমাল্ কাব্যটিও কবির মৌলিক রচনা নয়—এটিও ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থটির দুই-তৃতীয়াংশ রচনার পরে কবি গ্রন্থটির অবশিষ্টাংশ সমাপ্ত করেন। ফলে প্রথমাংশের রস-মাধুর্য শেষাংশে নেই। শেষাংশে কাহিনীর জমাটত্ব অনেকখানি শিথিল হ'য়ে গেছে। কাহিনী অংশ অবাস্তব। মিশরের রাজপুত্র সয়ফুল-মূলক্-এর সাথে পরী রাজ্যের সুন্দরী নায়িকা বদিউজ্জমালের পূর্বরাগ, প্রেম এবং মিলনের মধ্যেই কাহিনীর উৎস-ভূমি, পরিণতি এবং সমাপ্তি। এতে অনেক আজগুবি গল্পের অবতারণা আছে। তবে আলাওলের স্ব-জাত পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব লক্ষণীয়।

চ ॥ সিকান্দর নামা কবির সর্বশেষ রচনা। এটিও ফারসী কাব্যের অনুবাদ। ইতিহাসের কীর্তিখ্যাত বীর আলেকজাণ্ডারের অপর নাম ছিল সিকান্দার বা সেকেন্দর। এ কাব্যে তাঁরই দিগ্বিজয়ের কাহিনী অলংকার-সুষম গুরুগম্ভীর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

এ ছাড়াও আলাওল বহু বৈষ্ণব-পদ রচনা করেছেন। "বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলিম কবি ও কাব্য" অধ্যায়ে আমরা আলাওলের বৈষ্ণব কাব্য নিয়ে

আলোচনা করেছি। এ অংশের সাথে সেটুকু মিলিয়ে পাঠ করলে বৈষ্ণবপদ রচনায় আলাওলের কৃতিত্ব ধরা পড়বে।

সবশেষে আলাওল-সম্পর্কে আর একটি কথা বলা যেতে পারে। উপরের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি আলাওলের কোন কাব্যেই মৌলিক কল্পনা-প্রসূত নয়, প্রত্যেকটিই অনুবাদ। কিন্তু এই অনুবাদের মধ্যেও কবি তাঁর কবিত্ব-শক্তির জীয়ন-কাঠির স্পর্শ এমন ভাবে বুলিয়েছেন যে অনুবাদ কাব্যই মৌলিক-সৃষ্টির পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে। অনুবাদের কোন আড়ষ্টতা নেই এমনকি কোন বিজাতীয় ভাব পর্য্যন্ত নেই—এক সরল স্বাভাবিক নিটোল সৌন্দর্যের প্রতীক হ'য়ে কাব্যগুলি বিকশিত হয়ে উঠেছে। ভাষায় পাণ্ডিত্যের সাথে কবিত্বের, সারল্যের সাথে গাম্ভীর্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে। বহুমুখী প্রতিভার সাথে দুর্লভ কবিত্বের স্পর্শ এবং ভাষার ওজস্বিতা মিশে আলাওলের কাব্যকে করে তুলেছে অনন্য-সুন্দর।

ঙ॥ আবদুল করীম খোন্দকার: ইনি আরাকানের অধিবাসী। এঁর কাব্যগুলির মধ্যে 'দুল্লা মজলিস', 'হাজার মসাইল' এবং 'নূর-নামা' প্রধান। 'দুল্লা মজলিসের' পূর্ণ গ্রন্থটি পাওয়া যায় নি—খণ্ডিতাকারে আবিষ্কৃত হ'য়েছে। দুল্লা মজলিস এবং নূর-নামা মুসলিম মণীষী ও অলিআউলিয়াগণের জীবনী গ্রন্থ। তবে লক্ষণীয় বিষয় আরাকানের কবিদের কাব্যে লৌকিক প্রেমগাথা রচনার যে প্রয়াস চলে এসেছিল তা' এঁর কাব্যে নেই। এঁর সব কটি কাব্যই ধর্মীয় আবেদন-যুক্ত।

॥ তিন ॥

॥ চট্টগ্রামের কবিকুলের কাব্যালোচনা ॥

পূর্বে আমরা চট্টগ্রামের কবিকুলের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করেছি এখানে তাঁদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে আমরা দু'জন প্রতিনিধিস্থানীয় কবির কাব্যালোচনা করব। অন্যান্য পরিচয় জানার জন্য উৎসুক পাঠক ডক্টর এনামুল হকের "মুসলিম বাংলা সাহিত্য" পড়তে পারেন।

ক॥ সৈয়দ সুলতান (আনুমানিক ১৫৫০—১৬৪৮ খৃঃ): চট্টগ্রামের অন্তর্গত পরাগলপুরে আনুঃ ১৫৫০খৃঃ কবি জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যে

প্রাচীন কবিদের মধ্যে সৈয়দ সুলতানের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কবির সঠিক কবি-কর্ম এতদিন অজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি ডক্টর এনামুল হক কর্তৃক "মুসলিম বাংলা সাহিত্যের" ইতিহাসে কবির কাব্যগুলির একটি তালিকা এবং প্রমাণাদি সহ প্রতিটি গ্রন্থের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তা' দেখে কবির প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। আয়তনে প্রায় প্রতিটি কাব্যই বিশাল—কোন কোনটি আবার বিষয়বস্তুর প্রাচুর্য ও বর্ণনাভংগীর রিজু বলিষ্ঠতা নিয়ে মহাকাব্যের প্রান্তসীমা স্পর্শ করেছে। নিম্নে তাঁর রচিত কাব্যগুলি দেওয়া হ'ল :

ক ॥ নবীবংশ খ ॥ শব্-ই-মিরাজ গ ॥ রসুল-বিজয় ঘ ॥ ওফাৎ-ই-রসুল ঙ ॥ ইব্লিস্-নামা চ ॥ জ্ঞান-চৌতিশা ছ ॥ জ্ঞান-প্রদীপ জ ॥ জয়কুম রাজার লড়াই ঝ ॥ মারফতি গান ঞ ॥ পদাবলী।

প্রথম সাতখানি গ্রন্থই ধর্মীয় বিষয়ক। 'নবী-বংশ' সম্পর্কে ডক্টর হক সাহেব বলেছেন "কবি সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থগুলির মধ্যে 'নবী-বংশ' কাব্যটিকে 'ম্যাগ্নাম্ ওপাস্' (Magnum Opus) বা কবির শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম গ্রন্থ বলিতে পারা যায়। ইহা বিষয়-বৈচিত্র্য ও আকারে সপ্তকাণ্ড 'রামায়ণ'কেও হার মানাইয়াছে। এই কাব্যটিকে বাংলা মহাকাব্যের একটি মহান আদর্শ বলা চলে।" নবীবংশে কবি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং কৃষ্ণকে নবীরূপে কল্পনা কারছেন। ইসলাম-বিরোধী এই কল্পনা কবির উদার মনোভংগীরই পরিচায়ক। কবির পক্ষে এ এক দুঃসাহসিক অবদান। "শব-ই-মিরাজ গ্রন্থে কবি বর্ণনা করেছেন হজরত মহম্মদের বেহেস্তে-পরিভ্রমণের ঘটনা। "ওফাৎ-ই-রসুল" গ্রন্থে আছে হজরতের মৃত্যু-দৃশ্যের করুণ বর্ণনা। "ইবলিস নামা" গ্রন্থে আছে শয়তানের অপকীর্তির কথা। "জ্ঞান-চৌতিশা" এবং "জ্ঞান-প্রদীপ" এ দুখানি গ্রন্থেই তান্ত্রিক যোগ-সাধনার কথা লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। সৈয়দ সুলতানের রাধা-কৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক পদগুলিতে সুগভীর আত্মতন্ময়তার আভাস ফুটেছে। "বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলিম কবি ও কাব্যের" অধ্যায়ে আমরা কবির বৈষ্ণব মনোভংগীর আলোচনা করেছি। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

এঁর কয়েকটি পদে চর্যার সাংকেতিক-ধর্মী রচনা ও ভাব-ব্যঞ্জনার আভাস আছে :

কাহে কাহে ধনি বাগ বানায়া।
দুনিয়া মিছে ধান্দা লাগায়া ॥

এখানে সৈয়দ সুলতানের কবি-কর্ম সম্পর্কে একটি কথা বলা যেতে পারে। কবির সমুদয় কাব্য ইসলাম ধর্মীয় আবেদন-যুক্ত হলেও প্রতিটি কাব্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়-আকাঙ্খাটি ব্যাকুলভাবে ফুটে উঠেছে। বাংলাভাষায় ইসলাম ধর্মের তত্ত্বকথা প্রচার করা এবং হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটানই ছিল কবির হৃদয়াকাঙ্ক্ষা। কবি আলাওয়ালের মত তিনি একাধারে ছিলেন বিদ্বান এবং বর্ষীয়ান, সাধক এবং তত্ত্বজ্ঞানী। দুর্লভ কবিত্বশক্তির সাথে এই বহুমুখী প্রতিভার সংমিশ্রণ ঘটায় সৈয়দ কবির কাব্যগুলি বাঙালী প্রাণের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

খ॥ মহম্মদ খান (আনুমানিক ১৫৮০—১৬৫০): মহম্মদ খান সপ্তদশ শতাব্দীর কীর্তি-খ্যাত মুসলিম কবি। কবির নিবাস ছিল চট্টোগ্রামের হাটহাজারী থানায়। তাঁর পিতার নাম মুবারিজ খান, পিতামহ জালাল খান প্রপিতামহ নসরৎ খান।

আজ পর্য্যন্ত কবির চারখানি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। যথা: ক॥ সত্যকাল-বিবাদ সংবাদ খ॥ হানিফার লড়াই গ॥ মকতুল-হুসৈন ঘ॥ কিয়ামত-নামা। আসহাব-নামা, দজ্জাল-নামা এবং কাসিমের লড়াই বলে যে তিনখানি গ্রন্থ পৃথক ভাবে প্রচলিত আসলে এগুলি স্বতন্ত্র কাব্য নয়—মক্তুল হুসৈন অথবা কিয়ামত নামার অংশ।

মক্তুল হুসৈন কবির শ্রেষ্ঠ রচনা। এই গ্রন্থখানির পরিচয় দিতে গিয়ে ডক্টর হক সাহেব বলেছেন "ইহাই কবির 'ম্যাগনাম ওপাস বা শ্রেষ্ঠ কাব্য। বহুদিন পূর্বে কলিকাতার বটতলায় এই পুস্তক ছাপা হইয়াছিল। এখন এই মুদ্রিত পুঁথিটিও পাওয়া যায় না। ইহাতে কারবালার ঐতিহাসিক কাহিনীটিই বিবৃত হইয়াছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এমন দিনও গিয়াছে, এই 'মক্তুল হুসৈন' মহররমের সময় ঘরে ঘরে সুর করিয়া দল বাঁধিয়া পড়া হইত। এখনও কোথাও কোথাও হইয়া থাকে। বিষয়টি যতখানি ঐতিহাসিক, কাব্যে ততখানি ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয় হয় নাই। বোধহয় তজ্জন্যই ইহাতে কাব্যরস বিশদ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সত্যই কাব্যখানি করুণ রসের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

॥ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ॥

॥ এক ॥

॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যের পটভূমি ঃ দেশকাল ॥

কবি-কর্ম কবি-মানসের অভিব্যক্তি। কবি-মানস আবার পরিবেশ এবং প্রকৃতি-নির্ভর। পরিবেশ অর্থাৎ সমাজ এবং দেশকাল। ধর্ম, রুচি, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির সাথে কবি-মানসের যোগ প্রত্যক্ষ। কেননা কবি সামাজিক প্রাণী। তাই একের পরিবর্তনে অপরের পরিবর্তন অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। এই পরিবর্তিত মানস-ভংগী প্রত্যক্ষ এবং প্রতিফলিত হ'য়ে ওঠে কবির কাব্যে। মহাকবি ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে পাই সমাজ-রাষ্ট্রের পটভূমিতে এমনি এক পরিবর্তিত মানস-ভংগীর সুনিবিড় পরিচয়। সে সময়কার রুচি, ধর্ম, সমাজ-চরিত্র সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে অন্নদামঙ্গলের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। পূর্বের দেশকালের সাথে এই সময়কার রীতি-নীতি, ধর্ম-রুচি, সমাজ-রাষ্ট্র কেমন ভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হ'য়ে কোন্ পর্যায়ে এসে নেমেছিল এ প্রসঙ্গে তার ইতিহাসটুকু আমাদের জানা প্রয়োজন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা যে বলিষ্ঠ স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার মূলে আছে চৈতন্য-প্রভাব। মহাপ্রভুর একক ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে সমগ্র মধ্যযুগীয় সমাজ-সাহিত্য অপূর্ব বর্ণরাগে বিকশিত হ'য়ে উঠে ছিল। সাহিত্যের মধ্যে এই বিকাশ সূচিত হ'য়েছিল দেব-নির্ভর-মানবতার মূল্য বোধের মধ্যে। পূর্বে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় মানুষের যে ছবি অঙ্কিত হ'য়েছিল তা'তে মনুষত্বের কোন চিহ্ন ছিলনা। সে মানুষ মেরুদণ্ডভগ্ন, আত্মবিশ্বাসহীন পশুর নামান্তর—'অপদেবতার পূজারী, উপদেবতার উপাসক।' কিন্তু চৈতন্য দেবের প্রভাবে এই ভগ্নমেরু মানুষ হ'ল আপন আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান, রিজু

বলিষ্ঠতায় সুপ্রতিষ্ঠিত। উপদেবতার উপাশক হ'ল 'দেবতার লীলা সহচর' মানুষকে এই দেবায়িত করার মূলে রয়েছে শ্রীচৈতন্যের একনিষ্ঠ সাধনা। আর এই দেব-নির্ভর মানবতার রূপ পেয়েছি সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যে।

সমাজের বলিষ্ঠ কাঠামো গঠনের মধ্যেও রয়েছে মহাপ্রভুর আজীবন আচরিত ধ্যান-শক্তি। সকল দ্বেষ, সকল সাম্প্রদায়িকতা-বিনির্মুক্ত উদার প্রেমের অনাবিল ধারা দিয়ে তিনি ক্লেদ-ক্লীম ঘুনধরা সমাজের সকল মালিন্যকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছিলেন। শতধা-বিভক্ত গ্রামীন সমাজ আবার মহামিলনের সঙ্গম-তীর্থে একত্রিত হ'য়ে বলিষ্ঠরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। গ্রামগুলি হ'য়েছিল গোষ্ঠী-প্রধান। ব্যষ্টির নয় গোষ্ঠীগত সমুন্নতির দিকেই ছিল সকলের লক্ষ্য। কবি-শিল্পীগণের কাব্যে এই সমষ্টিগত ধ্যান ধারণাই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, গোষ্ঠীগত গ্রামীন-জীবনের ছবিই তাঁদের কাব্যে ঝলকিত। কবি-কর্মে যেমন প্রধান হ'য়ে উঠ্‌তো গ্রামীন-জীবনের কথা তেমনি সামাজিক অধিবাসীগণও সাগ্রহে গ্রহণ করতো কবির কাব্য। এ কাব্য পঠিত কিংবা গীত হ'তো অসংখ্য মুগ্ধ-চিত্ত শ্রোতার মাঝে। অর্থাৎ চৈতন্য-প্রভাব-স্নিত মধ্যযুগের গোষ্ঠী-প্রধান গ্রামীন সমাজের সাথে কবি ও কাব্যের ছিল সুনিবিড় সংযোগ। একে ছিল অপরের পরিপূরক। কিন্তু যুগের প্রভাবে, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক গোলযোগে এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ল, গোষ্ঠী-চেতনায় ঘুন ধরল, গ্রামীন-সামাজিক কাঠামো ভেঙে গেল। শ্রদ্ধেয় ভূদেব চৌধুরীর ভাষায়: "স্বভাবতঃই, ভাটার টানে বিপর্যয় যখন অনিবার্য হ'ল, তখনও জাতীয় জীবনে তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে এই ত্রিপথ বেয়ে। প্রথম ভেঙেছে মধ্যযুগীয় বাঙালি-চেতনার জীবন-পটভূমি গ্রামীন সমাজ। তার সংগে সংগে শিথিল হ'য়েছে ঐতিহ্য-সচেতনতা। সব শেষে লুপ্ত হ'য়েছে প্রাচীন মূল্যবোধ।"

এখন যে রাষ্ট্রীয় গোলযোগে মধ্যযুগীয় এই গোষ্ঠীগত গ্রামীন সমাজে ভাঙন ধরেছিল, ব্যষ্টি-চেতনার প্রাধান্য ঘটেছিল তার ইতিহাসটুকু জানার চেষ্টা করব।

বাংলা দেশ মোঘল-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয় আকবরের আমলে—১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে। এর পূর্বে বাংলা দেশ ছিল পাঠানদের অধিকারেই। পাঠানদের সাথে বাংলা এবং বাঙালীর যে সম্পর্ক ছিল তা' শাসক-শাসিতের নয়, আপনার আত্মীয়ের মত। প্রথম দিকে একটু বিজাতীয় ভাব থাক্‌লেও শেষ দিকে তাঁরা মনে প্রাণে বাঙালী ভাবাপন্ন হ'য়ে উঠেছিলেন। কিন্তু মোঘল অধিকারে

বাংলা দেশের শাসন ভার নিয়ে যাঁরা এদেশে আসতেন—তাঁদের মধ্যে ছিল শাসকের গাম্ভীর্য, বিজাতীয় ভাব। এঁরা সকলেই মনে প্রাণে ছিলেন দিল্লী-বাসী। এঁরা নিজেদের মধ্যেই এক শাসক-সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন। তাই বাঙালীর সাথে বাঙালী না হ'য়ে বিজাতীয় মনোভাবে তাদের সংস্কৃতিকে দূরে সরিয়ে এঁরা দিল্লী থেকে বহন করে এনেছিলেন মুঘল-সংস্কৃতি, বাদশাহী-বিলাস, আর্থিক-সম্পদ আর সেই সাথে বাদশাহী-বিলাসের অনিবার্য ফলস্বরূপ উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাত্রা, কু-রুচি পূর্ণ কেলি-বিলাসের ইংগিত। "ফলে, মোঘল অধিকারের প্রারম্ভ থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনাধিকারকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশে একাধিক নগর-সহর গড়ে উঠেছে। তা' ছাড়া, বাদশাহী শাসনের কল্যাণে বঙ্গভূমি সর্ব ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছিল। ফলে, ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান-প্রদানের সম্ভাবনা হ'য়েছিল ব্যাপক। সেই সঙ্গে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যের প্রায় অবাধ অধিকার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন স্বয়ং আকবর ও তাঁর পরবর্তীরা। ফলে, বাংলার নানা অঞ্চলে বাণিজ্যিক সহর-বন্দর গড়ে উঠছিল দ্রুত গতিতে। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিকার লাভ করে, পর বছরই আকবর পর্তুগীজ বণিক্‌দের হুগলীতে বাণিজ্য-কুঠি গড়ে তোলার ফরমান দিয়েছিলেন। ক্রমে ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী বণিক্‌দের বাণিজ্য-নগরী নদীমাতৃক বাংলার পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র মাথা তুলেছিল।" এই হ'ল সুরু। এর ফল যে কি ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছিল তার সন্ধান আমরা অনেকেই জানি। নগর-সভ্যতার জৌলুসে, বিলাস-ব্যসনে, উচ্ছৃঙ্খল কেলি-বিলাসে আকৃষ্ট হ'য়ে বাঙালী ধনিক সহরমুখী হ'য়েছিলেন। যাঁরা ছিলেন এতদিন চৈতন্য-প্রভাব-সংগঠিত গোষ্ঠী-প্রধান বাংলার গ্রামীন সমাজের মেরুদণ্ড এইভাবে তাঁরা গ্রাম ত্যাগ করে নগরাভিমুখী হওয়ায় গ্রামীন-কাঠামো সমূলে ভেঙে গেল। যারা পড়ে রইল গ্রামে তারা নিরক্ষর, অসহায়। এইভাবে মধ্যযুগীয় পল্লী-কেন্দ্রিক সমাজ-জীবনের সমাধি রচিত হ'ল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য গড়ে উঠেছে এই চাক্‌চিক্যময় নাগর-সভ্যতার পটভূমিতে। যে নবদ্বীপ এতদিন ছিল নিখিল বাংলার পীঠস্থান সেখানেও এল দরবারী প্রভাব। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় তাইতো দেখি মোঘল সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব, উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাত্রার পদচিহ্ন, অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বর। অন্নদামঙ্গল কাব্যের পটভূমি

এই কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা, ভারতচন্দ্র তাঁর সভাকবি। শান্ত-স্নিগ্ধ গ্রাম্য-পটভূমিতে নির্মল প্রদীপের আলোতে গ্রাম্যকবি যে সরল অনাড়ম্বর ভাষায় প্রাণের কথা, জাতীর কথা বলে যেতেন আজ সেখানে প্রজ্জ্বলিত হ'লো ঝাড় লণ্ঠন উজ্জ্বল তার আলোক, প্রখর তার দীপ্তি—তাই সরল অনাড়ম্বর পয়ার-পাচাড়ীর বদলে দেখা দিল মণ্ডণকলানিপুন বাক্-বিন্যাস, অলংকার-সর্বস্ব কাব্য-রীতি। ভারতচন্দ্রের অন্নদা মঙ্গল কাব্য এই অলংকৃত বাক্-বিন্যাসের সার্থক উত্তরাধিকারী।

নাগার সভ্যতার প্রভাবে গ্রামীন সমাজের কাঠামো ভেঙেছে, রুচির বিকার ঘটেছে—এ আমরা দোখছি। এই সাথে আরও একটি জিনিষ লক্ষ্য করার মত। চৈতন্যদেবের আজীবন আচরণের মধ্যে দিয়ে যে গোষ্ঠী-চেতনা গড়ে উঠেছিল এই নাগর সভ্যতার দ্বারা তারও শ্মশান-চিতা প্রজ্জ্বলিত হ'য়েছে। গোষ্ঠী-চেতনার ধংসস্তুপের উপর জেগে উঠেছে ব্যষ্টি-চেতনা। বহুজনের ধ্যান চিন্তা নয়, একার ধ্যান-কল্পনা; গোষ্ঠীর উন্নতি নয়, ব্যষ্টির উন্নতির দিকেই নিবদ্ধ হ'ল সকলের দৃষ্টি। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে এই ব্যষ্টি-চেতনা আপন-স্বাতন্ত্রে স্বাক্ষরিত হ য়েছে।

পূর্বেই বলেছি মহাপ্রভুর প্রভাবে ঘটেছিল দেব-নির্ভর মানবতার বিকাশ, উপদেবতার উপাশক হ'য়েছিল দেবতার লীলা-সহচর। কিন্তু নাগর সভ্যতার বিচার-বিশ্লেষণের যুগে মানুষ দেবতার উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেল্‌ল। এই অবিশ্বাসের সুর অন্নদামঙ্গলের বহুস্থানে পরোক্ষ ভাবে ধ্বনিত হ'য়েছে। ভারতচন্দ্র গ্রন্থ রচনা করেছেন কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য, তাঁরই নির্দেশে তবুও গ্রন্থোৎপত্তির কারণ হিসাবে তিনি দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ এ-উল্লেখ পূর্বরীতি অন্ধ্য অনুবর্তন মাত্র, দেবীকে অস্বীকারেরই নামান্তর। এখন আর দেব-নির্ভর মানবতা নয় দেব বিনিমুক্ত মানবতার সুর প্রধান হ'য়ে উঠেছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর আচার-আচরণ অনেকখানি স্বাভাবিক বলেই মনে হয় কিন্তু অন্নদামঙ্গলের দেবদেবীর আচরণ হাস্যস্পদ, অবিশ্বাস্য। মঙ্গলকাব্যের কাঠামো বজায় রাখতে গিয়ে কবি জোর করে নাম মাত্র একজন দেবীকে খাড়া করেছেন। শ্রদ্ধেয় ভূদেব চৌধুরী তাই যথার্থই বলেছেন: "কালিকামঙ্গল নামে অভিহিত কাব্য প্রবাহকে 'বাংলা মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। কালিকামঙ্গলের

দেবী কালিকা বিশেষ পারিভাষিক অর্থে 'মঙ্গল-দেবতা' নন, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত তান্ত্রিক কালিকা দেবীর সঙ্গেও ইনি সর্বাংশে সম-সূত্রাজ নন। কালিকামঙ্গল বিশেষ ভাবে বিদ্যা ও সুন্দরের রোমান্টিক লোক-জীবনাশ্রয়ী প্রেম-চাতুর্য গাথা। কেবলমাত্র বাংলা দেশেই এই অবিমিশ্র মানবিক প্রেম-কাহিনী দেবী কালিকার কৃপাবরণের অন্তরালবর্তী হ'য়ে প্রকাশিত হ'য়েছে। কিন্তু, এখানেও জীর্ণ আবরণজাল অপসারণে কোন অসুবিধা হয় না।" অন্নদামঙ্গল সম্পর্কেও এ কথাগুলি পূর্ণ সত্য। কেবল অন্নদামঙ্গল কেন— এযুগে শিব-মঙ্গল, দুর্গা-মঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল নামে যত মঙ্গলকাব্য রচিত হ'য়েছিল তাদের একটিকেও হয়ত মঙ্গলকাব্য বলা চলে না। যে পৌরাণিক কাহিনী মধ্যযুগের কাব্য-সাধন-ধারা হ'তে প্রায় নির্বাসিত হ'য়েছিল এই মানসিক এবং সামাজিক রুচিবিকারের যুগে তাদের আবার পুনর্জাগরণ হ'ল। এবং এই পৌরাণিক চেতনার ফলে মুকুন্দরামের চণ্ডী ভারতচন্দ্রে অন্নদায় পরিণত। কেবল পুরাণের প্রভাব মাত্র নয়—এযুগের কাব্যগুলি পুরাণ কাহিনীর ভাষানুবাদ মাত্র, কবির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নেই, প্রকাশ ভংগীতেও কোন কলাকৃতি প্রকাশ পায় নি।

আর একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করে আমরা এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি করব। পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি গোষ্ঠীর সাথে সাহিত্যের ছিল অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র। কবি কর্মের সাথে সর্বসাধারণের ছিল অন্তরের যোগ। কিন্তু নাগরিক পরিবেশে যে সাহিত্য গড়ে উঠছিল তার সাথে গণচিত্তের যোগ বিশেষ ছিল না। "গ্রামীন লোকেরা চর্চা ও চর্যার অভাবে গ্রামীন আদর্শ থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল,—তাদের 'চিত্ত জলাশয়ের জল' আসছিল শুকিয়ে।" এইভাবে হৃত-সর্বস্ব গ্রাম্য সমাজের সাথে সহরের বিভেদ ক্রমান্বয়ে ব্যাপক হ'য়ে উঠল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে এই বিভেদের সুর ধ্বনিত হ'য়েছে। গ্রাম নয়, গ্রামীন সমাজও নয়—নাগরিক পরিবেশে তার জন্ম, তার লালন, তার পরিবর্ধন এবং পরিপুষ্টি।

॥ দুই ॥

॥ অন্নদামঙ্গল ও ভারতচন্দ্রের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ॥

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য এবং তাঁর কাব্য-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা

করার পূর্বে আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি সাহিত্যিক সামাজিক প্রাণী। সামাজিক খুঁটিনাটি পরিবর্তনও তাঁর মাধ্যমে সাহিত্যে রূপায়িত হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র সম্পর্কে সব থেকে বড় অভিযোগ তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ জয়লাভ করেছে—বাংলার তথা ভারতের গৌরব-রবি অস্তমিত হ'ল অথচ এত বড় একটা ঐতিহাসিক ঘটনা এ যুগের সাহিত্যে বিশেষ করে ভারতচন্দ্রের মত দূরদ্রষ্টা কবির কাব্যে স্থান পেল না। কেন? এ সম্পর্কে কেউ কেউ ফরাসী বিপ্লবের নজির দিয়ে থাকেন। ফরাসী বিপ্লবের কাহিনী ইতিহাসে যা' না আছে তার বহুগুণ বেশী স্থানলাভ করেছে এই যুগের শিল্প-সাহিত্যে। অথচ পলাশী যুদ্ধের মত এতবড় একটা ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে বাংলার কবিকুল নিরব কেন। দু'দিক হ'তে বিবেচনা করে এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করেই ইংরাজেরা দেশের রাজা হ'য়ে বসেনি। প্রথমে তারা নবাব করেছে 'ভারবাহী পশু' মীরজাফরকে। মীরজাফর পুতুল—পুতুলকে উপলক্ষ্য করেই তাদের অর্থ-লিপ্সু শাসন-যন্ত্র পরিচালিত হ'য়েছে যথেচ্ছা ভাবে। মীরজাফরের পর এল মীরকাসিম। কিন্তু মীরকাসিম ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ইংরাজদের 'প্রহসন অভিনয়ের' সার-মর্মটুকু বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। ফলে তিনি স্বাধীন মত নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন ইংরাজদের বিরুদ্ধে—কিন্তু তখন বিলম্ব হ'য়ে গেছে অনেক। উপায় আর ছিল না। ইংরাজরা একে একে শাসনের সকল কিছু করাতল গত করে এত-দিনের গোপন-লীলাঙ্কে ইতি টেনে প্রত্যক্ষভাবে রাজদণ্ড হাতে নিল। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশজয় করেও তারা সরাসরি দেশ-নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় নি। ফলে এ আঘাতও তত তীব্র হ'য়ে দেখা দিই নি দেশবাসীর মনে। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজেরা রাজা হয়েও স্থানীয় শাসন ছেড়ে দিয়েছিল ইংরাজ-পদ-সেবী আমীর-ওমরাহের হাতে। সুতরাং এখানেও শাসক-শাসিতের প্রত্যক্ষ ভেদরেখাটুকু তীব্র হ'য়ে উঠতে পারে নি। বোধহয় এসব কারণেই ঐ সময়কার কাব্য-সৃষ্টিতে তথা ভারতচন্দ্রের কাব্যে পলাশীর যুদ্ধের কথা নেই। ভারতচন্দ্র হ'য়েছিলেন কেবল নেপথ্য-দর্শক।

এবার মহাকবি ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম অন্নদামঙ্গলের আলোচনা।

অন্নদামঙ্গল কাব্য রচিত হ'য়েছিল ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে। এ কাব্য মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের আদর্শেই গড়ে উঠেছে, মুকুন্দরামের প্রভাব ভারতচন্দ্রের কাব্যে ব্যাপক এবং গভীর। সে যাই হোক অন্নদামঙ্গল কাব্যকে ঠিক মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচকের একটি মূল্যবান উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে: "ভারতচন্দ্রের কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন এবং তৎফল-প্রসূত ব্যক্তিগত আধিভৌতিক সমুন্নতি। সেদিক থেকে অন্নদা-মঙ্গলকে 'ভবানন্দমঙ্গল' নামে আখ্যাত করলেই ভাল হত। কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষ ভবানন্দের বিজয়-কথা বর্ণনাই ভারতচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; প্রসঙ্গতঃ এসেছে ভবানন্দের কৃপাকর্ত্রী অন্নপূর্ণার কথা। এখানেই দেখব নূতন বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত। এখানে একটি আত্মপরতন্ত্র ব্যক্তিপ্রতিভা আর একটি ব্যক্তিত্বের বিজয়-কথা বর্ণনা করেছে, যে সর্বপ্রকার দৈবীমহিমা বিবর্জিত, নিছক চাতুর্য-কলাকুশল আধিভৌতিক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন মানবিক ব্যক্তিত্ব মাত্র। এই ব্যক্তি-সর্বস্বতা এবং এই মানবিকতা, individuality এবং humanity-ই নবযুগের লক্ষণ।"

অন্নদামঙ্গল কাব্য তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডকে যথার্থ অন্নদামঙ্গল বলা চলে। এ খণ্ডে গ্রন্থ সূচনা, কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বর্ণনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ এবং পৌরাণিক পটভূমিতে দেবী অন্নপূর্ণার মহিমা কথন, তারপর লৌকিক পট-ভূমিতে এই দেবীর মহিমার বিস্তারিত বর্ণনা। দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনী এবং 'তৃতীয় খণ্ডই যথার্থ ভবানন্দমঙ্গল'। কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এ কাব্যের মধ্যে ভারত-চন্দ্রের কবি-কর্মের যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটেছে প্রধান ভাবে আমরা সেগুলিই দেখে নিতে চেষ্টা করব।

ক ॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যের পটভূমির আলোচনায় আমরা দেখেছি অন্নদা-মঙ্গলের উৎস-ক্ষেত্র নাগরিক পরিবেশ। আলোকোজ্জ্বল রাজসভার বাদশাহী-বিলাসের মধ্যে তার পরিপুষ্টি এবং পরিবর্ধন। রাজার মনোরঞ্জন এবং আপনার পাণ্ডিত্য-বিকাশের দিকেই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সুতরাং প্রাণ নয় ভংগীর বিকাশই তাঁর কাব্যে প্রধান হ'য়ে উঠেছে। অর্ধ সহস্র শতাব্দী-ব্যাপী সমগ্র মধ্যযুগীয় কাব্য-ধারার মধ্য দিয়ে ভাব-প্রকাশের যে সরল

অনাড়ম্বর রীতিটি চলে এসেছে ভারতচন্দ্রের হাতেই তার সমাপ্তি ঘটেছে। সরল, সহজ, অনাড়ম্বর প্রকাশ-রীতির বদলে দেখা দিল অলংকার-সমৃদ্ধ, রীতি-বহুল, চাকচিক্য-প্রজ্জ্বোল বাক্-বিন্যাস। নাগরিক সাহিত্যের গুণগুলি অনিবার্য রূপে দেখা দিল ভারতচন্দ্রের কাব্যে। অন্নদামঙ্গলের প্রকাশ-রীতি নিয়ে আমরা পৃথক এবং বিস্তারিত আলোচনা করেছি সুতরাং এখানে অধিক বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

খ॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে ঘটেছে মানবতার নবীন অভ্যুদয়। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের মূলভাব দেব-নির্ভর মানবতা। দেবতার ওপর নির্ভর করেই মানবতার বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যেই সর্বপ্রথম দেখা গেল দিব-বিনির্ভর মানবতা-প্রকাশের তীব্র ব্যাকুলতা। অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডের অন্নপূর্ণা এবং দ্বিতীয় খণ্ডের কালিকা দেবী নামমাত্র দেবীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। এঁদের বিধিনিষেধে কাব্যের নায়কদের কিছুই যায় আসেনি—বরং এ দেবী নায়কদের খেয়াল-খুশী চরিতার্থের রসদ যুগিয়েছেন। এঁদের অঙ্গে আছে দেবীত্বের জীর্ণ খোলস—সহজ-ছেদ্য। দেবীত্বের আবরণে এঁদের ভিতর মানবতারই প্রকাশ ঘটেছে। তা' ছাড়াও নায়ক-নায়িকাদের কার্যকলাপে দেব-বিনির্ভরতার সুর ফুটেছে সমধিক। ভগবৎ-শক্তির উর্ধে মানবতাব এই বিকাশের মধ্য দিয়েই হ'য়েছে আধুনিক সাহিত্যের যুগাভিসার।

গ॥ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আর একটি প্রধান সুর গোষ্ঠী-চেতনা। সমষ্টিগত ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্খাই এ যুগের কাব্যে বিকশিত হয়েছে কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে সর্বপ্রথম দেখা গেল ব্যষ্টি-চেতনা, সমষ্টি নয়—ব্যক্তিগত উন্নতিই ভারতচন্দ্রের কাম্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনে তাই তো তিনি তৎপর। এই একক ব্যক্তিত্বের বিকাশও আধুনিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ।

ঘ॥ ভারতচন্দ্রের সমগ্র কাব্য সাধনার মধ্য দিয়ে কবি-ব্যক্তিত্ব প্রধান হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। চণ্ডীদাসের কাব্যে কবি-ব্যক্তিত্ব নেই—বিদ্যাপতিতে আছে। তেমনি মুকুন্দরামে কবি-ব্যক্তিত্বের অভাব কিন্তু ভারতচন্দ্রের তার প্রাচুর্য! অন্নদামঙ্গল সচেতন মনের সৃষ্টি। প্রতিটি স্তবক এবং পংক্তির মধ্য দিয়ে কবির সৃষ্টি-সচেতনতা এবং কবি-ব্যক্তিত্ব ঝংকৃত হয়ে উঠেছে।

এই কবি-ব্যক্তিত্বের মধ্যেই ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রাণ-স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে।

ঙ॥ ভারতচন্দ্র একাধারে রূপদক্ষ এবং রূপশিল্পী। তবে রূপশিল্পীতে তিনি উন্নতশীর্ষ। দেখা এবং প্রত্যক্ষের অভাব তিনি অনেক স্থানে কল্পনা এবং গতানুগতিক কাহিনী-ধারা অনুসরণ করে পূরণ করে নিয়েছেন।

চ॥ রূপদক্ষতায় কিছু অভাব থাকলেও গঠন-রীতিতে ভারতচন্দ্র প্রায় নির্দোষ। গঠন-রীতির বলিষ্ঠতার জন্য তাঁর কবি-কর্ম ক্লাসিক্যাল-ধর্মী হ'য়ে উঠেছে! গোবিন্দদাসের কাব্য-সাধনার মত ভারতচন্দ্রের কাব্য 'কুন্দে যেন নিরমান'। প্রকাশ-ভংগীতে এ বিশেষণ ভারতচন্দ্র সম্পর্কে পূর্ণ সত্য; তিনি 'কর্দম' দিয়ে কাব্য-কুটিরের জীর্ণ দেওয়াল নির্মাণ করেননি, কর্দম পুড়িয়ে ইষ্টক করেছেন, সেই ইষ্টক দিয়েই তিনি নির্মাণ করেছেন কাব্য-সৌধ —সৌন্দর্যের তাজমহল। ভারতচন্দ্রের শিল্প-রীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানেই। গঠন-রীতিতে সত্যই তিনি ক্লাসিক-ধর্মী।

ছ॥ গঠন-রীতির দিকে সমুদয় মনঃসংযোগ ও চিত্ত-রস ব্যয়িত হওয়ায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে আত্মবিস্মৃতি ভাবটি নেই। অবশ্য বৈষ্ণব কবিদের মত আত্মতন্ময়তা ও আত্মবিস্মৃতি ভাবটি কোন মঙ্গল কবির মধ্যেই পাওয়া যায় না—তথাপি ভারতচন্দ্র যেন অত্যন্ত সচেতন-শিল্পী। অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের কবিগণের মধ্যে টুক্‌রো বর্ণনার মধ্যে ক্ষণিক আত্মোপলব্ধির ভাবটি আছে কিন্তু ভারতচন্দ্রের মধ্যে তা' বিরল-দৃষ্ট।

জ॥ চরিত্র-সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র কোন বিশেষ মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেন নি। এর জন্যে তাঁর ব্যক্তি-সর্বস্ব কবি-মানস এবং বিশেষ করে তদানিন্তন সমাজ-জীবন এবং যুগ-মানস দায়ী। আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এ সম্পর্কে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায় "ভারতচন্দ্রের যুগে সমাজের জীবন-দৃষ্টি ইহার গভীরতম স্তর পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র উপরি-স্তরে লঘুভাবে বিচরণ করিয়াছে। রসিকের চিত্তাকাশে ধারাবর্ষী ঘনমেঘসঞ্চারের পরিবর্তে তখন জলভারহীন শারদীয় শুভ্র মেঘের উদয় হইয়াছিল।" ভারতচন্দ্রের চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে এই হাল্‌কা ভাবের শুভ্র মেঘের সঞ্চারণ দেখি। চরিত্রগুলির মর্মোদ্ঘাটন বা জীবন-জিজ্ঞাসার গভীরতম প্রদেশে তিনি অবতরণ করেন নি—গতানুগতিক পথেই পদচারণা

করে তিনি চরিত্রগুলির মুখে কেবল কয়েকটি অলংকার-সুষম বাক্য জুড়ে দিয়েছেন। এই মণ্ডণ-কলা-নিপুন চাকচিক্যময় বাক্‌-বিন্যাসের জন্মেই চরিত্রগুলি পাঠকের সম্মুখে চকিতে ঝলকিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু ঐটুকুই—পাঠক-চিত্তে তারা কোন গভীর দাগ কেটে দিয়ে যেতে পারে না। প্রকৃত-পক্ষে অন্নদামঙ্গলের প্রথমখণ্ডে একমাত্র ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্র ছাড়া অন্য কোন চরিত্রে ভারতচন্দ্রের মৌলিক সৃষ্টি-প্রতিভার স্পর্শ নেই। এ সম্পর্কে মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিকের মন্তব্যটি মূল্যবান: "চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়া …একমাত্র ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্রটি সার্থকতা লাভ করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার চরিত্র ও পরিবেশটি ভারতচন্দ্রের মৌলিক কল্পনার ফল নহে, মনসা-মঙ্গল কাব্য হইতে তাহা গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও ভারতচন্দ্র ইহাকে এক অভিনব রূপ দিয়াছেন—ভারতচন্দ্র মৌলিক সৃষ্টি-প্রতিভাকে অবলম্বন করিয়া, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরী পাটনী জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে—এমনটি ইহার আগে আর কখনো দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মনসা-মঙ্গল কাব্যে খেয়া পারাপার কারিণীর মধ্যে যে মানসিক পরিচয়টি তখনো প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের পরিকল্পনার মধ্যে তাহারই পূর্ণাঙ্গ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরী পাটনীর মধ্যে একান্ত মানবিকতার সন্ধানই ভারতচন্দ্রের একমাত্র কৃতিত্ব।" অধ্যাপক সুকুমার সেনের ভাষাতেও ভারতচন্দ্রের চরিত্র-সৃষ্টির কৃতিত্ব-দুর্বলতা সুন্দররূপে ধরা পড়েচে—"ভারতচন্দ্রের কাব্যে কোন রক্তমাংসের ব্যক্তিমানুষ নাই। সব চরিত্রই টাইপ, তাহারা মুখের কথার মানুষ। সুতরাং এ বিষয়ে মুকুন্দরামের সহিত ভারতচন্দ্রের তুলনা চলে না। মুকুন্দরামের হাতে দেবীর অনেকটা মানবীকরণ হইয়াছে। ভারতচন্দ্র তাহা করিতে পারেন নাই। অন্নপূর্ণা মঙ্গলে দরিদ্র গৃহস্থালীর বর্ণনাও বাস্তব নহে। ভারতচন্দ্রের বৃহৎ কাব্যের মধ্যে বাস্তব মানুষ পাই একটি,—তাও ঠিক নয়, একটি বাস্তব মানুষের ক্ষণিক আবির্ভাব। এ হইতেছে ঈশ্বরী পাটনী—গাঙ্গিনীর তীরে "সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী"। দেবীর গাঙ্গিনীর পার হওয়ার অল্প সময়টুকুর মধ্যে ঈশ্বরী পাটুনীর সরল মুগ্ধচিত্ত পাঠকের মন হরণ করিয়া লইতে এতটুকুও বিলম্ব করে না। "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" এই সামান্য প্রার্থনার মধ্যে শুধু ঈশ্বরী পাটুনীর নহে, অনাদিকালের দৈবহত

মূক দরিদ্র বাঙ্গালী নরনারীর চিরকালের স্নেহ-ব্যাকুলতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।”

ঝ॥ শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় ভারতচন্দ্রকে 'হাস্যরসিক কবি' বলেছেন। কিন্তু এ উক্তি পুরোপুরি সত্য নয়। তিনি মূলতঃ হাস্যরসিক কবি নন—তবে হাস্যরস-পরিবেশনের দিকে মাঝে মাঝে তাঁর ঝোঁক জেগেছে। আমরা পূর্বেই দেখেছি ভারতচন্দ্রের যুগে দেব-দেবতার ওপর বিশ্বাস অনেকখানি শিথিল হ'য়ে গেছে। মধ্যযুগের সেই জমাট বিশ্বাস-নিষ্ঠা অনেকখানি সন্দেহাকুল। এই অবিশ্বাসের ভাবটা ভারতচন্দ্রের কবিতায় সুন্দর রূপ পেয়েছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে এবং এই অবিশ্বাস-জনিত কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হাস্যরসের মূল উৎস। 'ভবসিন্ধু' পার হওয়া সম্পর্কে একটি সরস ব্যঙ্গ :

খাইয়া প্রসাদ ভাত   মাথায় মুছিব হাত   নাচিব গাইব কুতূহলে।
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি   পার হৈনু হেন মানি   সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে॥

সামাজিক কু-সংস্কারগুলি তুলে ধরে তার প্রতি কটাক্ষ-বাণ নিক্ষেপ করা হাস্যরসিক কবির একটি প্রধান উপকরণ। এই কু-সংস্কারগুলির ওপর ভারতচন্দ্র কটাক্ষপাত করতে ছাড়েন নি। তাঁর 'চাঁচাছোলা' উক্তি সমগ্র পরিবেশটাকে বেশ সহজ-সিক্ত করে তুলেছে। তবে এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণীয় মাঝে মাঝে ভারতচন্দ্রের হাস্যরসিকতা গ্রাম্যতার ধার ঘেঁষে গিয়েছে।

ঞ॥ ঈশ্বর গুপ্ত হতে আজ পর্যন্ত অসংখ্য সমালোচক ভারতচন্দ্রের কাব্যের সমালোচনা করেছেন। এই সমালোচনায় কোন কোন বিষয়ে মতদ্বৈতা থাকলেও একটি বিষয়ে সকলেই একমত এবং সে মতটি হ'ল এই যে ভারতচন্দ্র অশ্লীল—অশ্লীলতার চূড়ান্ত। স্বর্গীয় রাখালদাসের মতে “অন্নদামঙ্গল নির্দোষ গ্রন্থ নহে। ব্যক্ত অশ্লীলতা তাহার মহদ্ দোষ। ঘৃণা ব্যতিরেকে বিদ্যাসুন্দরের এক এক অংশ পাঠ করা যায় না।…ভারতচন্দ্র যে প্রকার জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে উক্ত দোষ বড় গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।” মন্তব্যটি পূর্ণ সত্য তবে এ প্রসঙ্গে কিছু বলবার আছে। এ অশ্লীলতা উলঙ্গ গ্রাম্য অশ্লীলতা নয়। শিল্প-সুষম ভাষার আবরণে আবদ্ধ এবং সংযত। বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যা এবং সুন্দরের মিথুন দৃশ্যগুলি—যে অংশগুলি অশ্লীলতার

চূড়ান্ত—লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব এই উলঙ্গ-বিহারও শব্দ-বিন্যাস এবং অলংকার-নিপুণতার গুণে সুন্দর না হোক সহনীয় হ'য়ে উঠেছে। আর এক মিলন-দৃশ্য পাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, রাধ-কৃষ্ণের উলঙ্গ রতি-বিহার। কিন্তু সেখানে এ অশ্লীলতা গ্রাম্য। ভাবের সাথে ভাষাও অশ্লীল—সে অশ্লীলতা প্রত্যক্ষ। কিন্তু ভারতচন্দ্র অদ্ভুত সংযম-চিত্তে এই অশ্লীলতাকে শিল্পায়িত করে তুলেছেন। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য তাই যথার্থই বলেছেন "ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবিগণ অশ্লীলতাকে প্রাকৃত জীবনের সহজাত বা Nature হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অশ্লীল বিষয়ও যে শিল্প-সৌষ্ঠবের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে, ভারতচন্দ্র তাহা অনুভব করিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহার অশ্লীল স্থানগুলি ভাষার দীপ্তি ও রসের ঔজ্জ্বল্যে বিদগ্ধ মনের নিকট সার্থক আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষাগত অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা ভারতচন্দ্রে একেবারেই নাই, তাঁহার মধ্যে যে অশ্লীলতা আছে তাহা ভাব বা অর্থগত অশ্লীলতা।"

ট॥ আমরা বহুবার বলেছি ভারতচন্দ্র সুনিপুণ শব্দ-শিল্পী। ভাষার উপর তাঁর প্রভুত্ব ছিল অপরিসীম। শিল্প-সুষম ভাষা দিয়ে তিনি এমন এক একটি স্বর্ণোজ্জ্বল পংক্তি রচনা করেছেন যে গুলি প্রবচন-রূপ পরিগ্রহ করে অসংখ্য বাঙালীর নিত্য ব্যবহার্য বাণী হ'য়ে উঠেছে। ভাষার ওপর কি গভীর দখল থাকলে এমনটি হওয়া সম্ভব তা' সহজেই অনুমেয়। নিম্নে এরূপ কয়েকটি পংক্তির উল্লেখ করা গেল:

১॥ নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ২॥ খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট ৩॥ যতন নহিলে কোথা মিলিবে রতন ৪॥ কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মেলে ৫॥ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন ৬॥ হাবাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায় ৭॥ খুঞা তাঁতি হ'য়ে দেহ তসরেতে হাত ৮॥ মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে প্রতঙ্গ প্রহার করে ৯॥ যে কহে বিস্তর মিছা কহে সে বিস্তর ১০॥ বড়র পিরীতি বালির বাঁধ ইত্যাদি।

ঠ॥ আর একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইংগিত করেই আমরা ভারতচন্দ্রের কাব্য-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে ইতি টানব। এই বৈশিষ্ট্যটি হ'ল ভারতচন্দ্রের গীতি প্রবণতা। মঙ্গলকাব্যের ঘটনামুখর কাহিনীতে গীতি কবিতার অবসর খুবই কম ছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে কোন মঙ্গলকবির

কাব্যে গীতি কবিতার মৃদুধ্বনি শোনা গিয়েছে—এই গীতিধ্বনি শোনা গিয়েছে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে নয়, মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে বিষ্ণুপদ রচনার প্রথা ছিল সেই পদের মধ্যে। ভারতচন্দ্রের হাতেই সর্বপ্রথম মঙ্গলকাব্যের মধ্যে গীতিকবিতা আপন সুরালনা ও রসমাধুর্য নিয়ে বেজে উঠেছে। ভারতচন্দ্রের হাতে যে গীতিকবিতার সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র কবির কাব্যে তার ঝংকার শোনা গিয়েছে। এই গীতি কবিতা প্রবর্তনের মধ্যে ভারতচন্দ্রের আধুনিক-প্রবণ কবি-মানসটি সুন্দর রূপে অভিব্যক্তি লাভ করেছে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় এই ভারতচন্দ্র-প্রবর্তিত এই গীতিকবিতার মধ্যে ধর্মীয় আবেদন অপেক্ষা মানবিক আবেদনটিই প্রধান। মানবিক-আবেদন-সমৃদ্ধ এই কবিতাগুলি তাই বুঝি বিদ্রোহী কবি মধুসূদনেরও কবি-মানসকে আকৃষ্ট করেছিল। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মধ্যে এই গীতিকবিতাগুলির প্রভাব লক্ষণীয়। নিম্নে একটিমাত্র কবিতা উদ্ধৃত করা হল :

কি বলিলি মালিনি, ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল।
শিহরিল কলেবর কাঁপে তনু থর থর
হিয়া হৈল জর জর আঁখি ছল ছল।
তেয়াগিয়া লোক-লাজ কুলের মাথায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল॥
রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিত্ত না ধৈরজ ধরে পিক কল-কল।
দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব রাঙা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল-ঢল॥

॥ তিন ॥

॥ কলাকুশলী ভারতচন্দ্র ॥

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা॥
ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ মহাশব্দ গালে।

কোন্ কবির পদ? মহাকবি মধুসূদনের? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের? এ জিজ্ঞাসা সমস্যারই নামান্তর। শব্দঝংকারের এই বিপুল ঐশ্বর্য একমাত্র তো মধুসূদনেই দেখেছি। প্রাচীন আর কোন কবির কাব্যে আছে বলে তো জানা ছিল না। কিন্তু এবার জানা হল। শব্দ-শিল্পী ভারতচন্দ্রের কাব্যে এমন পদ বিরল নয়। বিরল তো নয়-ই বরং প্রাচুর্যই চোখে পড়বে অদ্ভুত এক কবি-প্রতিভা সচেতন-প্রয়াসে কিন্তু অনায়াসলব্ধ ভাবে ঐশ্বর্য-মণ্ডিত অলংকার-নিপুণ কাব্যরচনা করে চলেছেন—পংক্তির পর পংক্তি, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। সমগ্র মধ্যযুগের কাব্যেতিহাসে এ প্রতিভার তুলনা নেই, আধুনিক যুগেও সমকক্ষ প্রতিভা বিরল। ঐশ্বর্যময় শব্দঝংকার, ছন্দের সুনিপুণ কারুকরণ ইত্যাদিই বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রকে অমরত্ব দান করেছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের ছন্দবৈচিত্র্য এবং পদলালিত্য বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সমগ্র মধ্যযুগীয় পয়ার-লাচাড়ী-গ্রথিত বৈচিত্র্যহীন গাথা-কাব্যের বুকে তিনি এনেছেন ক্ল্যাসিক্যাল বৈভব। পুরাতন রীতিতে পূর্ণচ্ছেদ টেনে তিনি নবীন যুগের নতুনতম রীতির উৎসমূল খুলে দিয়েছেন। 'কোমল বাংলা ভাষায় যে কতখানি কুহক' সৃষ্টি করতে পারা যায় ছন্দ-যাদুকর ভারতচন্দ্র আপন প্রতিভা-বলে তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

আমরা পূর্বেই বলেছি ভারতচন্দ্রের 'শব্দকুশলী' উপাধি প্রাপ্য হ'য়েছে তাঁর অলংকার-নিপুণতার জন্যে। সমুদয় অলংকারকে প্রধান দু'টি অংশে বিভক্ত করা যায়—শব্দালংকার এবং অর্থালংকার। শব্দালংকার বহুবিধ—তন্মধ্যে ভারতচন্দ্র আপন কাব্যের মধ্যে যে শব্দালংকারগুলি ব্যবহার করেছেন সেগুলি এই: যমক (analogue), শ্লেষ (pun), ধ্বন্যুক্তি (onomatopoeia) এবং অনুপ্রাস (alliteration) প্রধান আর অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমা, অতিশয়োক্তি, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি। তা ছাড়া বিরোধাভাস, অর্থান্তরন্যাস, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি বহু অলংকারের সমাবেশ দেখা যায়। বাংলা ছন্দ লঘু গুরু ভেদে ধ্বনির সুনির্দিষ্ট পর্যায়ক্রম মেনে চলে না। তাতে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগ করা যে কত কঠিন তা' অলংকার শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই বোঝেন। ভারতচন্দ্র ভুজঙ্গ-প্রয়াত, তূণক ও তোটকাদি সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় সুন্দরভাবে অনুসরণ করেছেন।'

ভারতচন্দ্র যে অলঙ্কারগুলি আপন কাব্যে যথেচ্ছারূপে ব্যবহার করেছেন তাদের সুনিপুণ প্রয়োগের কয়েকটি উদাহরণ আমরা নিম্নে দিলাম।

প্রথমে শব্দালংকারে যমক! আদ্য যমকের উদাহরণ:

ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।

এরপর মধ্য যমকের সুনিপুণ প্রয়োগ:

পাইয়া চরণ-তরি তরি ভবে আশা।
তরিবারে সিন্ধুভব, ভব সে ভরসা॥

শব্দালংকারের ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির ব্যবহার ভারতচন্দ্রের হাতে অপূর্ব সৌন্দর্য-সুষম হ'য়ে উঠেছে। কবি সুনিপুণ শিল্পীর মত এই শব্দগুলিকে যথাস্থানে প্রয়োগ করে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-সম্ভার নিষ্কাষিত করে নিয়েছেন। ধ্বন্যুক্তি অলংকার-প্রযুক্ত সামান্য কয়েকটি লাইন:

লটপট জটা লপটে পায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
গর গর গর গরজে ফণী।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥
ধক ধক ধক ভালে অনল।
তর তর তর চাঁদ মণ্ডল॥

লক্ষণীর বিষয় ধ্বনাত্মক শব্দের এই বহুল ব্যবহারে ছন্দ-সৌকুমার্য লুপ্ত হয়নি বা আঘাত (jark) কর্ণকে পীড়িত করে না। এ আঘাত গীটারের সুরালাপনায় বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে।

অনুপ্রাস ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রাণ-সম্পদ। প্রাচীন কাব্যের কথা না তোলাই ভাল, এমন সার্থক অনুপ্রাস-প্রয়োগ আধুনিক কাব্যেও বিরল অন্ত্যানুপ্রাসের একটি উদাহরণ:

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে
অরেরে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥

সার্থক অনুপ্রাসের আর একটি লাইন:

খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে।

এবার অর্থালংকারের কথা! প্রথমে দৃষ্টান্ত অলংকারের উদাহরণ:

দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায়! বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অতিশয়োক্তি অলংকারের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে বিদ্যার রূপ-বর্ণনায়:

কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা।

বিশেষোক্তি অলংকারের প্রয়োগও আছে ভারতচন্দ্রে :

গরল খাইল তবু না মরিল
ভাঙ্গরের নাহি যম।

বিরোধাভাস অলংকার ভারতচন্দ্রের হাতে সুন্দর হ'য়ে উঠেছে :

অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।

বহুবার উল্লেখিত হ'য়েছে ভারতচন্দ্রের নাগরিক চেতনার কথা। এই নাগরিক-মন তাঁর কাব্যের মধ্যে সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করেছে। গ্রাম্য কথাগুলি তিনি যখন ছন্দবন্ধনে আবদ্ধ করেন তখন তার মধ্যে যেন আর গ্রাম্যতা থাকে না। গ্রাম্য ধামালী-ছন্দ তখন অপূর্ব হ'য়ে ওঠে। গৌরীর বর দেখে নারীগণের পতিনিন্দার সংবাদটি কবি গ্রাম্য ধামালী ছন্দে সুন্দর রূপে তুলে ধরেছেন। নিম্নের ধামালী ছন্দটি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব এর মাঝে গ্রাম্যসুর খুব অল্পই আছে :

আই আই আই ওই বুড়া কি
এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে
হৈল দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামরছটা.
তামার শলা চূড়ার জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁকায় ফণী
দেখে আসে জ্বর লো॥

এই ধামালী জাতীয় ছন্দেই ফুটেছে আধুনিক শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত প্রধান ছন্দের রূপ-বৈচিত্র্য। বস্তুতঃ একে ধামালী না বলে শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ বলা উচিত। আরো একটি উদ্ধৃতি :

আমার উমা মেয়ের চূড়া ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া,
ভারত কহে, পাগল নহে, ওই ভুবনেশ্বর লো॥

মালঝাঁপ ছন্দেরও উদাহরণ পাই ভারতচন্দ্রের কাব্যে। মালঝাঁপ ছন্দে মোট চারটি পর্ব থাকে তন্মধ্যে প্রথম তিনটি পর্ব্বের অন্তে মিল থাকবে আর শেষ পর্বটি থাকবে মুক্ত। একটি উদাহরণ :

কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাকে।
ধরিবাণ খরশান হানাহান হাঁকে ॥

ভারতচন্দ্রের এই বহু বিচিত্র অলংকার-প্রয়োগের মূলে রয়েছে সংস্কৃত, অলংকার শাস্ত্রের প্রতি তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য—"রসমঞ্জরী" কাব্য-রচনা তার সার্থক প্রমাণ। কাব্য রচনাতেও যে তিনি প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্রের দ্বারস্থ হ'য়েছিলেন তার স্বীকৃতি স্বয়ং কবির কাব্যেই রয়েছে। কবি যে সংস্কৃতের 'ভুজঙ্গপ্রয়াত' ছন্দ অনুসরণ করেছিলেন তার প্রমাণ পাই এই দুই পংতিতে :

ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥

অনুরূপে নিম্নের পংতিদ্বয়ে রয়েছে তূণক ছন্দ অনুসরণের স্বীকৃতি :

মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দোবন্ধ বাড়িছে॥

'ছন্দোবন্ধ বাড়িয়াছে' কথাটা ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে অদ্ভুত রকমে সত্য। ছন্দের লীলাখেলায় তিনি বহুপথে পদচারণা করেছেন এবং আশ্চর্য রকমে সফলতাও লাভ করেছেন। এই সাফল্যে বাংলা কাব্যের গৌরব বেড়েছে, বেড়েছে ঐশ্বর্য। পয়ার-লাচাড়ীর বাঁধাধরা প্রয়োগে বাংলা কাব্যের গঠন-রীতি যে ভাবে শিথিল হ'য়ে পড়ছিল, ভারতচন্দ্রের অলংকার-নিপুণ বাক্-বিন্যাসে আবার তা' অপূর্ব বলিষ্ঠতায় দৃঢ়-পিনদ্ধ হ'য়ে উঠ্ল। শিথিল স্রোতা স্রোতস্বিনীতে আবার এল প্লাবন—বিপুল বেগ, শোনা গেল অসীম সমুদ্রের গর্জনমুখর উদাত্ত জল-কল্লোল। ভারতচন্দ্রের কাব্য-সাধনার মূল বৈশিষ্ট্য এখানেই। এখানেই তাঁর সার্থকতা এবং সিদ্ধি-সীমা।

চার ॥

॥ ভারতচন্দ্র সম্পর্কে কয়েকটি জিজ্ঞাসা ॥

মহাকবি ভারতচন্দ্র সম্পর্কে আমরা যে জিজ্ঞাসাগুলির উত্তর জেনে নিতে চেষ্টা করব সেগুলি সংক্ষিপ্তাকারে এভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে : ক ॥ ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি না রাজকবি ? খ ॥ মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের মধ্যে কে বড় ? গ ॥ ভারতচন্দ্র যুগের কবি না যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি ?

প্রথমে ভারতচন্দ্র রাজকবি না রাজসভার কবির আলোচনা। আলোচনার গভীরে প্রবেশ করার পূর্বে রাজকবি এবং রাজসভার কবি বল্‌তে আমর

কি বুঝি সেটা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। নগরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে রাজসভা গঠিত হয়। সুতরাং রাজসভার কবি যিনি তিনি রাজসভার সভ্যদের রীতি-রুচি, সমাজ-সংস্কার, আচার-আচরণের দিকেই লক্ষ্য দেবেন বেশী। অর্থাৎ তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হ'বে নাগরিক পরিবেশ এবং পরিজনদের জীবনায়ন। সুতরাং রাজসভার কবি সমগ্র নাগরিকের প্রতিনিধি—তিনি একক রাজার কবি নন। রাজকবিই হ'ল একক রাজার কবি। অর্থাৎ তাঁর কবি-কর্মে প্রকাশিত হ'বে কেবলমাত্র রাজারই পরিচয়, রাজ-মানসের ভাল-লাগা মন্দ-লাগার ছবি। রাজকবি সমগ্র রাজসভার প্রতিনিধি নন—একক রাজার দূত। ভারতচন্দ্র রাজ-সভার কবি না রাজকবি এ প্রশ্নের উত্তর এখন আমাদের নিকট সুস্পষ্ট। আমরা বহু প্রসঙ্গে বহুবার দেখেছি ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রকাশিত হ'য়েছে যুগের ছবি। তিনি সমগ্র নাগরিক-পরিজনের (গ্রামের অধিবাসীর না) প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সমকালীন নাগরিক-মনের রুচি-নিষ্ঠা এবং প্রাণের পরিচয় তাঁর কাব্যে সুন্দররূপে ধরা পড়েছে। ব্যক্তিগতভাবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কি ভাল লাগত না লাগত তাঁর পরিচয় এঁর কাব্যে নেই। সুতরাং ভারতচন্দ্র একান্তভাবে রাজসভার কবি—রাজকবি নন।

এবার দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার আলোচনা অর্থাৎ কবি হিসাবে মুকুন্দরাম বড় না ভারতচন্দ্র। এ প্রশ্নের উত্তরে কাব্যের উপাদানের দিকে আমাদের লক্ষ্য দিতে হ'বে। মানুষের দেহ এবং আত্মার মত কাব্যেরও দেহ এবং আত্মা আছে। রূপ এবং রেখা, প্রাণ এবং ভংগীতে কাব্য সম্পূর্ণ। কাব্যের প্রাণ হ'চ্ছে আত্মতন্ময়তা বা ভাব-গভীরতা আর দেহ হ'চ্ছে অলংকার-সুষম বাক্-বিন্যাস। একটি অনুভূতি-নির্ভর অপরটি শিল্প-নির্ভর। বলাবাহুল্য আদর্শ কাব্যের ক্ষেত্রে এই উভয়েরই প্রয়োজন। অনুভূতি-গুণ এবং শিল্প-নৈপুণ্য এই উভয়ের মণিকাঞ্চন যোগে কাব্য শাশ্বত কালীন সামগ্রী হ'য়ে ওঠে। কাব্যকে যদি সৌধ হিসাবে ধরা যায় তা' হ'লে অনুভূতি-গভীরতা হ'ল তার সুদৃঢ় বুনিয়াদ আর দেওয়াল এবং ঝালরের কারুকার্য হ'ল তার শিল্পময় প্রকাশ। সুতরাং সৌধকে শাশ্বতকালীন সামগ্রী হ'তে গেলে এই উভয়েরই সংযোগ প্রয়োজন। তাজমহল এর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। মোঘল শিল্পীগণের অপূর্ব কারুকার্যে, অনন্যসাধারণ শিল্পবোধে তাজমহলের বহিরঙ্গ যেমন রূপ-

ঝলমল তেমনি এর অন্তরঙ্গে রয়েছে অনাদি আদিম যুগল প্রেমের গোপন কাহিনী। অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গে এমন সার্থক বলেই তাজমহল কবি-কল্পনার উৎস-ভূমি। কেবল একটির গুণে কাব্য-সৌধ অনিন্দ্যসুন্দর হ'তে পারে না। উভয়ের সংযোগ আবশ্যক। কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র এই উভয় কবির কাব্যে এ দু'য়ের সুন্দর সমন্বয় ঘটেনি। ভাব-গভীরতায় মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠ কিন্তু শিল্প-নৈপুণ্যে ভারতচন্দ্র। মুকুন্দরাম অনুভূতি-নির্ভর, এ অনুভূতির প্রকাশ সরল, সহজ অনাড়ম্বর ভাষায়। ভারতচন্দ্র শিল্প-নৈপুণ্যে সার্থক, তাঁর বাণী মণ্ডণকলা-নিপুণতায় ঝলকিত। অন্তরঙ্গে মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব বহিরঙ্গে ভারতচন্দ্রের। মুকুন্দরাম প্রাণের কবি, ভারতচন্দ্র রূপের কবি। সুতরাং উভয়ই এক একদিকের দিকপাল। ফলে এ ক্ষেত্রে কে বড় কে ছোট সে প্রশ্ন তোলা বোধহয় অবান্তর। আপন-আপন কবি-কর্মে উভয়ই সার্থক, উভয়ই শ্রেষ্ঠ।

অবশেষে আমাদের তৃতীয় জিজ্ঞাসার আলোচনা—ভারতচন্দ্র যুগের কবি না যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি। সমালোচক উভয় মতকেই সমর্থণ করতে পারেন। ইচ্ছা করলে ভারতচন্দ্রকে যুগের কবি বলা যায় আবার তাঁর কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাব-সম্পদ এবং আধুনিকতার লক্ষণ সমূহ নিয়ে তাঁকে যুগসন্ধির কবিও বলা চলে। প্রথমে ভারতচন্দ্রের কাব্যে আধুনিকতার কোন কোন লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হ'য়েছে সেদিকে আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। এ প্রসঙ্গে একথা অবশ্যই স্বীকার্য ভারতচন্দ্রের কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণগুলি বীজাকারে নিহিত, পত্র-শ্যামল কিশলয় নয়।

দেব-বিনির্ভরতা আধুনিক কাব্যের প্রধান লক্ষণ বলা বাহুল্য। পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি এই দেব-বিনির্ভর মানবিকতার humanity-র সুর অন্নদামঙ্গলে সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে। আধুনিক কাব্য একক, ব্যক্তি-মানসের সৃষ্টি—ভারতচন্দ্রের কাব্যও তাই। এখানে গোষ্ঠী-চেতনা প্রধান হ'য়ে ওঠেনি। বিদ্রূপ এবং ব্যঙ্গোক্তির কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এই কটূক্তির মধ্য দিয়েও ভারতচন্দ্র আধুনিক কাব্যের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপগুলি প্রধানতঃ তিনি করেছেন সামাজিক কু-সংস্কার এবং অন্ধ দৈবীভক্তির উপর। তাই "তাঁহার ব্যঙ্গের কষাঘাত হইতে দেবতারাও রক্ষা পান নাই। বাংলা সাহিত্যে দেবভক্তির মধ্যে এই প্রথম শৈথিল্য

দেখা দিয়া ইহাতে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত জাতির আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপযোগী করা হইয়াছিল।...তাঁহার ভক্তিহীন ব্যঙ্গোক্তি, তাঁহার সর্বব্যাপী ও সুগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রভৃতির ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যে তাঁহার ব্যক্তি-প্রতিভার ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিয়া তিনি মঙ্গলকাব্যের যুগাবসান ঘটাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষত্বগুলি তাঁহার ঐহিক প্রীতির নিদর্শনরূপে গণ্য হইবার মর্যাদা লাভ করিয়া তাহাকে আধুনিক যুগেরও অগ্রদূত বলিয়া নির্দিষ্ট হইবার যোগ্যতা দান করিয়াছে।" অলংকার-সমৃদ্ধ ক্লাসিক ধর্মী গঠন-রীতির অবতারণার মধ্যেও ভারতচন্দ্রের আধুনিক মন ক্রিয়াশীল। মধ্যযুগের কাব্য-দেহ পয়ার-লাচাড়ীর সমবায়ে গঠিত—ভারতচন্দ্রের শব্দ-ঝংকৃত বলিষ্ঠ ছন্দ সেখানে বিরল। এছাড়াও বাংলা সাহিত্যে পরবর্তী কীর্তিখ্যাত কবিগণের অনেকেই ভারতচন্দ্রের প্রদর্শিত পথেই পদচারণা করেছেন। 'বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের প্রথম-প্রত্যূষে ঈশ্বর গুপ্ত এবং রঙ্গলাল আঙ্গিকের দিক হ'তে ভারতচন্দ্রকেই অনুকরণ করেছেন; মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের' অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে ভারতচন্দ্রের প্রভাব অবিসংবাদিত।' কিন্তু এত সব আধুনিকতার লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র মূলতঃ মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার পরিপন্থি। তাঁর মন আধুনিক হ'তে চেয়েছে কিন্তু পরিবেশের প্রভাব তাঁর পক্ষে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। এবং এজন্যেই বুঝি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কাব্য রচনায় ব্রতী হ'য়েও গ্রন্থোৎপত্তির কারণ হিসেবে দেবীর স্বপ্নাদেশের অবতারণা করেছেন। জানি বিদ্যা এবং সুন্দর আধুনিক যুবক-যুবতী তবুও তাদের প্রেমকাহিনী বর্ণনার জন্যে কবি মঙ্গলকাব্যের কাঠামোটিই বেছে নিয়েছেন—নতুন পথে প্রদক্ষিণ করার দুঃসাহস তাঁর হয়নি। ফলে নতুন সৃষ্টি নয়—মঙ্গলকাব্যের পূর্ণতা ঘটেছে তাঁর মধ্যে। নতুন প্রভাতের ইসারা হয়ত তাঁর মধ্যে ছিল কিন্তু ভোরের ছায়ালোকে সদ্য-জাগ্রত বিহঙ্গ কাকলীতে অভ্যথিত হ'য়ে নবীন সূর্যোদয় হ'য়েছে অনেক পরে। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্তই যুগ-সন্ধির কবি। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাই যথার্থই বলেছেন "১৮৫৯।৬০ সন বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়।"